উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স', 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এর National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপাচার্য

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title:Bengal: Political History III (1757-1947)

Course Code: NEC-HI-03

First Print : March, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title:Bengal: Political History III (1757-1947)

Course Code: NEC-HI-03

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

বর্ণনা গুহ ঠাকুরতা (ব্যানার্জি)
Director, SoSS, NSOU

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

সব্যসাচী চ্যাটার্জী
Professor of History,
University of Kalyani

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History,
Sidho-Kanho-Birsha University

চন্দন বসু
Professor of History, NSOU and
Chairperson, BoS

অমল দাস
Professor of History (Former),
University of Kalyani

মহুয়া সরকার
Professor of History (Former), Jadavpur
University

রূপ কুমার বর্মণ
Vice-Chancellor, Professor of History,
Bankura University

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History,
Shyamsundar College

রচনা

একক : ১ : সিদ্ধার্থ গুহরায়
Associate Professor of History (Former), Vivekananda College

একক : ২ : অরবিন্দ সামন্ত
Professor of History University of Burdwan

একক : ৩ ও ৫ : মানস দত্ত
Assistant Professor of History, Aliah University

একক : ৪ ও ৬ : অরুনিমা রায়চৌধুরী
Assistant Professor of History, Sudarban Mahavidyalaya

একক : ৭-১১ : ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

একক :১২ -১৪ : ব্রততী হোর
Associate Professor of History, Surendranath College for Women

সম্পাদনা

হিমাদ্রি ব্যানার্জী
Guru Nanak Chair Professor of History (Former), Jadavpur University

হিমাদ্রি ব্যানার্জী
Guru Nanak Chair Professor of History (Former), Jadavpur University

মহুয়া সরকার
Professor of History (Former), Jadavpur University

অনুবাদ

একক ৩-১৪

দেবারতি ব্যানার্জি
Associate Professor of History, SoSS, NSOU

বিন্যাস সম্পাদনা

চন্দন বসু
Professor of History, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : History
NHI

Course Title:Bengal: Political History III (1757-1947)
Course Code: NEC-HI-03

পর্যায়-১ : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

একক ১ ❒ বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো—আদিযুগ 9-27

একক ২ ❒ ঔপনিবেশিক অভিঘাত : নতুন প্রশাসনিক কাঠামো : আইন-বিচার ব্যবস্থা—দণ্ডবিধি—শিক্ষাব্যবস্থা 28-46

পর্যায় ২ : রাজনৈতিক বিকাশ : উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায়

একক ৩ ❒ জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব 49-83

একক ৪ ❒ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায় : প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি 84-91

একক ৫ ❒ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায় : বিপ্লববাদ 92-116

একক ৬ ❒ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায় : নিম্নবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি 117-126

পর্যায় ৩ : রাজনীতির বিকাশ : অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে

একক ৭ ❒ সাম্প্রদায়িকতাবাদ অথবা “ভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ”?—বিতর্ক 129-137

একক ৮ ❒ শ্রেণি সচেতনতা : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণির ‘শ্রেণি’ সচেতনতা 138-145

একক ৯ ❒ শ্রেণি চেতনা গঠন : কৃষক সভা ও কৃষক আন্দোলন 146-154

একক ১০ ❒ ‘জাতি’ প্রশ্ন ও প্রান্তিক অথবা অনগ্রসর জাতি/শ্রেণি : বিকল্প দৃষ্টিকোণ 155-159

একক ১১ ❒ নারী আন্দোলন ও লিঙ্গ প্রশ্ন : সাম্য ও মুক্তির লড়াই 160-165

পর্যায় ৪ : উপনিবেশিক শাসনের অবসান

একক ১২ ❒ সঠিক দিশার সন্ধানে : সংকটে সমাজ; যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ 169-183

একক ১৩ ❒ উপনিবেশিক শাসনকালে শেষভাগে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 184-199

একক ১৪ ❒ দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা : নতুন সমাজ গঠন? 200-214

পর্যায়-১

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

একক ১ ❒ বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো—আদিযুগ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১.৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

১.৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১.৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংস বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১.৪.২ কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১.৫ ভূমিরাজস্ব নীতি

১.৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

১.৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারাদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

১.৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

১.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

১.৬ উপসংহার

১.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠক্রমের শেষে শিক্ষার্থীরা যা জানবেন এবং শিখবেন :

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার কথা।
- ওয়ারেন হেস্টিং ও কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার।
- বাংলার ভূমিব্যবস্থায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি।

১.১ প্রস্তাবনা

১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক

পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাকে ঐতিহাসিকেরা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Dual system of administration) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে দুজন শাসকের অধীনস্থ হয়। বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সমেত যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন রইল ইংরেজ কোম্পানির হাতে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিজামতের দায়িত্ব সমেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রইল নবাব নজম উদ্দৌল্লার হাতে। কিন্তু দেওয়ানির দায়িত্ব না থাকার ফলে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হয়েছে এলাহাবাদ চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন অধিকার এবং বাংলার নবাব পেলেন অধিকারহীন দায়িত্ব। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, যা বাংলার ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে) নামে পরিচিত বাংলার অর্থনীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন বাংলার অবস্থার পরিবর্তন জরুরী। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি, অসৎ উপায়ে সম্পদ আহরণ, উদ্ধত আচরণ ও অত্যাচার ইংল্যান্ডে উত্তপ্ত বিতর্কের সূচনা করেছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। বাংলাদেশে কোম্পানির কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার কতটা হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়েও বিতর্ক চলে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানি এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশে একটি সুবিন্যস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়; যা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বণিক সংস্থা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছিল তার বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কোম্পানির তিনটি প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ। এই ঘাঁটিগুলো স্বতন্ত্র তিনটি কাউন্সিল বা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। এই কাউন্সিলগুলি লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ করত। কোম্পানির মালিক ও অংশীদারদের নিয়ে এই কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস গঠিত হত। প্রতিটি ভারতীয় ঘাঁটিতেই বণিকদের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস থাকত। কেবলমাত্র সফল বণিকরাই কাউন্সিলের সদস্য হতেন। এই সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে কাউন্সিলের সভাপতি করা হত। এই সভাপতি হতেন সংশ্লিষ্ট ঘাঁটির গভর্ণর। কাউন্সিলগুলি তাঁদের নিজস্ব ঘাঁটির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত।

কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন ছিল সামান্য। কিন্তু তাঁরা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে নিজেদের আয় বাড়াতে পারতেন। তবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্য চালানোর সুযোগ পেতেন না। পলাশীর পর থেকেই বাংলাদেশে কোম্পানি কর্মচারীদের সম্পদ বিপুল হাতে বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদশালী ইংরেজ বণিকের দল আঠেরো শতকের ইংল্যান্ডে একটি প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৭৬৭ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই গোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত এই বণিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠার ফলে ইংল্যান্ডের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এইসব ইংরেজ বণিকের দল প্রায়ই অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোম্পানির শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি, কারণ কোম্পানির ভেতর থেকেই বাধা এসেছিল। অসদুপায়ে বিপুল সম্পদ অর্জনকারী কর্মচারীরা সকলেই ছিলেন কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাছাড়া কোম্পানির মালিক ও অংশীদারেরাও এই বিপুল সম্পদে ভাগ বসাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৭৬৬ সালে কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশ-বা ডিভিডেন্ডের হার করা হয় ১০ শতাংশ। ১৭৬৭ সালে ডিভিডেন্ডের হার আরও বাড়িয়ে করা হয় ১২½ শতাংশ। ফলে কোম্পানি এক মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করা হয়।

১.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১৭৭২ সালে কোম্পানির কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপের যে তৎপরতা চলেছিল, তারই পরিণতি ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট। কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশরাজ্যের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই আইন। এই আইনের কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, কোম্পানির অংশীদার ও পরিচালকদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়ত, বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করা। এই আইন অনুযায়ী ৫০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করা হয়। কমপক্ষে ১০০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডাররা ১টি ভোট দেবার অধিকার পান। ৩,০০০, ৬,০০০ ও ১০,০০০ পাউন্ডের শেয়ার হোল্ডারদের যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪টি ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোম্পানিতে বিত্তবানদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে বলা হয় যে, কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোম্পানির শাসন ও অর্থনীতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতে বাধ্য থাকবে। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলার গভর্ণর, গভর্ণর জেনারেল পদে আসীন হবেন। চারজন সদস্যবিশিষ্ট গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল গঠিত হয়। এই আইনেই গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম এবং কাউন্সিল সদস্য হিসাবে ক্ল্যাভারিং, মনসন, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিসের নাম ঘোষিত হয়। গভর্ণর জেনারেলের শাসনকালের মেয়াদ হয় পাঁচ বছর। বলা হয় গভর্ণর জেনারেল কলকাতা থেকে কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর কর্তৃত্ব খাটাবেন। বস্তুত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানির বিষয়ে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব জাহিরের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

১.৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রেগুলিটিং অ্যাক্টের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আইনের ফলে কোম্পানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। আবার কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর পরিচালকমণ্ডলীর (Court of Directors) কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একইভাবে কাউন্সিলের ওপর গভর্ণর জেনারেলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের ওপর বাংলার কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়টিও অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। তার ওপর কতকগুলি বিষয় পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ, কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের বিরোধ, প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধের জন্য ইংরেজ কোম্পানির বিপুল অর্থব্যয় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তথা ইংরেজ সরকারকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এই অবস্থায় লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু ফক্স ও বার্ক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। ১৭৮১ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হলেও তা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। সমস্যাগুলি থেকেই গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন পিট। ১৭৮৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভারত আইন জারী করেন। এই আইন পিটের ভারত আইন (Pitt's India Act) নামে পরিচিত।

১৭৮৪ সালের পিটের ভারত আইন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল। ১৭৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতবর্ষে এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইন অনুযায়ী একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল (Board of Control) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়— ভারত সচিব (Secretary of State), অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer), চারজন প্রিভি কাউন্সিলার— এই ছয়জন কমিশনারকে নিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হবে। এই বোর্ডকে কোম্পানি কর্তৃক সামরিক ও অসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়গুলি দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। বলা হয়— বোর্ড অফ কন্ট্রোল ইচ্ছেমত কোম্পানির কাগজপত্র দেখতে পারবে এবং কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ ভারতের সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ইংরেজ কুঠির গভর্ণরদের ক্ষেত্রে কলকাতার গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ মানা যে বাধ্যতামূলক এ বিষয়ে রেগুলেটিং অ্যাক্টে কোন নির্দিষ্ট আইন ছিল না। পিটের ভারত আইন এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে এবং বলে যে, ভারতে কর্মরত কোম্পানির যেকোন স্তরের প্রশাসনিক কর্তাই গভর্ণর জেনারেলের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১.৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ইংরেজ ইষ্ট কোম্পানির পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার রাজনীতিতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকটাই

বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) পর ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে আর দ্বৈত শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়নি। তারা সরাসরি বাংলাদেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিল। ১৭৭২ সালে ইংরেজ কোম্পানি সরাসরি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাংলাদেশে কোম্পানির গভর্ণর হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী হেস্টিংস হন গভর্ণর জেনারেল। হেস্টিংস দেখেছিলেন যে, তৎকালীন বাংলাদেশে কোন সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশে কোম্পানির শাসনকে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় রূপ দেবার জন্য বিচার বিভাগীয় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। বিচার সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১.৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১৭৭২ সালে ভ্রাম্যমান কমিটির (Committee of Circuit) সুপারিশ অনুসারে বাংলার প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত ও একটি করে ফৌজদারী আদালত গঠিত হয়। কলকাতায় দু'টি উচ্চ আদালত গঠিত হয়েছিল। দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামৎ আদালত কলকাতায় তৈরি হয়েছিল। এই দুটি আদালতই ছিল আপীল আদালত। জেলার দেওয়ানি আদালতগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কালেক্টর। সদর দেওয়ানি আদালেতর মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করতনে কাউন্সিলের সদস্যরা। সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রেসিডেন্ট। ফৌজদারী আদালতগুলি ভারতীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ভারতীয় বিচারকেরা প্রচলিত রীতিনীতি ও নজীরের ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তবে প্রয়োজনে জেলা ফৌজদারী আদালতগুলির বিষয়ে কালেক্টর এবং সদর নিজামৎ আদালতের বিষয়ে কাউন্সিল সদস্যরা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

১৭৭৪ সালে জেলা দেওয়ানি আদালতগুলি পরিচালনার জন্য 'আমিল' নামে একদল ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমিলের বিচারে অসন্তুষ্ট হলে, যে কোন পক্ষই প্রাদেশিক কাউন্সিলে (Provincial Council) আবেদন করতে পারত। সেখানেও যদি কোন মামলার সঠিক নিষ্পত্তি না হত তবে সদল দেওয়ানি আদালতে আপীল করা যেত। ১৭৭৫ সালে সদর নিজামৎ আদালতকে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরিত করা হয়। নায়েব নাজিম নামক ভারতীয় পদাধিকারীর ওপর সদর নিজামৎ আদালতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপরাধমূলক মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

১৭৮০ সালে ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানি আদালতের হাতে অর্পিত হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের এই দেওয়ানি আদালতগুলির সভাপতিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৮১ সালে দেওয়ানি আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮ করা হয়। এই দেওয়ানি আদালতগুলির মধ্যে ৪টিতে কালেক্টরেরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অবশিষ্ট ১৪টিতে ইউরোপীয় বিচারকেরা বিচারের

দায়িত্ব পালন করতেন। উচ্চতর আপীলের জন্য সদর দেওয়ানি আদালতে যেয়ে হত। জেলা আদালতের বিচারকেরা ক্রমে ফৌজদারী মামলার বিষয়েও ফৌজদারদের পরিবর্তে দেখাশোনা করতে আরম্ভ করেন। তবে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে নায়েব নাজিম তখনও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করতেন। দেওয়ানি বিচারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে একটি হিন্দু আইনবিধি ও একটি মুসলিম আইনবিধি সঙ্কলিত হয়। এই আইনবিধি দুটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ইতিমধ্যে রেগুলেটিং অ্যাক্টের সুপারিশ অনুসারে ১৭৭৪ সালে কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট তৈরি হয়েছিল। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। ইংল্যান্ডের রানী এই আদালত তৈরি করেছিলেন। বলা হয়েছিল যে, সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করবে। কিন্তু এই আদালত তৈরি হবার ফলে বেশ কিছু বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে। এই আদালত প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত। এমনকী অনেক ক্ষেত্রে উক্ত আদালতগুলির বিচারক ও কর্মচারীদের বিচারের দায়িত্ব নিয়ে নিত। সুপ্রীম কোর্ট যে সমস্ত আইনী নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করত, তা ছিল ভারতীয়দের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী। ফলে সুপ্রীম কোর্টের কাজকর্ম বাংলার জনমানসে ক্ষোভ ও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল— "এই আদালত ভারতীয়দের কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠেছে এবং কোম্পানির সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে". (The Court has been generally terrible to the natives and had distracted the government of the Company.)।

১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতে সভাপতি নিযুক্ত করেন। ইম্পেকে মোটা টাকার বেতনে বহাল করা হয়। কিন্তু এই কাজের জন্য হেস্টিংস কঠোরভাবে সমালোচিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি ইম্পেকে উৎকোচ প্রদান করেছেন। বস্তুত এক বিশাল পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করা ছিল উৎকোচ প্রদানেরই নামান্তর। লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ এবং হাউস অফ কমন্স সরকারের কাছে ইম্পেকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী তোলে। ১৭৮২ সালে ইম্পে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে এবং তাঁর সমস্ত বেতন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ১৭৮১ সালের একটি আইনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা হয়। বলা হয় রাজস্ব সংক্রান্ত কোন মামলা সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে থাকবে না। গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের কোন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কলকাতার সমস্ত অধিবাসীদের ওপর সুপ্রীম কোর্টের বিচার ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮২ সালে এলিজা ইম্পে ভারত ত্যাগ করার পর গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল সদর দেওয়ানি আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১.৪.২ কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পর অল্প কিছুদিনের জন্য গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ম্যাকফার্সন। তারপর ১৭৮৬ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল হয়ে বাংলায় আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। কর্ণওয়ালিসের আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া সমস্ত জেলা আদালতগুলিকে পুনরায় কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হল। কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল এবং তাঁরা সীমিত ভাবে ফৌজদারী মামলা পরিচালার অধিকারী ছিলেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলার বিচার তখনও জেলা ফৌজদারী আদালতগুলিকে এবং সদর নিজামৎ আদালতেই হত। কালেক্টররা রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারতেন না। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল রাজস্ব পরিষদের. (Board of Revenue) ওপর।

১৭৯০ সালে এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাজস্ব পরিষদ বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। তখন রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য কালেক্টরের অধীনে একটি করে স্থানীয় আদালত গঠিত হয়েছিল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। সদর নিজামৎ আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে পুনরায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। একজন মুসলমান বিচারকের পরিবর্তে গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিল এই আদালতে সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাহায্য করতেন। জেলা ফৌজদারী আদালতগুলি তুলে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে চারটি ভ্রাম্যমান আদালত গঠিত হয়। কোম্পানির দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই আদালতগুলির মামলা পরিচালনা করতেন। এই বিচারকদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় তাদের বছরে দুবার ভ্রমণ করতে হত। কালেক্টরদের হাতে বিচারকের ক্ষমতা (Magistrate's Power) বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কালেক্টরেরা চারটি প্রাদেশিক ফৌজদারী বিচারালয়ের রায় অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দেবার দায়িত্ব নিতেন।

১৭৯৩ সালের মে মাসে বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালিস কোড' প্রণীত হয়। এই আইনবিধিতে আইনী পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করে আরও কিছু নতুন আইনের সূচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে "বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালিস কোড' ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামো তৈরি করেছিল (The famous Cornwallis Code formed the steel frame of British-Indian administration)। এই সময় মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় নীতি নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কালেক্টরদের হাত থেকে বহুমুখী দায়িত্ব হ্রাস করা। বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব হাতে পেয়ে কালেক্টরেরা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। কালেক্টররা জেলাগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। ফলে কালেক্টরদের হাত থেকে বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। পরিবর্তে জজ্ (Judge) নামে একদল নতুন অফিসারকে

বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। জেলার রাজস্ব আদালতগুলি এবং বোর্ড অফ রেভেনিউ বা রাজস্ব পরিষদের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। এখন থেকে জজেরাই দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার পেলেন। পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি নগর আদালত এবং ২৩টি জেলা আদালতের বাইরেও অনেকগুলি নিম্ন আদালত (Lower Courts) গঠিত হল। সর্বনিম্ন আদালত ছিল মুনসিফের আদালত। সেখানে ৫০ টাকা পর্যন্ত মামলা চলত। তার ঠিক ওপরের স্তরে ছিল রেজিস্ট্রারের আদালত। এই সব আদালতের রায়ে কেউ সন্তুষ্ট না হলে সে জেলা আদালতে আপীল করতে পারত।

কর্ণওয়ালিসের বিচার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল— শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যতদূর সম্ভব হ্রাস করা। তিনি আগেই ভারতীয়দের হাত থেকে ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। নিজস্ব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জমিদারেরা যে ক্ষমতা উপভোগ করতেন কর্ণওয়ালিস এবার তা বতিল করলেন। জমিদারেরা নিজস্ব পুলিশ বাহিনী বাতিল করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যেক জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দারোগা নামে একদল কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। দারোগা ছিল সরাসরি সরকারি কর্মচারী। দারোগারা নির্ধারিত এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে কাজ করত।

এইভাবে কর্ণওয়ালিস প্রত্যেক জেলার শাসনতন্ত্র দু'জন ইউরোপীয় অফিসারের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। একজন ছিলেন কালেক্টর। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। অন্যজন ছিলেন একাধারে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাজ ছিল বিচারকের দায়িত্ব পালন করা ও এলাকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন করা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতান্ত্রিক পদগুলি থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভারতীয়দের অপসারিত করেছিলেন কর্ণওয়ালিস।

১.৫ ভূমিরাজস্ব নীতি

বাংলাদেশে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার পরই তাদের মনোনীত নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে তার ওপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হয়েই রেজা খান বুঝে যান যে তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করছে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করার দক্ষতার ওপর। সেই সময় ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য আমিলদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি মনোনীত নায়েব দেওয়ানের হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছিল। আমিলদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও নায়েব দেওয়ান তথা ইংরেজ কোম্পানিকে সন্তুষ্ট রাখা। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে উৎপাদন অনুপাতে ভূমিরাজস্ব আদায়ের হার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট দেখা দিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ কোম্পানির তৎকালীন গভর্ণর ভেরেলেস্ট ১৭৬৯ সালে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সুপারভাইজার নামে একদল কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ করেন। আমিলদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে। নবনিযুক্ত সুপারভাইজারদের নিজ নিজ জেলাগুলির আর্থিক অবস্থা ও সেখানের অধিবাসীদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। এই কর্মচারীদের রায়তরা বিভিন্ন জেলায় কি ধরনের অধিকার উপভোগ করনে এবং তাদের কাছ থেকে কী হারে রাজস্ব দাবী করা হয়, সে সম্পর্কেও একটি তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নায়েব দেওয়ানের মত সুপারভাইজররাও মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। ১৭৭০ সালের মধ্যেই সুপাইভাইজারী প্রথা একটি অদক্ষ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কারণ প্রত্যেক সুপারভাইজারই তাঁর জেলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৭৭০ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুটি 'রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ' (Comptrolling Council of Revenue) গঠিত হয়।

১.৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

নায়েব দেওয়ান রেজা খানের আমলে আমিলদারী ব্যবস্থা বাংলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল। কৃষকদের করভারে জর্জরিত করে চরম উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত। এর সঙ্গে যুক্ত হল অজন্মা। ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির জন্য ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হল। মারাত্মক হারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং বণিক ও সুপারভাইজারের গোমস্তাদের কালোবাজারী মানুষের দুর্দশার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। এইসব ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই ১৭৭০ সালে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। মন্বন্তরের পরেই এলো এক সর্বগ্রাসী মহামারী। পূর্ণিয়া, নদীয়া, বীরভূম, রাজশাহী, বর্ধমানের একাংশ, রাজমহল, ভাগলপুর, হুগলী, যশোর, মালদা ও চব্বিশ পরগণা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা। ১৭৭০ সালের মে মাসে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বলেছিল— বাংলার সমগ্র জনসংখ্যা $\frac{১}{৩}$ অংশ মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল এই মন্বন্তরের ফরে। ১৭৭২ সালে বাংলার বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন— সমগ্র জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এবং কৃষিজীবী মানুষের অর্ধেক এই দুর্ভিক্ষের ফরে মরা। গেলেও কোম্পানি সরকার ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি মেনে নেয়নি।

১৭৬৫-৬৬ সাল থেকে ১৭৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের রাজস্ব আদায় ৫৩.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হেস্টিংসের সরকার ১৭৭৩ সালে স্বীকার করেছিল যে, সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল বলেই এতবড় দুর্ভিক্ষের পরও আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়নি। হান্টার লিখেছেন—'এমন কি ৫ শতাংশও ভূমিরাজস্বের হারে ছাড় দেওয়া হয়নি এবং পরের বছরের জন্য তা ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। ত্রাণব্যবস্থা ছিল অমানবিক রকমের অপর্যাপ্ত'। কুখ্যাত 'নাজাই' বন্দোবস্ত রাজস্ব ক্ষেত্রে সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণের নগ্নতম রূপ উদ্ঘাটিত করেছিল। এই ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল—

জেলাগুলির নিকৃষ্ট ও অনুর্বর অঞ্চলে যারা বসবাস করছে তাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হবে, কারণ তাদের মৃত বা পলাতক প্রতিবেশীদের জন্য রাজস্বের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা তাদেরই পূরণ করতে হবে। কোম্পানির বর্ধিত রাজস্ব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের পরই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমতে থাকে। একদিকে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। কৃষিপণ্য বিক্রি করে সঠিক দাম না পাওয়ার জন্য কৃষকরা সরকারের রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বালার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য ও রাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বাড়ানোর জন্য নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু করেন।

১.৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারাদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানিকে সরাসরি গ্রহণ করার নির্দেশ পাঠায়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানির ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খানকে এবং বিহারের দেওয়ান সিতাব রাইকে বিতাড়িত করেন। রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ তুলে দেওয়া হয় এবং সুপারভাইজাররা কালেক্টর হিসাবে পরিচিত হন। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে নজরদারী করার জন্য ১৭৭২ সালে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee of Circuit) গঠিত হয়। ১৭৭৩ সালে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বর্ধমান ও ঢাকায় পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Council) গঠিত হয়।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তুলে দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বাংলার বহু এলাকায় পুরনো জমিদারদের বাতিল করা হয়। পরিবর্তে সর্বোচ্চ নিলামদারকে ইজারাদার হিসাবে বসানো হয়। যে সব এলাকায় জমিদারেরাই সর্বোচ্চ নিলামদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সব জায়গায় অবশ্য জমিদাররাই পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারী লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থার অন্যতম বড় ত্রুটি ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার্যকৃত রাজস্বের পরিমাণ বেশি হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ নিলামদারই ছিল কলকাতা শহরের লোক এবং গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। জমির ইজারাদারী লাভের আশায় তারা কোন কিছু চিন্তা না করেই দেয় রাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ নিলাম হিসাবে হেঁকে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক ইজারাদারই রাজস্বের প্রথম কিস্তির টাকা সরকারকে দিতে পারেনি। কোনো কোনো জমিদার বাংলার ভূমিব্যবস্থায় বানিয়াদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার তাগিদে উচ্চতর নিলাম হেঁকে নিজস্ব জমিদারী বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তারাও তাদের প্রতিশ্রুত রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেল না।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে হেস্টিংসের ব্যর্থতা সূচিত করেছিল। হেস্টিংসের নতুন

ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পাট্টা ব্যবস্থা সুদক্ষভাবে কার্যকর করা যায়নি। যেহেতু নতুন পাট্টা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার ব্যাপারে কারও কোন উৎসাহ ছিল না সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই পাট্টা নথিভুক্ত হত না। ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন— অনেক সময়ই এর সুযোগ নিয়ে রায়তরা তাদের কৃষিজমির এলাকা বাড়িয়ে নিত বা খাজনার পরিমাণ কমিয়ে নিত। অপেক্ষাকৃত ধনী রায়তরা প্রায়ই ইজারাদারকে উৎকোচ দিয়ে নিজস্ব দেয় খাজনার হারে ছাড় নিয়ে নিত। ফলে দরিদ্র রায়তদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানো হত। খাজনার ন্যায্য ও সঠিক হারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। হেস্টিংসের নয়া বন্দোবস্তের মারাত্মক কুফল হিসাবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বেনিয়াদের জমির সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত করার সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। বেনিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল তাদের ইংরেজ প্রভুরা। ১৭৭৩ সালে 'পার্লামেন্টারি কমিটি অফ সিক্রেসী' তার প্রতিবেদনে লিখেছিল-কোম্পানি কর্মচারীরা প্রায়ই বেনিয়াদের সঙ্গে জমির খাজনা থেকে আসা লাভ ভাগ করে নিচ্ছে। ১৭৭৫ সালে ফিলিপ ফ্রান্সিস অভিযোগ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও বেনিয়াদের মধ্যে অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ১৭৭৬ সালে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী স্বীকার করে যে, গ্রামবাংলার ভূমিব্যবস্থায় তথা রাজস্ব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গোষ্ঠী স্বার্থের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইজারাদারী ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে হেস্টিংস ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ইজারাদারদের বাতিল করে জমিদারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলার রাজস্ব দেবার ক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য ১৭৭৬ সালে আমিনী কমিশন বসানো হয়। তাছাড়া লন্ডনের পরিচালকমণ্ডলী নির্দেশ পাঠায় যে, ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে একটি বার্ষিক চুক্তি করতে হবে। তাই করা হল। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির এক বছরের চুক্তি হত বলে এই ব্যবস্থাকে বলা হত একসালা বন্দোবস্ত।

এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে জমিদারের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি হবে শেষ কথা। অন্য কেউ যদি জমিদারের থেকে বেশি রাজস্ব দেবার প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিই বহাল রাখা হল। ইজারাদারী ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের সময় জমির উৎপাদিকা শক্তি বা সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের খাজনা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা না করেই নিলাম ডেকে ভূমিরাজস্ব স্থির করা হয়েছিল। নতুন ব্যবস্থাতেও ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিগত তিন বছরে সরকারি কোষাগার যে পরিমাণ রাজস্ব জমা পড়েছিল তার নীট গড় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ হিসাবে জমিদারদের ওপর ধার্য করা হয়। যেহেতু ইজারাদারী ব্যবস্থার রাজস্ব নির্ধারণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এ ক্ষেত্রেও বহাল রাখা হয়েছিল, সেহেতু মানুষের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানোর প্রবণতা থেকে গেল। বহু জমিদারই নির্ধারিত রাজস্ব দিতে পারলেন না। ফলে তাদের জমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কোম্পানি সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারেরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁরা রায়তদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে

থাকেন। দরিদ্র রায়তদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভূমিরাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

এই অবস্থায় হেস্টিংস একটি কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৭৮১ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বাতিল করে একটি 'রাজস্ব কমিটি' (Committee of Revenue) গঠিত হয়। তা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় বাড়ল না। রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কমিটির অন্যতম সদস্য স্যার জন শোর। রাজস্ব ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য শোর জেলা স্তরে একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর রাখার কথা বলেন। হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতি বাংলার রায়তদের খাজনার ভারে জর্জরিত করেছিল। ফলে গ্রামীণ সমাজে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিংসাত্মক ঘটনার বৃদ্ধি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছিল। অভিজ্ঞতা থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করে যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা দরকার এবং এর অত্যাবশ্যক শর্ত ছিল জমিদারদের আদিম ও ঐতিহ্যগত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল হয়ে ১৭৮৬ সালে কলকাতায় আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।

১.৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

ফরাসি ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যতম কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্র কেবলমাত্র ভূমির ওপর কর দাবী করতে পারে। ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলার স্বপক্ষে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— জমির প্রকৃত মালিক জমিদারেরা, ফলে সরকারের সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন নেই। জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তার একাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। পাট্টচার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছিল যে, এটা হবে জমিদার ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক একটা চুক্তি। জমিদার ও প্রজাদের পারস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। প্রথম থেকেই ফ্রান্সিসের বক্তব্য ছিল— অতিরিক্ত মাত্রায় রাজস্বের বোঝা না চাপিয়ে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য একটি রাজস্বের হার ধার্য করা উচিত। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারি আয় বৃদ্ধি করা। পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) জমিদারদের ক্ষোভের কারণগুলি অনুসন্ধান করে সেগুলিকে প্রশমিত করতে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত চিরস্থায়ী আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮৬ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত নানা ধরনের অনুসন্ধান চালানোর পর এখন ১৭৮৪-এর পিটের ভারত আইনের নির্দেশ মাথায় রেখে কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে একটি দশসালা বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। বলা হয়— এই পরিকল্পনা দশ বছরের জন্য গৃহীত

হবে। পরবর্তীকালে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হবে। কিন্তু জন শোর কর্ণওয়ালিসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন— এই বন্দোবস্ত দশ বছর বহাল রাখার ব্যাপারে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই বন্দোবস্ত অপরিবর্তিত থাকবে, এখনই এরকম প্রস্তাব নেওয়া ঠিক নয়। জেমস্ গ্র্যান্ট বাংলায় রাজস্বের হার কম ধার্য করা হয়েছে এই যুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্র্যান্টের এই যুক্তি অবশ্য জন শোর গ্রহণ করেননি। জন শোর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে— এই বিষয়ে চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ ভূমি ব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধাকে জিইয়ে রাখা। তাঁর বক্তব্য ছিল ধীরে ধীরে ক্রমিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা উচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার প্রাক্-মুহূর্ত শোর মন্তব্য করেছিলেন— বহু পুরনো জমিদার তাঁদের অক্ষমতা ও অলসতার জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। শোরের এই বক্তব্যের উত্তরে কর্ণওয়ালিস বলেছিলেন—অলস জমিদারদের অদক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁদের মালিকানাধীন ভূসম্পত্তি যদি অধিকতর পরিশ্রম ও উদ্যোগী মানুষের হাতে যায়, তবে তা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কর্ণওয়ালিস জন শোরের প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এগোতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারত সচিব হেনরী ডান্ডাসের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করা বা একটি বাস্তবসম্মত বন্দোবস্ত গড়ে তোলা-এর কোনটিই ডান্ডাসের বিবেচনাধীন ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করা ও ভূমিরাজস্ব খাতে কোমাপানি সরাকরের আয় বৃদ্ধি করা। ১৭৯২-এর ২৯শে অগাস্ট কর্ণওয়ালিসের পরিকল্পনা লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসবা পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করে। ১৭৯৩ সালে এই অনুমোদন পত্র কর্ণওয়ালিসের হাতে এসে পৌঁছায়, অর্থাৎ ১৭৮৯ সালের দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করার নির্দেশ পাঠানো হয়। ১৭৯৩-এর ২২শে মার্চ কর্ণওয়ালিস বাংলার জমিদারদের সঙ্গে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement) ঘোষণা করেন।

১.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে নীট রাজস্বের পরিমাণ সাব্যস্ত হল ২৬,৮০০,৯৮৯ টাকা। বলা হল-জমির ওপর জমিদারদের বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য অধিকার কোম্পানি স্বীকার করে নেবে। বিনিময়ে বৎসরে জমিদররা তাঁর ওপর ধার্য রাজস্ব কোম্পানির কোম্পানি সরকারকে মিটিয়ে দেবেন। কোনো জমিদার কোম্পানির পাওনা রাজস্ব সময়মত মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিলামের মাধ্যমে সেই জমিদারী অন্য জমিদারের কাছে বিক্রি করা হবে। রাজস্বের হার নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। বারবার রাজস্বের হার নির্ধারণের সমস্যা এড়ানোর জন্য কর্ণওয়ালিস সুপারিশ করেন— ১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারেরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করেছিলেন, তার নয়-দশমাংস তাঁরা সরকারকে রাজস্ব হিসাবে দেবেন। এই রাজস্বকে চিরস্থায়ী রাজস্ব

হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পেলেও রাজস্বের এই পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে এবং সরকার বর্ধিত রাজস্ব দাবী করবে না। এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হাবর পরই লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ একটি প্রতিবেদনে বলেছিল-উৎপাদনশীল নীতির (Productive Principles) সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল হিসাবে বাংলায় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে এবং সাধারণভাবে সম্পদ ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটবে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বালংরা গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসকেরা এদেশে একদল রাজনৈতিক মিত্র পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, জমিদারদের ভূ-সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার এবং অপরিবর্তনীয় ও চিরকালীন ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করার ফলশ্রুতি হিসাবে জমিদারেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশরাজকে সমর্থন করবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক স্তম্ভে পরিণত হবে। রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক স্তর হিসাবে জমিদারেরা বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানিকে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা ১৭৬৫ সাল থেকেই বিব্রত রেখেছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করে ভূমিরাজস্ব খাতে একটি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কর্ণওয়ালিস সহ বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন যে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। খোদ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কারণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বহু জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষীর উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই ঘটনা 'কৃষি বিপ্লব' (Agricultural Revolution) নামে বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল এই কৃষি বিপ্লব। ১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে কর্ণওয়ালিস আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভূ-সম্পত্তির ওপর জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে জমিদারেরা বনাঞ্চল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেবেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। কোম্পানির আশা ছিল জমিদারী উদ্যোগ এই অঞ্চলগুলিকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নিয়ম করা হয়েছিল জমিদারকে তার রাজস্ব দেবার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির কাছে রাজস্ব জমা দিতে হবে। অপরাগ হলে তাঁর জমি নিলাম করে হস্তান্তরিত হবে। এই আইন সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) নামে পরিচিত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফে আশা করা হয়েছিল জমিদারী পরিচালনায় ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিলে অদক্ষ জমিদারের পরিবর্তে দক্ষ জমিদারের মালিকানা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। পঞ্চমত, অসংখ্য রায়তের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সরল ও সস্তা প্রক্রিয়া।

বাংলার জমিদারেরা খুশি মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পরই দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে চাল কৃষিপণ্য মূল্যের স্বল্পতা জমিদারদের বেশ অসুবিধায় ফেলেছিল। ১৭৯৪-১৭৯৭ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের দাম বিশেষ বাড়েনি। সর্বাধিক সংখ্যক জমিদারী বিক্রির ঘটনা সম্ভবত এই সময়েই ঘটেছিল। পুরনো জমিদারেরা প্রায়ই কোম্পানির রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদারী সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নিলাম হত ও অন্য জমিদারের হাতে চলে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা গেল যে বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী জমিদারগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে রাজস্ব জমা দিতে না পেরে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এই সব জমিদারীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজশাহী নদীয়া, দিনাজপুর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী। ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম তাই বলেছেন-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বৃহৎ জমিদারীগুলির অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন। ছোট জমিদারীগুলি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

কোম্পানির তরফ থেকে অবশ্য বড় জমিদারীগুলি ধ্বংস হবার কারণ হিসাবে জমিদারদের অমিতব্যয়িতা ও জমিদারীগুলির অদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা আংশিক। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মনে করেন—সে সময়ের নিরিখে (১৭৯৩-৯৪) নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিল থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বড় ও ঐতিহ্যশালী জমিদারীগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংস রোধ করার জন্য এবং জমিদারী নিজের হাতে রাখার জন্য বড় জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের কিছুদিনের মধ্যেই এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। প্রজাদের কাছ থেকে দ্রুত খাজনা আদায়ের জন্য তাঁরা তাঁদের জমিদারী ভাগ করে দিতেন। এইভাবে বাংলার কৃষিসমাজে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। বড় জমিদাররা যাদের মধ্যে জমিদারী ভাগ করে দিয়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন তাদের বলা হয় মধ্যস্তত্বভোগী জমিদার (Intermediary landlords)। ১৭৯৯ সালে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র সঙ্কট এড়ানোর তাগিদে মধ্যসত্ত্বাধিকারীদের মধ্যে তাঁর জমিদারী ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত পত্তনি ব্যবস্থা। পত্তনি ব্যবস্থার ফলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদার ও রায়তের মাঝখানে একাধিক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হল। জমিদার একজন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে তাঁর জমিদারীর একাংশ তুলে দিতেন। সেই মধ্যস্বত্বভোগী আবার তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন উপস্বত্বভোগী, যথা—পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতির হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিতেন। বহু ক্ষেত্রে জমিদারেরা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে অর্পণ করে কলকাতায় চলে গিয়ে সেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফলে অনুপস্থিত জমিদারের (Absentee Landlord) সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসাবে পুরাতন ঐতিহ্যশালী বহু জমিদারীগুলি হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু জমিদারী হস্তান্তরের ফলে নতুন জমিদরা হয়ে বসেছিল কারা? অর্থাৎ জমিদারীগুলি কারা কিনেছিল? জেমস মিল এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই জমিদারীগুলি পুরনো

জমিদারদের থেকে কিনে নিয়েছিল। এই বক্তব্য সঠিক নয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে-কেবল ব্যবসাদার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের আমলা, উকিল ও কর্মচারী এবং পেশাদার মানুষ সুদের কারবারী এরা সকলেই সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারীগুলি ক্রয় করে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমির বাজারকে এক ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল—বাজারী অর্থনীতির অনুপ্রবেশ এবং কৃষির বাণিজ্যকরণ। রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত বোঝা কৃষির বাণিজ্যকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। মাত্রাতিরিক্ত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটানোর জন্য তারা প্রায়ই ঋণ নিত। মহাজনেরা নিজেদের পছন্দমত শস্য ফলাতে অধমর্ণ কৃষকদের বাধ্য করেছিল। বর্ধমান ও নদীয়ার চাষীরা নীল, আখ, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের ওপর খাজনার হার আরও বাড়ানো হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বাংলার রায়তদের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানি সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, জমিদারদের সঙ্গে রায়তদের সেরকম কোন চুক্তি হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল যে পরিকল্পনা ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে পেশ করেছিলেন। তাতে কিন্তু রায়তদের পাট্টা দেবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেওয়া হয়নি বা জমিদার ও রায়তের মধ্যে কোন চুক্তি হয়নি। ফলে জমিদার রায়তদের ওপর খাজনার হার নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করতে পারত। বর্ধিত খাজনার চাপে জর্জরিত রায়তেরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর চলত নিষ্ঠুর জমিদারী উৎপীড়ন। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংশোধিত আইনের ৭ নম্বর রেগুলেশনে বলা হল-খাজনা দিতে ব্যর্থ রায়তকে জমিদরা ইচ্ছেমত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। এই আইন রায়তকে তার জমিদারের করুণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—এই আইন জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে এই আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতে 'প্রথম কালা কানুন'। পত্তনি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর জমিতে যখন বিভিন্ন স্তরের উপস্বত্বভোগী বসল তখন কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৮৬০ সালে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে বাংলার কৃষকের ওপর মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের শোষণ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছিলেন। নির্ধারিত খাজনার বাইরেও নানা বেআইনী কর এবং আবওয়াব কৃষকদের ওপর বসানো হয়েছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল উনিশ শতকের বাংলায়ও একের পর এক জঙ্গী কৃষক বিদ্রোহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে আংশিক সাফল্য এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলার রায়তদের বা সার্বিকভাবে বাংলার কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে কর্ণওয়ালিসের দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল। প্রথমত, কোম্পানির সরকার ভূমিরাজস্ব খাতে

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু 'উৎপাদনীশীল নীতি' (Productive Principle) কথাটিকে কর্ণওয়ালিস ও তার সহযোগীরা ১৭৯৩ সালের আগে ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎপাদনশীল নীতির পরিপন্থী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেককেরই আশা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় কৃষি বিপ্লব নিয়ে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। উনিশ শতকে বাংলার জমিদারদের আয় বেড়েছিল মূলত রায়তের ওপর চাপানো বর্ধিত খাজনার জন্য। কৃষির উন্নতির ফলে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পায়নি। কৃষি থেকে আসা আয় জমিদারেরা বিলাস-বৈভব বা দান-খয়রাতিতে ব্যয় করতে; সেই আয় কৃষি বা শিল্পের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয়নি। জমিদারদের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঙ্গলজনক হয়েছিল।

একদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যাপারে বাংলার জমিদারেরা ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত একত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্বারা বাংলার জমিদারদের আচ্ছন্ন করেছিল।

১.৬ সারাংশ

১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলাদেশে কোম্পানির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে বাংলার নবাবের অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঔপনেবিশক রাষ্ট্রকাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার জন্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) এবং পিটের ভারত আইন (১৭৮৪) পাশ হয়। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানির শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং বম্বে ও মাদ্রাজে কোম্পানির কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচার-সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত "কর্ণওয়ালিস কোড" (১৭৯৩) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাকে অনেকটাই পরিণত রূপ দিতে পেরেছিল। একইভাবে রাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রেও হেস্টিংস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কোম্পানির রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল যেভাবে হোক রাজস্ব খাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আয় বাড়ানো। ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে কোম্পানির সংস্কার পরিণতি লাভ করেছিল কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মধ্যে। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি কোম্পানির স্বার্থ কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল।

১.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন:

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা করুন।

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করুন।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন:

৪। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫। বাংলার কৃষির ওপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব আলোচনা করুন।

৬। বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন প্রবর্তিত হয়েছিল?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন:

৭। কোন আইনের দ্বারা গভর্ণর জেনারেল পদটি সৃষ্টি হয়?

৮। কোন আইনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সচিব পদটি সৃষ্টি হয়?

৯। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কী কমিশন কত সালে বসানো হয়?

১০। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?

১১। চিরস্থায়ী প্রবর্তনের সময় কার সঙ্গে কর্ণওয়ালিসের মত বিরোধ হয়?

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. Percival Spear : *The Oxford History of Modern India,* Delhi, 1965.

২. R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhury and K. K. Datta : *An Advanced History of India,* London, 1985.

৩. A. C. Banerjee : *Constitutional History of India,* Calcutta, 1963.

৪. B. H. Baden Powell : *The Land Systems of British India,* Oxfold, 1982.

৫. N. K. Sinha : *The Economic History of Bengal (3 Vols.),* 1956-63.

৬. —(Ed.), *The History of Bengal (1757-1905),* Calcutta, 1967.

7. Sirajul Islam : *The Permanent Settlement of Bengal : A Study of its Operations,* Dhaka, 1979.

8. Ranajit Guha : *A Rule of Property for Bengal, Hague,* 1967.

9. S. C. Gupta : Agrarian Relations and Early British Rule in India, Bombay, 1963.

10. Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.

11. সব্যসাচী ভট্টাচার্য: *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, কলকাতা, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।

12. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়: *বাংলার আর্থিক ইতিহাস: অষ্টাদশ শতাব্দী*, কলকাতা, ১৯৮৫।

13. সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়: *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৬।

একক ২ ❒ ঔপনিবেশিক অভিঘাত: নতুন প্রশাসনিক কাঠামো : আইন-বিচার ব্যবস্থা—দণ্ডবিধি—শিক্ষাব্যবস্থা

গঠন:

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট

২.৩ পিটের ভারত-আইন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ

২.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

২.৪.১ বাংলা: প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৭৯৩)

২.৫ রাজস্ব সংস্কার

২.৬ প্রশাসনিক সংস্কার

২.৭ বিচারব্যবস্থা

২.৮ শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি

২.৯ সারাংশ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন-

- ঔপনিবেশিক অভিঘাতের ফলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।
- রেগুলেক্টিং অ্যাক্ট কিভাবে কোম্পানির শাসনের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ এনেছিল।
- পিটের ভারত-আইন এই নিয়ন্ত্রণকে কিভাবে সুদৃঢ় করেছিল।
- রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী সংস্কারসাধন করা হয়েছিল।

২.১ প্রস্তাবনা

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করার পর (১৭৬৫ খ্রিঃ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন হল একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধান ছাড়া কীভাবে এতবড় একটি ভূখণ্ডের প্রশাসন চালাবে? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজস্ব সংবিধান প্রাচ্য দেশীয় একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার পক্ষে কতটাই বা উপযোগী? পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যেই এ-ব্যাপারে নানা তর্ক-বিতর্ক ছিল। শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) পাশ করে এইসব প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করে। রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে কোম্পানির উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। কোম্পানির গঠনতন্ত্রও এর ফলে পরিবর্তিত হল।

২.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট

এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির অংশীদারদের সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার ক্ষুণ্ণ করল। কোম্পানির চব্বিশজন ডিরেক্টর, যাঁরা প্রতিবছরই নির্বাচিত হতেন, এখন থেকে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হলেন। এদের এক-চতুর্থাংশ প্রতিবছর অবসর নেবেন স্থির হল। এই আইনে আরও স্থির হল যে ভারত থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ট্রেজারীর কাছে পেশ করতে হবে। সামরিক এবং বেসামরিক বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র ও তথ্য সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে পেশ করতে হবে। সুতরাং এইভাবে এই প্রথম কোম্পানির কাজকর্মের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হল।

কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও এই আইন কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিল। বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হলো একজন গভর্ণর জেনারেল এবং চারজন সদস্যের এক কাউন্সিলের উপর। কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে স্থির হল। কোন ব্যাপারে কাউন্সিলে দু'পক্ষের সমান সমান ভোট হলে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) দিয়ে তার মীমাংসা করবেন বলে বলা হল। এই আইন অনুসারে প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস এবং চারজন কাউন্সিলার হলেন ক্ল্যাভারিং (Clavering), মনসন (Monson), বারওয়েল (Barwell) এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis)। স্থির হল এঁদের উত্তরসূরিরা কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্টে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্যও একজন গভর্ণর ও কাউন্সিলের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাধারণ প্রশাসনিক ব্যাপারে এই দুই প্রেসিডেন্সি কলকাতা প্রেসিডেন্সির থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল; কিন্তু স্থির হল যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে এই দুই প্রেসিডেন্সি বাংলার গভর্ণর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের অধীনে থাকবে। তাছাড়া, এই আইনে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হল। একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন সাধারণ বিচারপতিকে নিয়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সুপ্রীম কোর্ট। স্যার ইলিজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ক্রটিমুক্ত ছিল না। বস্তুত সুপ্রীম কোর্টের এলাকা, বাংলার সরকারের সঙ্গে এই কোর্টের সম্পর্ক কিংবা গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের আইনে কোন সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। বস্তুত রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান অংশ ছিল দু'টি—একটি কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে চেয়েছিল প্রধানত ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদের নিরাপত্তা দিতে আর কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালনব্যবস্থা উৎসাহিত করতে। কিন্তু ডিরেক্টর সভা আর ভারতে ইংরেজ শাসকদের গোষ্ঠীবিরোধ সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাছাড়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর কলকাতা প্রেসিডেন্সীর কর্তৃত্ব এই আইনে সুনির্দিষ্ট না থাকায় এই দুই প্রেসিডেন্সী কার্যত স্বাতন্ত্র্য নিয়েই শাসনকার্য চালাতে থাকে। এর ফলে শুধুমাত্র প্রশাসনিক জটিলতাই বাড়েনি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ব্যাপারেও নানা পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত ডিরেক্টর সভাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। উপরন্তু, গভর্ণর-জেনারেলের প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শাসনকার্যে অনেক সময় অবাঞ্ছিত অসুবিধের সৃষ্টি হয়। বিচারকার্যেও নানা জটিলতা বাড়ে, কেননা সুপ্রীম কোর্ট বিচার পরিচালনা করত ইংল্যান্ডের আইন মোতাবেক; অন্যদিকে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত বিচার করত গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল রচিত ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন অনুসারে। সুতরাং এককথায় বলা যেতে পারে, রেগুলেটিং অ্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু এর পরিবেশনা ছিল ক্রটিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, এই আইন একেবারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এমন কথা বলা যায় না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল প্রথম লিখিত সংবিধান। বলা যেতে পারে, কোম্পানির হাত থেকে পার্লামেন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে লক্ষ্য করা যায় এখানেই তার সূচনা হয়েছিল।

২.৩ পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট কার্যকর ছিল ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, এগারো বছর। এই সময়কালের মধ্যে এই আইনের নানা ক্রটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোম্পানির ভারতীয় প্রশাসনে নানা দিক থেকে ব্যর্থতা পার্লামেন্টকে বিব্রত করে। ইতিমধ্যে আমেরিকার ঔপনিবেশগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। আর্থিক অনটনে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার ভাবতে শুরু করে কীভাবে ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ব আমদানি করে এই আর্থিক সঙ্কটের নিরসন করা যায়। ১৭৮৩ খ্রিঃ নাগাদ কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানালে কোম্পানির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে, কেননা বার্ক প্রমুখ অনেকে দাবি জানালেন যে, কোম্পানির গঠনতন্ত্রের সংস্কার ব্যতীত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত হবে না। প্রধানত কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী পিট পার্লামেন্টে একটি বিল নিয়ে এলেন এবং ঐ বছরই 'পিটের ভারত আইন' নামে তা পাশ হল।

'পিটের ভারত-আইন অনুসারে ছ'জন কমিশনারের উপর ভারতবর্ষের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা

হল। এঁরা হলেন, একজন রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State), ব্রিটিশ অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer) এবং ইংল্যান্ডের রাজার মনোনীত চারজন প্রিভি কাউন্সিলার (Privy Councillors)। এদের নিয়ে গঠিত হল বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control)। বোর্ড অব কন্ট্রোলের হাতে অর্পিত হল কোম্পানির সামরিক ও অ-সামরিক দায়-দায়িত্ব। কোম্পানির যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করার অধিকার ছিল এঁদের। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন যাবতীয় চিঠিপত্র বোর্ড অব কন্ট্রোলের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। অংশীদার-সভার (Court of Proprietors) ক্ষমতা রীতিমতো হ্রাস করা হল। কারণ বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর কোন সিদ্ধান্ত বোর্ড অব কন্ট্রোলের কমিশনাররা অনুমোদন করলে তা অংশীদার-সভা বাতিল বা রদ করতে পারত না।

পিটের ভারত-আইন ভারতীয় প্রশাসনের কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল। গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা তিনজনে কমিয়ে আনা হল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলারদের অভিমতের বিরুদ্ধে গভর্ণর-জেনারেলকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল। পিটের ভারত-আইনে বলা হল, রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার ইংল্যান্ডের জাতীয় মর্যাদা ও নীতি বহির্ভূত।

পিটের ভারত-আইন সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ জাতীয় নীতির অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হল। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের যাবতীয় শাসকশ্রেণীর অন্যতম স্বর্ণমৃগয়ার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল। কোম্পানিও সন্তুষ্ট হলো, কেননা তার ভারতবর্ষীয় ও চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রক্ষিত হয়েছিল। কোম্পানির ডিরেক্টররাও খুশী হলো, কারণ তাদের হাতে ভারতে ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

পিটের ভারত-আইন এদেশে একটি সাধারণ প্রশাসন কাঠামো প্রবর্তন করেছিল যা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূলগতভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এই সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল আর তার ফল হয়েছিল এই যে কোম্পানির ক্ষমতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছিল। সংক্ষেপে সেইসব প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1793) মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর গভর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনে (Charter Act of 1813) চীন দেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বহাল রইল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য এখন থেকে সকগলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1833) চীনদেশের সঙ্গেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করা হল। কোম্পানি কার্যত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এখন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ভারতের প্রশাসনিক কাজকর্ম বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের কঠোর তত্ত্বাবধানে কোম্পানির মাধ্যমেই পরিচালিত হতে লাগল। তবে এই আইনে ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হল। বাংলার গভর্ণর এখন থেকে সমগ্র ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও বাংলার গভর্ণর বলে পরিচিত হলেন। গভর্ণর-জেনারেল কাউন্সিলে একজন আইন-সদস্য (Law member) নিযুক্ত করা হল। এর ফলে কেন্দ্রীয়

সরকারের আইন-প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পৃথকীকরণের সূচনা হল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1853) আরও পরিবর্তন আনা হল। ডিরেক্টরদের সংখ্যা কমিয়ে করা হল আঠারো। এদের মধ্যে তিনজনকে (পরে ছ'জনকে) নিযুক্ত করবেন ব্রিটেনের রাজা। বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টের বেতন রাষ্ট্রসচিবের সমতুল্য করা হল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলারদের নিয়োগ এখন থেকে রাজার অনুমোদনসাপেক্ষ হল।

মোটকথা, পার্লামেন্টের বিভিন্ন সনদ-আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির প্রশাসনকে পুরোপুরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল। আবার একথাও স্বীকার করা হল যে দৈনন্দিন শাসনকার্য ছ'হাজার মাইল দূর থেকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করা ব্রিটেনের রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হল পার্ষদ গভর্ণর-জেনারেলের হাতে (Governor-General-in-Council)। গভর্ণর-জেনারেলই, যিনি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে নাচক করতে পারতেন, ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকৃত সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন।

২.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

২.৪.১ বাংলা: প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৭৯৩)

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে যদিও কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দু'জন নায়েব-দেওয়ানের হাতে-রেজা খাঁকে বাংলায় আর সিতাব রায়কে বিহারে। যা রাজস্ব আদায় হত তার থেকে কোম্পানি ভারত সম্রাটকে দিত ২৬ লক্ষ টাকা আর ৩২ লক্ষ টাকা দিত বাংলার নবাবকে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য। বাকী অর্থ কোম্পানি নিত নিজস্ব ব্যয়-নির্বাহের জন্য। এটিই ছিল ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন।

কী কোম্পানি, কী দেশীয় জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত-শাসনের ফল হয়েছিল মারাত্মক। এই ব্যবস্থায় নায়েব-দেওয়ানরা অবশ্য অবৈধভাবে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। তাই ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তারা হেস্টিংসকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠালেন এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য। হেস্টিংস দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটালেন এবং দেওয়ানী শাসন পরিচালনার ভার কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করলেন। নায়েব-দেওয়ানের পদও বিলুপ্ত করা হল; বাংলার নায়েব রেজা খাঁ ও পাটনার নায়েব সিতাব রায়কে পদচ্যুত করা হল। সরকারি কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত হল। নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৬ লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হল। হেস্টিংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মুনী বেগমকে নবাবের অভিভাবক আর মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কোম্পানির হাতেই বর্তাল। আর মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতা হয়ে উঠল কোম্পানি-প্রশাসনের প্রকৃত কেন্দ্রস্থল।

প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব হাতে নিয়ে হেস্টিংস একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। কাজটি সহজ ছিল না, কেননা কোম্পানির প্রশাসন যন্ত্র এ-যাবৎ শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। এখন তাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হল। কোম্পানির কর্মচারীদের মনোবলও তেমন ছিল না। এদেশে পাবলিক সার্ভিসের ট্রাডিশনও গড়ে ওঠেনি। এদেশীয় ভাষা, আচার, ব্যবহার জন সংযোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই বাংলায় ব্রিটিশ সরকারকে রীতিমতো অসুবিধেজনক পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কুড়ি বছর সময়কালে হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি ইন্দো-ব্রিটিশ শাসন-কাঠামো বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। এই শাসন-কাঠামোর মুখ্য দুটি দিক হল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও বিচার পদ্ধতি। প্রশাসনের এই মুখ্য দুটি বিষয় কীভাবে এই দুই গভর্ণর-জেনারেলের আমলে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

২.৫ রাজস্ব সংস্কার

কোম্পানির রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল দু'জন নায়েব-দেওয়ানের উপর। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস নায়েব-দেওয়ান পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কিছু পরিদর্শক (Supervisor) নিয়োগ করেছিলেন। পরিদর্শকদের উপর দায়িত্ব ছিল প্রচলিত রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার। পরিদর্শকরা তাদের কাজে ব্যর্থ হলে রাজস্ব প্রশাসনব্যবস্থা রাজস্ব বোর্ডের (Board of Revenue) হাতে দেওয়া হয়। জমির খাজনা আদায়ের জন্য পাঁচ বছরের ব্যবস্থায় নিলাম ডাকা হয়। একজন কালেক্টর এবং একজন ভারতীয় দেওয়ানের মাধ্যমে প্রতি জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই ব্যবস্থার ফলাফল হয়েছিল নানা দিক থেকে ভয়াবহ। অসাধু ফাটকাবাজরা জমিদারী পাবার আশায় চড়া নিলামে জমিদারী কিনে নেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় পুরানো জমিদারদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতিমত রাজস্ব আদায়ে তারা ব্যর্থ হয়। এইসব ভুঁইফোড় জমিদারদের জমিতে কোন স্থায়ী স্বার্থ ছিল না; তাই নির্দিষ্টি, মেয়াদকালের মধ্যে তারা রায়তদের অপরিসীম শোষণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তাদের খাজনা বকেয়া পড়ে যায়; কালেক্টররা এদের অনাদায়ী খাজনার দায়ে গ্রেপ্তার করে। এইভাবে জমিদার ফাটকাবাজ, রায়ত সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোম্পানিও আর্থিক দুর্গতিতে পড়ে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করা হল। রাজস্ব বোর্ডের দু'জন সদস্য ও কোম্পানির তিনজন ঊর্ধতন কর্মচারীদের নিয়ে কলকাতায় একটি রাজস্ব কমিটি (Committee of Revenue) গঠন করা হল। ইয়োরোপীয় কালেক্টরের পদ তুলে দেওয়া হল এবং প্রতি জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব একজন করে ভারতীয় দেওয়ানের হাতে ন্যস্ত হল। ছ'টি প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হল আর বিশেষ কমিশনারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি মাঝেমধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হল।

এইসব পরিবর্তনের ফলে অবস্থার যে খুব উন্নতি হল তা নয়। তাই এই ব্যবস্থায় পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হলে আবার বাৎসরিক মেয়াদে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হল। পুরানো জমিদাররা যাতে নিলামে জমির ইজারা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আবার একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হল। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনের পুরো ব্যাপারটি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত করা হল। একটি নতুন রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করা হল। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি তুলে দেওয়া হল আর প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করা হল ঠিকই, তবে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হল।

এই ব্যবস্থা অতি-কেন্দ্রীকরণের সমস্ত কুফল নিয়ে ভেঙ্গে পড়ল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরও একটি কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। জেলাগুলিকে এখন থেকে রাজস্ব প্রশাসনের এককেটি একক হিসাবে গণ্য করা হল। কালেক্টরদের দায়িত্ব দেওয়া হলো অনেক বেশি; রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় জেলাস্তরের দায়িত্ব এখন কালেক্টরদের উপরই বর্তাল। প্রথমে সারা বাংলাদেশকে ৩৫টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাজ এর সংখ্যা কমিয়ে করা হল ২৩টি। রাজস্ব-কমিটি পুনর্গঠিত হয়ে রাজস্ব বোর্ড নামে পরিচিত হল। এর সভাপতি হলেন কাউন্সিলেরই একজন সদস্য। বোর্ডের কাজকর্মের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হল, প্রধান সেরেস্তাদার নামে একজন নতুন অফিসারের উপর রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল। এ-কাজটি আগে কানুনগোর নিজস্ব ব্যাপার ছিল।

বাৎসরিক জমির বন্দোবস্ত ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এটি ছিল নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। জমিতে জমিদারদের আরও স্থায়ী বন্দোবস্ত দেবার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু জমির মালিকানা বা স্বত্ব নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানা মতামত ও তর্কবিতর্ক চলছিল বলে জমিতে স্থায়ী স্বত্বদানের বিষয়টি কার্যকরী হতে দেরী হচ্ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে জমির চিরস্থায়ী স্বত্বদানের ব্যাপারটি আছে তা কোম্পানির বিভিন্ন অফিসাররা ইতিমধ্যেই প্রচার করে আসছিলেন। এদের মধ্যে আমরা আলেকজাণ্ডার ডাও (Alexander Dow), হেনরি পাত্তুলো (Henry Pattullo) কিংবা ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর (Philip Francis) নাম করতে পারি। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের পিটের ভারত-আইনেও এই ধারণাটি অস্পষ্ট আকারে ছিল। এরপর ১৭৯৮-৯০ খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস যখন দশসালা বন্দোবস্ত করলেন তখন তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

বিষয়টি সম্পর্কে নানা তর্ক-বিতর্ক শেষপর্যন্ত গ্রান্ট-শোর কেন্দ্রীভূত হল। কর্ণওয়ালিস প্রচলিত রাজস্বের পরিমাণ, বিভিন্ন অঞ্চলের জমির মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জন শোরকে (John Shore) দায়িত্ব দেন। শোর টোডরমলের আমল থেকে মীরকাশিমের আমল পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্তের নানা দিক পর্যালোচনা করে ঘোষণা করেন যে জমিদারই প্রকৃত জমির মালিক, বংশানুক্রমিক তারা তাদের ভূসম্পত্তির উপর মালিকানা বজায় রেখেছে, তাই সরকার তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্বতন জমিদারদের সঙ্গেই জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যদিকে জেমস গ্রান্ট (James Grant) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মুঘল আমলে মুঘল সরকারই ছিলেন জমির প্রকৃত

মালিক; জমিদারদের তাঁরা কেবল জমির খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

নানা তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল— প্রথমত, জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীরা ভূস্বামী (landlord) বলে পরিগণিত হলেন। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাজস্ব আদায় করার অধিকার তো তাঁরা পেলেনই, উপরন্তু নিজের নিজের জমিদারী এলাকায় সমগ্র জমির মালিক বলে তাঁরা আইনসঙ্গত স্বীকৃতি পেলেন। এই মালিকানা-স্বত্ব বংশানুক্রমিক বলে স্বীকৃতি পেল; জমি হস্তান্তর করার অধিকারও জমিদাররা পেল। অন্যদিকে কৃষকরা নিছক রায়তে পরিণত হল; জমির উপর দীর্ঘকালের সাবেকী অধিকার থেকে রায়তরা বঞ্চিত হল। গোচারণ ক্ষেত্র, খাল-বিলে মৎস্য চাষ কিংবা আবাদী জমির উপর তাদের সাবেককালের অধিকারও চলে গেল। তারা পুরাপুরি জমিদারদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করত তার ১০/১, অংশ ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হত আর অবশিষ্ট $^{১}/_{১১}$ অংশ জমিদার নিজের কাছে রাখত। খাজনাদানের এই বিধিব্যবস্থা বরাবরের জন্য স্থির হয়েছিল। জমিদরা যদি তার জমির আয়তন বাড়াতে পারত, কিংবা কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে পারত, কিংবা প্রজাদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনার থেকেও বেশি আদায় করতে পারত তাহলে সেটি হত তার নিজের আয়। রাষ্ট্র আর নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত দাবি করতে পারত না। তবে রাষ্ট্রের কোষাগারে জমিদারকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই খাজনা জমা দিতে হত। অন্যথায় জমিদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

প্রথমের দিকে জমিদারদের দেয় রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল খুবই চড়া হারে। কোম্পানির লক্ষ্যই ছিল কীভাবে সবচেয়ে বেশি খাজনা আদায় করা যায়। ১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের মধ্যে খাজনার দাবি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জন শোর হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে বাংলার কৃষি উৎপাদন যদি ১০০ ধরা হয় তাহলে সরকারের দাবি ছিল ৪৫। জমিদারদের পাওনা হতো ১৫ আর বাকি ৪০ পেত প্রকৃত কৃষক। অত্যন্ত চড়া হারে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হওয়ার ফলে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ-এর মধ্যে বাংলার অর্ধেক জমিদারীই বিক্রি হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে সরকারি আমলারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে বাংলা ও বিহারের জমিদাররা অধিকাংশ জমির ক্ষেত্রেই জমির স্বত্বাধিকার ভোগ করতেন না। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার তাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্বদান করলেন কেন তার কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যার মেনে নেওয়া হয় যে ব্যাপারটি ভুল বোঝাবুঝি থেকেই ঘটেছিল। ইংল্যান্ডে ঐ সময় ভূমিব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল জমিদার আর ব্রিটিশ আমলারা ভারতীয় জমিদারদের ব্রিটিশ জমিদারদেরই সংস্করণ ভেবেছিল। কিন্তু অন্তত একটি ব্যাপারে ভারতীয় ও ব্রিটিশ জমিদারদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য ছিল। ব্রিটেনের জমিদার শুধুমাত্র রায়তের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেই জমির মালিক ছিল না, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেও জমির প্রকৃত মালিক ছিল। কিন্তু বাংলার জমিদার সে-অর্থে শুধুমাত্র রায়তের কাছেই জমিদার; রাষ্ট্রের কাছে সেও ছিল প্রজামাত্র। বস্তুত কোম্পানির

কাছে বাংলার জমিদার বড় রায়তে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটেনের জমিদার রাষ্ট্রকে তার আয়ের স্বল্পাংশ দিত ট্যাক্স হিসেবে। পক্ষান্তরে বাংলার জমিদার রাষ্ট্রকে দিত তার আয়ের ১০/১১ অংশ। তাকে জমির মালিক মনে করা হলেও, জমিদারকে জমি থেকে উৎখাত করা যেত যদি সে তার বাৎসরিক দেয় খাজনা যথাসময়ে সরকারকে জমা দিতে ব্যর্থ হত।

আবার বেশকিছু ঐতিহাসিক বাংলার জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়ার পিছনে গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেছেন। এখানে প্রধানত, তিনটি বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমটি বিশুদ্ধ রাষ্ট্রকৌশল থেকে উৎসারিত হয়েছিল। কোম্পানি এদেশে রাজনৈতিক মিত্রগোষ্ঠী অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে যেহেতু তাঁরা এদেশে বিদেশী তাই এদেশে অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য প্রয়োজন। আঠারো শতকের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি গণবিক্ষোভ কোম্পানিকে এ-জাতীয় ভাবনায় প্রণোদিত করেছিল। তাই কোম্পানি একটি সুবিধাভোগী ও সম্পদশালী গোষ্ঠী তৈরি করেছিল জমিদারশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে, যারা নিজেদের সুযোগসুবিধা ও ভূমিজ স্বার্থ সুরক্ষার জন্যই ব্রিটিশকে এদেশে সুস্থির প্রতিষ্ঠায় রাখতে উৎসাহী হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিষয়টি ছিল অর্থনৈতিক এবং সম্ভবত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত কোম্পানির কোন সুস্থির আয়ের উৎস ছিল না যার উপর নির্ভর করে তারা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরোপুরি উদ্যোগী হতে পারে। কোম্পানিকে সবসময়ই আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকতে হ'ত কেননা বাংলার ভূমিরাজস্বের অনেকটাই ব্যয় হয়ে যেত যুদ্ধবিগ্রহে, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর প্রশাসন বাবদে কিংবা রপ্তানিযোগ্য পণ্য খরিদ করতে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ফলে কোম্পানির আয়ে একটি স্থিরতা এল। উপরন্তু কোম্পানি তার আয়ও এই সুবাদে বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল, কেননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমিরাজস্বের দাবি আগের থেকে অনেক বেশিই নির্ধারিত হয়েছিল। গুটিকয়েক জমিদারের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের চেয়ে সহজতর ও কম ব্যয়সাপেক্ষ হয়েছিল। তৃতীয়ত, আশা করা গিয়েছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভূমিরাজস্ব যেহেতু বরাবরের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে যেহেতু ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না, তাই জমিদাররা চাষ-আবাদ আরও বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয়েছিল, কেননা জমিদার জমি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বাড়ালেও সে বর্ধিত আয়ে কোম্পানির হক ছিল না।

চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে উড়িষ্যা, মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চলের জেলায় এবং বারাণসীতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। মধ্যভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এবং অযোধ্যাতে ব্রিটিশ সরকার কিছুদিনের জন্য একটি ভূমিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল যাতে জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়া হল কিন্তু ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কিছুদিন অন্তর পরিবর্তন করা হত।

দক্ষিণভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হলে ভূমিব্যবস্থার নতুন সমস্যা দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী কোন জমিদার

নেই যাদের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত করা যায়। তাই রীড (Reed) এবং মুনরো (Munro) প্রমুখ মাদ্রাজের সরকারি কর্মচারীরা প্রস্তাব দিলেন যে জমির প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থির করা হোক। তারা আরও বললেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেননা, কোম্পানি জমিদারদের উপর রাজস্বের দাবি বৃদ্ধি করতে পারছে না, যদিও জমিদাররা নিজেদের আয় ভূমিসংস্কর ও ভূমি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। আরও বড় কথা, কৃষকদের জমিদারদের মেজাজ-মর্জির পর পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের কথা বলা হল যে ব্যবস্থায় রায়তকেই জমির মালিক বলে মানা হল যদি সে তার জমির খাজনা ঠিকসময়ে জমা দিতে পারে। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রবক্তারা দাবি করলেন যে এটি এদেশের সাবেকী ব্যবস্থারই পুনঃপ্রচলন। শেষপর্যন্ত, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সির কিছু অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথমের দিকে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করা হল। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, বিশ-তিরিশ বছর অন্তর রায়তদের সঙ্গে নতুন শর্তে এটি পুনর্নবীকরণ করা হত। স্বভাবতই নতুন চুক্তিতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি পেত।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে প্রকৃতপক্ষে জমিতে রায়তের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল না। রায়তরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ছোট ছোট জমিদারের পরিবর্তে এখন একটি সুবৃহৎ জমিদার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই সার্বভৌম জমিদারটির নাম হলো রাষ্ট্র। তারা এখন নিতান্তই সরকারের চাষী; খাজনা দিতে না পারলে তাদের জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে। অধিকাংশ অঞ্চলেই ভূমিরাজস্ব যথেষ্ট উচ্চহারে ধার্য হয়েছিল। মাদ্রাজে সরকার জমির উৎপাদনের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ নিয়ে নিত রাজস্ব হিসেবে। রাজস্ব বৃদ্ধির অধিকার সরকারের ছিল; বন্যা বা খরায় শস্যহানি হলেও রাজস্ব রেহাই ছিল না।

জমিদারী ব্যবস্থারই এক পরিবর্তিত রূপ প্রবর্তন করা হয়েছিল গাঙ্গেয় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মধ্যভারতের কিছু অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে যা মহলওয়ারী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই ধরনের ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব স্থির হয়েছিল একেকটি গ্রাম বা মহলকে একক ধরে স্থানীয় জমিদার বা পরিবার প্রধানদের সঙ্গে যারা সমষ্টিগতভাবে গ্রামের বা মহলের জমিদার বলে পরিচিত হত। মহলওয়ারী ব্যবস্থাতেও ভূমিরাজস্ব কয়েক বছর অন্তর পরিবর্তিত হত।

কী জমিদারী, কী মহলওয়ারী, কী রায়তওয়ারী সব ব্যবস্থাই এদেশের চিরাচরিত ব্যবস্থার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ব্রিটিশ এদেশে এধরনের নতুন মালিকানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যাতে প্রকৃত কৃষকের কোন সুফল বা উপকার হত না। এখন সারা দেশেই বিক্রয়যোগ্য, বন্ধকযোগ্য এমনকি হস্তান্তরযোগ্য পণ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করা হল। এর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারের রাজস্বকে সুরক্ষিত করা। জমি বিক্রয়যোগ্য কিংবা হস্তান্তরযোগ্য না হলে যে কৃষক বা জমিদারের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার কাছ থেকে সরকার খাজনা আদায় করতে পারত না। এখন অসচ্ছল চাষী তার জমির একাংশ বন্ধক বা বিক্রি করে খাজনা মেটাতে পারত। আর তা যদি সে না করত তাহলে সরকার তার জমি নিলাম করে দিয়ে খাজনা উসুল করে নিত। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার আরও একটি কারণ ছিল; ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করত

যে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে জমির মালিক জমির উন্নতিতে সচেষ্ট হবে।

ইংরেজরা এদেশে এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে এক বিরাট পরিবর্তন এনে ফেলেছিল। এদেশের গ্রাম্যজীবন যে এযাবৎ একধরনের অনড়তা বা প্রবহমান পরিবর্তনহীনতা ছিল তা নতুন ভূমিব্যবস্থায় ভেঙ্গে পড়ল। গ্রামীণ সংগঠন ও গ্রামজীবন এখন থেকে এক বৃহত্তর পরিবর্তনের অংশীদার হয়ে উঠল।

২.৬ প্রশাসনিক সংস্কার

শুরুতে কোম্পানি এদেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম ভারতীয় কর্মচারীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল; প্রয়োজনীয় তদারকি ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার তেমন গরজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল এভাবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। ফলত প্রশাসনের কিছু কিছু ব্যাপার নিজের হাতে তুলে নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের আমলে প্রশাসনের উপরের দিকের পদগুলি পুনর্গঠিত করা হয় স্বদেশের শাসনকাঠামো অনুযায়ী। কিন্তু যতই ব্রিটিশ শক্তি নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হতে লাগল, নতুন নতুন সমস্যাও তৈরি হল। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যটি স্থির রেখে শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দরকার হল।

অধ্যাপক বিপানচন্দ্র মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভ ছিল: সিভিল সার্ভিস, সেনাদল এবং পুলিশ। ব্রিটিশ প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কেননা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থায়ী না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য নিরুপদ্রবে করা যাবে না। এদেশে ব্রিটিশরা ছিল বিদেশী; সুতরাং ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করা তাদের বিবেচনায় সুদূর পরাহত ছিল। স্বভাবতই জনবাদী প্রশাসকের ভূমিকার পরিবর্তে ব্রিটিশ এদেশ শক্তিশালী শাসকের ভূমিকার কথা ভাবছিল। বস্তুত কর্ণওয়ালিস সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন করেছিলেন এই লক্ষ্য সামনে রেখে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ভারতে আসেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্যই ছিল প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন কোম্পানির কর্মচারীদের যথোপযুক্ত বেতন না দিলে এ-কাজটি সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই তিনি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন। কোনরকম উৎকোচ বা উপহার গ্রহণের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিলেন। একই সঙ্গে তিনি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করলেন। যেমন জেলার কালেক্টরদের মাসিক বেতন নির্ধারিত হল ১৫০০ টাকা; এর উপর জেলার আদায়ীকৃত রাজস্বের এক শতাংশ কমিশনের ব্যবস্থা হল। বস্তুত কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের বেতন এই সময় সারা বিশ্বে ছিল সর্বোচ্চ।

লর্ড ওয়েলেসলী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণের জন্য। কোম্পানির ডিরেক্টররা অবশ্য এ-কাজটি অনুমোদন করেননি। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে হেইলেবেরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে স্থির হল সিভিল সার্ভিসের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভারতীয়দের পুরোপুরি বর্জন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল বছরে ৫০০ পাউন্ড বা তদূর্ধ বেতনের পদগুলি সাহেবদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করত

ব্রিটিশ ধ্যানধারণা ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রশাসন ব্রিটিশ আমলাদের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভাল চালানো যাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের সততার উপর ব্রিটিশদের আস্থা ছিল না। কর্ণওয়ালিস বিশ্বাস করতেন, 'হিন্দুস্তানের প্রতিটি মানুষই হলো দুর্নীতিগ্রস্থ।' কর্ণওয়ালিস ভুলে গিয়েছিলেন, এদেশে ব্রিটিশ আমলাদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান সত্যি। তিনি ব্রিটিশ আমলাদের বেতন বৃদ্ধি করে এই রোগটি নিরাময়ের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ভারতীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর প্রবল অনীহা ছিল। আসলে, সরকারি উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের অপসারণ ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিল। সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্যই ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী ও সুস্থির করা। আর এ-কাজটি ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে যে হবে না তা ব্রিটিশরা ভাল করেই বুঝেছিল। তাছাড়া, ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষরাও চায়নি যে সিভিল সার্ভিসের মতো লোভনীয় পদগুলিতে ভারতীয়দের গ্রহণ করা হোক। এই মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলি পেতে তারা নিজেদের মধ্যেই রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল। আর অপেক্ষাকৃত নিচের পদগুলিতে যেখানে সম্মান, মর্যাদা ও বেতন তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে ভারতীয়দের বিপুল পরিমাণে নিয়োগ করা হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল সেনাদল। সেনাদলের মাধ্যমে ব্রিটিশ এদেশে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছিল। (ক) ভারতীয় রাজন্যবর্গকে পরাহত করতে সেনাদলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম, (খ) বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে সেনাদল ভারতীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিল, (গ) আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ-আন্দোলন থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়েছিল, (ঘ) ভারতীয় সেনাদলের মাধ্যমেই ব্রিটিশ তাদের এশীয় ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য রক্ষা ও সম্প্রসারণ সম্ভব করেছিল।

কোম্পানির সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয়। আধুনিক উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে বহু ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, মহাবিদ্রোহের সময়ে, ভারতীয় সেনাদলে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩,১১,৪০০; এর মধ্যে ২,৬৫,৯০০ জন সেনা ছিল ভারতীয়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা ছিলেন অবশ্য পুরোপুরি ব্রিটিশ, বিশেষত কর্ণওয়ালিকের আমলে। ভারতীয় সিপাইদের বেতন ছিল কম, পদোন্নতির সুযোগ ছিল আরও কম। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাদলে মাত্র তিনজন ভারতীয় সেনার মাসিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ ছিল সবেদার পদ পর্যন্ত। ভারতীয়রা ব্রিটিশ সেনাদলে সুযোগ পেয়েছিল কেননা ব্রিটিশ সেনা নিয়োগ করা ব্যয়বহুল বিবেচিত হয়েছিল। তাছাড়া বিপুল সংখ্যায় ব্রিটিশ সেনা মেলাও সহজ ছিল না, কেননা ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল বিরাট ভারতীয় সেনাদলের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। তবে কিছু ব্রিটিশকে সাধারণ সেনাপদে নিয়োগ করা হয়েছিল যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় সিপাইদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এত কমসংখ্যক ব্রিটিশ সেনার নেতৃত্বে বিপুল ভারতীয় সিপাইরা যে এদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারেই সহযোগী হয়েছিল তা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, ঐ সময় আধুনিক জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় তা এদেশে ছিল না। বিহারের একজন সিপাই ভাবতে পারত না যে সে পাঞ্জাবী বা মারাঠীদের দমন করতে কোম্পানিকে সাহায্য করছে বা সে

এভাবে ভারত-বিরোধী কাজ করছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সিপাইদের রাজশক্তির কাছে আনুগত্যের একটি পরম্পরাগত ঐতিহ্য ছিল। যার নুন খেয়েছি, তার গুণ গাইব-এই ছিল তাদের সনাতন বিশ্বাস। কোম্পানি তাদের বেতন দিত নিয়মিত। সুতরাং কোম্পানিকে সেবা করা ছিল তাদের ধর্ম।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পুলিশবাহিনী। ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্ব হল কর্ণওয়ালিসের। তিনি জমিদারদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যবহতি দেন; পরিবর্তে শান্তিরক্ষার ভার পড়ল স্থায়ী পুলিশবাহিনীর উপর। ভারতীয় প্রাচীন থানা-ব্যবস্থারই তিনি আধুনিকীকরণ করলেন। প্রত্যেক থানায় তিনি ভারতীয় দারোগার উপর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দিলেন। আরও পরে, জেলা পুলিশ আধিকারিকের (District Superintendant of Police) পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল যার উপর জেলা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। পুলিশ বিভাগের যাবতীয় উচ্চপদেও ভারতীয়দের নিয়োগ-সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার ছিল চৌকিদারের উপর যাদের বেতন বাবদ ব্যয় বহন করত সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী। পুলিশী ব্যবস্থায় নানা অপরাধের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল; বিশেষত গ্রামীণ ডাকাতির সংখ্যা কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-দমনেও পুলিশ যথেষ্ট তৎপতা দেখাত।

২.৭ বিচারব্যবস্থা

ব্রিটিশরা এদেশে আধুনিক বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বিচারব্যবস্থার গোড়পত্তন করলেও প্রকৃত বিচার-কাঠামো গড়ে উঠেছিল কর্ণওয়ালিকের আমলে। প্রতিটি জেলাতে স্থাপিত হয়েছিল দেওয়ানী আদালত। দেওয়ানী আদালতের সর্বোচ্চ বিচারক হলেন জেলা-জজ। কর্ণওয়ালিস এইভাবে সিভিল জজ ও কালেক্টরের পদদুটিকে পৃথক করে গড়ে তুললেন। জেলা কোর্ট থেকে প্রথমে চারটি প্রাদেশিক আপীল আদালতে আবেদন করা যেত। মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারত সদর দেওয়ানী আদালতে। জেলা আদালতের নিচে ছিল বিচারক পরিচালিত রেজিস্ট্রারের আদালত এবং ভারতীয় বিচারক পরিচালিত মুন্সেফ ও আমীনের আদালত।

ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কর্ণওয়ালিস বাংলা প্রেসিডেন্সীকে চারটি ভাবে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে ভ্রাম্যমান আদালত (Court of Circuit) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিচারালয়গুলিতে বিচারের ভার ছিল ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্টদের উপর। সার্কিট কোর্টের নিচে ছিল ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট পরিচালিত অনেকগুলি বিচারালয় যেখানে ছোটখাটো মামলার বিচার হত। সার্কিট কোর্ট থেকে সদর নিজামত আদালতে আপীল করা যেত। ফৌজদারী আদালতে মোটের উপর মুসলিম ফৌজদারী আইন বলবৎ করা হত। আর দেওয়ানী আদালতগুলিতে দেশ-অঞ্চলের প্রচলিত প্রথা ও আচারকে মান্যতা দেওয়া হত।

প্রাদেশিক আপীল ও সার্কিট কোর্টগুলি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তুলে দেন। এইসব আদালতের কাজগুলি প্রথমে কমিশন ও পরে জেলা-জজ ও জেলা কালেক্টরদের উপর ন্যস্ত করা হয়। বেন্টিঙ্ক বিচারকদের পদমর্যাদা ও পদোন্নতি ঘটান। তাঁর আমলে ভারতীয় বিচারকরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-অর্ডিনেট জজ

(Subordinate Judge) ও প্রধান সদর আমীনের পদ লাভ করতে পারত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে হাই কোর্ট (High Court) স্থাপিত হল আর সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত তুলে দেওয়া হল।

দেশীয় আইন, প্রথা ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ আমলের আইন গড়ে উঠলেও ব্রিটিশরা এদেশে শরিয়ত ও শাস্ত্রের বিধান ছাড়াও নতুন আইন রচনা করেছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে আইনে প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ঐ বছরেই সরকার লর্ড মেকলের (Lord Macauley) সভাপতিত্বে একটি আইন কমিশন (Law Commission) স্থাপন করেছিল প্রচলিত ভারতীয় আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য। এই কমিশনের প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) রচিত হয়েছিল।

তত্ত্বগতভাবে, ইংরেজরা এদেশে আইনের অনুশাসন (The Rule of Law) প্রতিষ্ঠা করেছিল। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল প্রশাসন আইন মোতাবেক কাজ করবে। প্রজাবর্গের অধিকার, বিশেষ সুবিধা এবং নাগরিক কর্তব্য সবই সুস্পষ্ট আইনের নির্দেশে নির্ধারিত হবে, শাসকের খেয়ালখুশিমতো নয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর অন্যথা হত প্রায়শই। কেননা, সরকারি আমলা আর পুলিশ কার্যক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ভোগ করত। আইনের চোখে সমানাধিকার (Equality before Law) ছিল এমনই একটি ধারণা। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযুক্ত হবে— এইটিই ছিল এই ধারণার মূলকথা, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ইওরোপীয় বিচারকের কাছে ইওরোপীয় অপরাধী লঘু দণ্ডাদেশ পেত; পক্ষান্তরে একই অপরাধে ভারতীয়দের শাস্তি হতো বেশি। বহু ইংরেজ কর্মচারী, সামরিক অফিসার, বাগিচা মালিক এবং ব্যবসায়ী ভারতীয়দের সঙ্গে অবর্ণনীয় দুর্ব্যবহার করত; কিন্তু নিপীড়িত ভারতীয়তার সুবিচার প্রার্থনা করলে ইওরোপীয় বিচারক দুর্বিনীত ইংরেজ অপরাধীকে প্রায়ই লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিত। উপরন্তু, সুবিচার পাওয়া এখন রীতিমতো ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠল, কেননা আদালতের ফী, উকিলের ফী কিংবা সাক্ষীর জন্য খরচ-খরচা রীতিমতো ব্যয়বহুল ছিল। আদালত গড়ে উঠেছিল গ্রাম থেকে বহু দূরে, শহরে। মামলা চলত জটিল, ব্যয়বহুল দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায়। ফলে গরিব লোকের পক্ষে সুবিচার পাওয়া দুরূহ ছিল।

২.৮ শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি

এদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে ব্রিটিশদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এ-কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সরকারই একমাত্র ভূমিকা নিয়েছিল। খ্রিস্টীয় মিশনারী এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ-দেশে প্রথম দিকে ভারতীয়দের শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ দেখায়নি, কেননা কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এদেশে লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য করা। অবশ্য দু'একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম যে ছিল না, এমন নয়। যেমন, ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলিম আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কলকাতা-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে জোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan) বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ গড়ে তুলেছিলেন প্রধানত হিন্দু আইন ও দর্শন বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য। সুতরাং এই দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয় নিয়মিত সরবরাহ করা।

মিশনারীরা খুব শীঘ্রই এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে। মানবতাবাদী জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় বিদ্বৎজনরা বিশ্বাস করতেন যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা দূর করার মুখ্য উপায় হল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিগত করা। অন্যদিকে খ্রিস্ট-মিশনারীরা এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ দেখিয়েছিল প্রধানত এই কারণে যোধুনিক শিক্ষা দেশীয় লোকেদের মনে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধা এনে দেবে এবং তারা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারে সরকারের প্রথম উৎসাহ দেখা গেল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে যেখানে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষাবিস্তারে সরকারি প্রয়াসকে নীতিগতভাবে স্বীকমৃতি দেওয়া হল। আইনে কোম্পানিক বছরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হল। তবুও ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত এই সামান্য অর্থও কোম্পানি শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে, পারেনি।

এর পিছনে অবশ্য একটি গুরুতর কারণ ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বরাদ্দ অর্থ কী জাতীয় শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়িত হবে সে বিষয়ে ঐক্যমত হচ্ছিল না। একদল মানুষ চাইছিলেন যে বরাদ্দ অর্থ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারেই খরচ করা হোক; অন্যদিকে আর একটি দল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষা প্রসারের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন। এমনকি যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হবে কী ভাষা, সে-নিয়েও তাঁরা বিতর্কে মেতেছিলেন। একদল চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার; অন্যদল ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চাইছিলেন। এছাড়া আরও নানারকমের জটিলতা ছিল। অনেকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষা এবং অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে ইংরেজীর পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তেমনি, এদেশে দেশীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং দেশীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন-অনুশীলনমূলক শিক্ষার মধ্যেও যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ছিল।

যাইহোক, প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের শিক্ষা-সংক্রান্ত এই বিরোধ ও মতদ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিষ্পত্তি হল। সরকার এইসময় স্থির করলেন যে বরাদ্দ অর্থ এরপর থেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনেই ব্যয়িত হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজী। গভর্ণর-জেনারেল বেন্টিঙ্ককে কাউন্সিলের আইন-সদস্য লর্ড মেকলে (Lord Macualy) যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়, কেননা কোন ভারতীয় ভাষাই আধুনিক পাশ্চাত্যে শিক্ষা পরিবেশনের উপযোগী উন্নত হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু প্রাচ্য শিক্ষা ইওরোপীয় শিক্ষার চেয়ে নিকৃষ্টতর, একথা সত্যি যে মেকলের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাচ্ছিল; কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে এই সময় ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষত ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যথেষ্ট উন্নত ছিল।

এই কারণেই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের প্রতি তীব্র আকুলতা ছিল। রামমোহন রায়ের মনে হয়েছিল আধুনিক পশ্চিমী বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে অধঃপতিত ভারতের উন্নয়নের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। সাবেকী শিক্ষা ভারতবাসীর মনে এনেছে বহু কুসংস্কার ও কর্মবিমুখতা। স্বভাবতই রামমোহন প্রমুখ অনেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাই এদেশের স্কুল-কলেজে ইংরেজীকেই শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করলেন। প্রচুর প্রাথমিক স্কুল খোলার চেয়ে বেশ কয়েকটি ইংরেজী মাধ্যম স্কুল-কলেজ খোলার জন্যই সরকার উৎসাহ দেখালেন। সরকারের এই নীতি পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছিল। আসলে নীতিগতভাবে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এর ফলে গণশিক্ষা অবহেলিত হয়েছিল। সরকার ইংরেজী মাধ্যম স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান যেত। কিন্তু সরকার তা করতে চায়নি মূলত অর্থনৈতিক কারণে। গণমুখী শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল ব্যয়কুণ্ঠ ঔপনিবেশিক সরকার তা সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল না। পরিবর্তে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে 'downward filtration theory' বলা হয়। বলা হল, পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে পৌঁছালে তা ধীরে ধীরে পরিশ্রুত হতে হতে সমাজের নিচের তলার মানুষদের কাছে পৌঁছাবে। এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য সরকার উচ্চশ্রেণীর মানুষদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য স্কুল-কলেজ গড়ে তুললেন।

সরকারের এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা গণমধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। তবে পশ্চিমী শিক্ষা গ্রামে-গঞ্জে না পৌঁছালেও, পশ্চিমী ভাব-আদর্শ সুদূর প্রসারিত হয়েছিল। স্কুল-কলেজের মাধ্যমে না হলেও, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, ইস্তেহার, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতীয়রা গ্রামে ও শহরে গণতান্ত্রিক আদর্শ, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদি ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিল, যা ব্রিটিশের ঘোষিত শিক্ষানীতির অভিপ্রেত ছিল না।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড (Charles Wood) এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনামা পাঠান। এই নির্দেশনামায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনার সুপারিশ ছিল। এই সুপারিশক্রমে শিক্ষা সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে পরিগণিত হল। 'Downward Filtration theory' কাগজ-কলমে পরিত্যক্ত হল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু'জন গ্রাজুয়েটের একজন।

প্রকৃতপক্ষে, এদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার থেকে এমন সদিচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল স্বল্পব্যয়ে প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কেরানী সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। শিক্ষাবিস্তারের আর একটি উদ্দেশ্য হল এদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার বিস্তৃত করা। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশরা আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারত-বিজেতা ব্রিটিশদের অবিমিশ্র প্রশংসা ছিল। ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত করে তুলতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল গণমুখী শিক্ষাবিস্তারের প্রতি সচেতন অবহেলা। এর ফল হয়েছিল এই যে এদেশে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষর লোকের সংখ্যা যা ছিল তা একশ বছর পর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেও বিশেষ একটা হেরফের হয়নি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ৯৪ শতাংশ ভারতীয় নিরক্ষর ছিল; আর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৯২ শতাংশ। দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার ফলে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়নি। উপরন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে একটি বড় রকমের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান রচিত হয়েছিল। তাছাড়া স্কুল-কলেজে শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বেতন দিতে হত বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য ছিল। ফলত পাশ্চাত্য শিক্ষা ধনী শহরবাসীদেরই একচেটিয়া হয়ে যায়। যে সনাতন শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্রিটিশ সরকার ধ্বংস করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল, শতাধিককাল ধরেও সে বিনষ্ট কাঠামোর উপযুক্ত পরিবর্ত সরকার এদেশ তৈরি করতে পারেনি। আরও একটি বড় রকমের সাফল্য ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় রয়ে যায়। নারীশিক্ষা প্রথম দিকে পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছিল। এজন্য কোন সরকারি অর্থবরাদ্দও ছিল না। রক্ষণশীল ভারতীয়দের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে—এমনতর আশংকা নারীশিক্ষায় সরকারি অনীহার কারণ হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ল কারণ হল নারীশিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকারের কোন আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা শিক্ষিত নারীদের সেযুগে সরকারি কেরানী হিসেবে নিয়োগে সাংস্কৃতিক অসুবিধা ছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেও মাত্র ২ শতাংশ ভারতীয় নারী লিখতে পড়তে পারত। কোম্পানির প্রশাসন এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকেও অবহেলা করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সারা দেশে মাত্র তিনটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে। আর একটিই মাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বুরকিতে। আর এই সবকিছুর মূলে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ। শিক্ষাখাতে ব্রিটিশ সরকার অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার এদেশের রাজস্ব আদায় করেছিল ৪৭ কোটি টাকা, আর তা থেকে শিক্ষাখাতে খরচ করেছিল মাত্র এক কোটি।

২.৯ সারাংশ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ করে। কোম্পানির হাত থেকে পার্লামেন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে লক্ষ্য করা যায় এখানেই তার সূচনা হয়েছিল। রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৭৮৪ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী পিট একটি বিল পার্লামেন্টে নিয়ে এলেন এবং সেটি 'পিটের ভারত আইন' নামে পাশ হল। এই আইন সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী হয়েছিল। এটি একটি সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করেছিল

যা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভারতস্থিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন থেকে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে তখনই ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। কোম্পানি শাসিত ভারতবর্ষে দ্বৈত-শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল যার কুফল বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতাতে মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পরাশির যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার, অর্থলোলুপতা এবং কোম্পানির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ত্রুটি ব্রিটিশ পার্লামেনন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে সে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারটি ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ উপলব্ধি করেন। ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত এবং ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাই ভারতস্থিত কোম্পানির শাসকবর্গ এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও লন্ডনস্থিত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতস্থিত কোম্পানির সরকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক সংস্কারগুলি একের পর এক গৃহীত হতে দেখা যায়। ভারতের তৎকালীন বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপের প্রথম ফলশ্রুতি ছিল ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট যা ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম লিখিত সংবিধান। এরপর ১৭৯৩ সালে পর্যন্ত প্রতি দশ বছর অন্তর এবং ১৭৯৩ সালের পর থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি কুড়ি বছর অন্তর কোম্পানির সনদ মঞ্জুর করার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রতিবারই কোম্পানির গঠন ও ভারতে কোম্পানির শাসন ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার নিয়ন্ত্রণ তথা ব্রিটিশ সরকারের প্রাধান্য বৃদ্ধি করে। এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন বিষয়ে আইন রচনা করে ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসন ও দায়িত্বভার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তথা ইংল্যান্ডের রানীর হস্তান্তরিত কারর একটি ধারাবাহিক প্রয়াস ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পরিচালিত করেছিল।

২.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন:

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলো কেন? বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব কীরকম হয়েছিল?

৩। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।

৪। ব্রিটিশদের ভূমি-রাজস্ব নীতি কিভাবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভূমি সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল?

৫। ভারতে নতুন শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তার বিশদ বিবরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্টের মূল ধারণাগুলি কী ছিল? এর কী কী ত্রুটি ছিল?

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন।

৩। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা কেন প্রবর্তিত হল? এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪। রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করুন।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. Percival Spear : *The Oxford History of Modern India,* Delhi, 1965.

২. A. C. Banerjee : *Constitutional History of India,* Calcutta, 1963.

৩. N. K. Sinha (Ed.) : *The History of Bengal (1757-1905),* Calcutta, 1967.

পর্যায় ২

রাজনৈতিক বিকাশ : উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায়

একক ৩ ❒ জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদীর উদ্ভব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ভূমিকা

৩.২ জাতীয়তাবাদ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

৩.৩ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব : বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা স্কুলের ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে ইতিহাস রচনা— তর্ক-বিতর্ক

৩.৩.১ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী/স্কুল

৩.৩.২ মার্কসবাদী গোষ্ঠী/স্কুল

৩.৩.৩ কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী/স্কুল (এ্যাংলো-আমেরিকান) নব্য ঐতিহ্যবাদী একাডেমিয়া, অথবা কেম্ব্রিজ ক্যানবেরা ঐতিহাসিক গোষ্ঠী

৩.৩.৪ সবঅল্টার্ন গোষ্ঠী/স্কুল

৩.৪ ১৮৫৭–পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি

৩.৫ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান; কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি শহরে রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা : তাদের রাজনৈতিক কার্যাবলী

৩.৬ সমাজ সংস্কার আন্দোলন; জাতীয় চেতনার উন্মেষ

৩.৭ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, কিংবদন্তী, মিথ ও বাস্তব সত্য

৩.৮ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমালোচনা ও জাতীয় চেতনার উদ্ভব

৩.৯ হিন্দু পুনরুত্থান এবং জাতীয় চেতনার বিবর্তন

৩.১০ স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব ও প্রসার

৩.১১ সাংবিধানিক রাজনীতির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

৩.১২ উপসংহার

৩.১৩ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.১৪ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এই এককটির উদ্দেশ্যসমূহ হল ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নানান দিক থেকে বোঝার প্রচেষ্টা :

- বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ নানা তত্ত্ব বিশেষ করে জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতিগঠন ইত্যাদি ধারণার উদ্ভবও বিকাশে সম্বন্ধে তাদের মতামত পাই।
- যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই জাতি ও জাতীয়তাবাদ ধারণাগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ।
- যেসব বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মানুষরা উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ধারণা প্রচার করেছিলেন তাদের সম্পর্কে জানা।
- কী ধরনের বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশল এই সব শ্রেণি বা সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রকল্পে ব্যবহার করেছিল তার বিবরণ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।
- এই এককে এছাড়াও অবশ্য পাঠ্য জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিবর্তন সম্পর্কিত ইতিহাসের উপর রচিত সাহিত্য, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়ে যেসব বিতর্ক।

৩.১ ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলা বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রাজনৈতিক অঙ্কে পরিবর্তন ঘটার ফলে, বলা যায়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছিল। এই পরিবর্তন ঘটার কারণগুলো হল প্রধানতঃ ভারতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও ভারতীয়দের কিছুটা রাজনৈতিক ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ নীতিতে খানিকটা বদল আনা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল কিছু সংখ্যক ভারতীয়দের, অবশ্যই অধস্তন পদে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করবার। এর ফলে শাসন ব্যবস্থার ভারতীয়দের যোগদানের সুযোগ ঘটে যা কালক্রমে জাতীয়তাবাদের উত্থান প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। যদিও এই জাতীয়তাবাদের গোড়ার দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্সী গুলোতে অবস্থিত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনেগুলি সাংবিধানিক বা নরম অথবা মধ্যপন্থী রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই সীমিত ছিল। পরে, বিংশ শতকে যখন জাতীয়তাবাদ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বৃহত্তর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গান্ধীর নেতৃত্বে তখন গণরাজনৈতিক আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর সদস্যদের এই একটা বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়ে স্থাপন করেছিল স্বাধীন জাতীয় ভারতীয় রাষ্ট্র। তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠী ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দেখেছে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে সব দিকগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতবিরোধ আছে এবং যে সব দিকগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকরা প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলো হল :

(ক) উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় উপমহাদেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কী প্রধান পরিবর্তন ঘটেছিল?

(খ) পরিবর্তনের ক্ষেত্র হিসাবে কোন অঞ্চলগুলোতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল—উপমহাদেশে, রাজ্যে, অথবা স্থানীয় এলাকায় বা অঞ্চলে?

(গ) কোনও গোষ্ঠী বা দল এই রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বা বলা যেতে পারে কারা এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন?

৩.২ জাতীয়তাবাদ—ব্যাখ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ ভাগ থেকেই দেখা যায় বহু ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন জাতীয়তাবাদকে একটি আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শ বলে চিহ্নিত করে তার ব্যুৎপত্তি বিবর্তন এবং বিকাশের বিশ্লেষণে। এই প্রসঙ্গে তারা বুঝতে চেয়েছেন রাজনৈতিক মনোভাব, ধনতন্ত্র, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ভৌগোলিক ও ভাষার বৈচিত্র্যের মত নানা বিষয়গুলোকেও এর ফলে আধুনিক বিদ্যা বা জ্ঞান চর্চার জগতে উঠে এসেছে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বহুবিধ নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য। এ বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম :

Ernest Renan, *What is a Nation* (1882)

Rabindranath Tagore, *Nationalism* (1917)

Elie Kedourie, *Nationalism* (1960)

Bendict Anderson. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983).

Ernest Gellrer. Nations and Nationalism (1983)

Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780 : Programme, Myth, Reality (1991)

৩.৩ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব : বিভিন্ন গোষ্ঠীর/স্কুলের ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে ইতিহাস রচনা—তর্ক-বিতর্ক

৩.৩.১ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী/স্কুল

বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকের আগে তেমনভাবে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনা শুরু হয়নি। যদিও ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী কয়েকজন নেতা যেমন দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্তরা উপনিবেশিক শাসকের অর্থনৈতিক শোষণের কঠোর সমালোচনাও তারা তাদের লেখায় ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময় থেকেই বলা যেতে পারে যখন থেকে সংবিধান অনুমোদিত

রাজনৈতিক কার্যকলাপে আস্থাভাজন এই সব জাতীয়তাবাদী নেতারা কড়া স্পষ্ট ভাষায় নির্ভিক ভঙ্গিতে উপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিলেন তখন থেকেই জাতীয়তাদী ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ সে সময় লেখা দুটি বই এর নাম দেওয়া হল :

1. Dadabhai Naoroji, *Poverty and Un-British Rule in India* (1901)
2. R. C. Dutt, *Economic History of India. Vols I and II*. (1901-1904)

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতারা তাদের লেখাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন।

তাঁরা ভারতীয় অর্থনীতির উপর উপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন এবং কীভাবে তা সংগঠিত হয়েছিল। সেই বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের প্রধান অন্তরায় হল ব্রিটিশ উপনিবেশিকতাবাদ।

কী উপায়ে ব্রিটিশ উপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছিল সে সম্বন্ধে সবিস্তারে জানবার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতারা উপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে যথা বাণিজ্য, শিল্প, অর্থসংক্রান্ত বিভক্ত করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন এই তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

উপনিবেশিক শাসনকালে বহুকাল ধরে চলে আসা ভারতীয় হস্তশিল্পের ধারাবাহিক অবনতির কথাও জাতীয়তাবাদী নেতারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পের তুলনা টেনেছিলেন যেখানে ভারতীয় হস্তশিল্পের অবনতি ঘটছে সেখানে সেমসময় ব্রিটিশ উৎপাদকদের নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা হচ্ছে, পুঁজি বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী লেখকদের সমালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল নিষ্কাশন তত্ত্ব। বিপুল পরিমাণে ভারতীয় সম্পদ এবং পুঁজি উপনিবেশিক শাসকরা ভারত থেকে নিষ্কাশিত করে নিয়ে চালান দিচ্ছেলেন নিজেদের দেশ ব্রিটেনে। কোম্পানির সামরিক, অসামরিক কর্মচারীদের বেতন, পেনশন, হিসাবে, সরকারের কাছে করা কর্জের সুদ হিসাবে। মুনাফা হিসাবে, হোম চার্জ ব্রিটেনে ভারত সরকারের জন্য খরচা বাবদ চার্জ হিসাবে ভারতের অর্থ এবং সম্পদ ভারত থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল সুদূর ব্রিটেনে।

উপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় শুল্ক নীতি এবং পুঁজি বিনিয়োগ নীতি অবশ্যই ইংরেজদের সুবিধার্থে প্রণয়ন করা হয়েছিল তাই এই দুই নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন জাতীয়তাবাদী লেখকরা। তাঁরা ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য দাবি রেখেছিলেন যে সত্যিকারের অর্থনৈতিক উন্নতি তখনই সম্ভব যখন ভারতীয় শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগ হবে।

উপনিবেশিক অর্থনীতির কঠোর সমালোচনা করা ছাড়াও এই সময়কার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে কল্পনায় ভারতীয় জাতির এক চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য এ চিত্র-কল্পনায় চিত্রিত ভারতীয় জাতি শাসকশ্রেণীর চিত্রিত ভারতীয় জাতির চিত্র থেকে একেবারে আলাদা। যদিও তখনও পাশ্চাত্য ধারণা বা তত্ত্ব অনুযায়ী

ভারতীয় জাতি গঠন সম্পূর্ণ হয়নি তবুও জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্যোগে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর লেখা "*A Nation in the Making : Being the Reminiscence of Fifty Years of Public Life* (1925)" এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে সুরেন্দ্রনাথের এই বিবরণ গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি অসামান্য ধ্রুপদী বিবরণ বটে।

১৯৪০ এবং ১৯৫০ এক দশকের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক/লেখকরা কেবল উপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক শোষণকারী চরিত্রকার সমালোচনা করেই থেমে থাকেননি; তাঁরা চুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠার কারণ ছিল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং স্বাধীনতা শব্দটি অর্থ সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয় জাতি গঠন এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন—এই দুই বিষয়ের উপর তাঁদের লেখায় সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে জাতীয় আন্দোলন সাধারণ ভারতবাসীর গণআন্দোলন।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে জাতীয় চেতনার কথা যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পরবর্তীতে যা রূপ নিয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। আর এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেও অভিহিত করা যায় তা ভারতবাসীকে অবশেষে এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা। উনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত সীমিত ছিল শহুরে বুদ্ধিজীবীদের তত্ত্বকথা ও তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনার মধ্যে কিন্তু পরবর্তী শতকে জাতীয়তাবাদের ধারণা বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং সেসব মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে যোগ দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী বা স্বাধীনতা সংগ্রামে।

এ বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ :

1. Pattavi Sitaramayya, *History of the Indian National Congress. 2 vols.* (1946-47)
2. Tarachand, *History of the Freedom Movement of India, 4 vols.* (1961-72)
3. R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement, 3 vols.* (1962-63).

৩.৩.২ মার্কসিস্ট গোষ্ঠী/স্কুল

মানবেন্দ্রনাথ রায় তার গ্রন্থ "*India in Transition*" (1992)-এ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে মানবজাতির ইতিহাসের সামগ্রিক একটি কাঠামোয় ফেলে মার্কটিস্ট পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লেনিনের ভারতবর্ষে সম্পর্কে মতামত—সামন্ত্রতান্ত্রিক ভারতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটবে, মানতে অস্বীকার করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করতেন যে বর্তমানে ভারতের অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কায়েম করবার উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া যথেষ্ট উৎসাহিত ফলে কখনোই এই শ্রেণি বর্তমান অবস্থার

পরিবর্তন চাইবে না। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি তার শিল্পের স্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশে উৎসাহী। ফলে কোনও অবস্থাতেই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সদস্যরা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে নিজেদের পতন নিজেরাই ডেকে আনবে না। তারা কখনোই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উৎখাত করতে চাইবে না। রায়ের ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সৃষ্টি হওয়া শ্রমিক শ্রেণিই অতঃপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তার অন্তিম পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ধ্রুপদী মার্কসবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা যে সব বইতে পাওয়া যায় নিচে সেগুলোর একটা তালিকা দেওয়া হল :

R. P. Dutt– *India Today* (140)

A. R. Desai– *Social Background of Indian Nationalism* (1946)

I. M. Reisner and N. M. Goldberg (eds.) : Tilak and the Struggle for Indian Freedom (1966).

অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের তত্ত্ব অনুসারে মার্কসিস্ট গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা যুক্তিনির্ভর যে সব বক্তব্য রেখেছেন সেগুলো হল :

(ক) ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সুসংবদ্ধ হওয়ার পর অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। তার ফলে উদ্ভব হয় নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। পরিবর্তিত সম্পর্কগুলো তৈরি হয়েছিল পারিবারিক/সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে নয়—বরঞ্চ বলা যেতে পারে এই নতুন সম্পর্কগুলো ছিল চুক্তিভিত্তিক। এই সময়ের এই পরিবর্তনশীলতার ফলে ভারতীয় সমাজে দেখা দেয় ব্যাপক গতিশীলতা যা আগে কখনো ঘটতে দেখা যায়নি।

(খ) ব্রিটিশ বাণিজ্য ও ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থা ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে আরও একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ভূমি, যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে ছিল মাতৃসমা সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল। ভূমি হয়ে উঠেছিল ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য। এর ফলে ভারতে বাজার অর্থনীতির উত্থান হয়ে উঠল অবশ্যম্ভাবী। কয়েকটি নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটল ভারতীয় সমাজে যেমন ব্যবসায়ী, বণিক, মহাজন, কোম্পানির অধীনস্থ দালাল বা এজেন্ট ইত্যাদি।

(গ) বাজার অর্থনীতি আর চুক্তিভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের উত্থানের ফলে পুরাতন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটল ভারতবর্ষে।

(ঘ) ঊনবিংশ শতকে অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে যে সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং যার ফলে উদ্ভব হয়েছিল নতুন কিছু সম্প্রদায়। সেইসব সম্প্রদায়ের মানুষ সামাজিক পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মার্কসিস্ট গোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করেন লড়াই শুরু এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কারণে।

(ঙ) মার্কসবাদী মতবাদে বিশ্বাসী এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করেন যে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের

নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেবল বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের শ্রেণি স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয়। উল্টে, সাধারণ মানুষরা বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন।

(চ) সোভিয়েত ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগে গড়ে ওঠা শিল্পের উত্থানের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংযোগ। তাঁদের মতে কংগ্রেসের মধ্যে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মতবিরোধের কারণও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। মধ্যপন্থীরা ছিলেন এমন সব দেশীয় পুঁজিপতিদের পক্ষে যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে। অপরদিকে চরমপন্থী সদস্যরা ছিলেন পাতিবুর্জোয়াদের প্রতিনিধি।

(ছ) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে রজনিপাম দত্ত এবং আরও অন্যান্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা বুর্জোয়াশ্রেণিভুক্ত করেছেন। তাঁদের মতে ভারতীয় বুর্জোয়ারা একটি মাত্র গোষ্ঠী; বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে কোনও বিভাজন বা বৈষম্য নেই। কিন্তু সোভিয়েত ঐতিহাসিকরা এবং এ. আর দেশাই এর মত সমাজবিজ্ঞানীরা আবার ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিকে বিভক্ত করেছেন পাতি বুর্জোয়া, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি ভাগে ও তাদের নিজ নিজ আলাদা ভূমিকার উপর তারা আলোকপাত করেছেন। দেশাই এর মতে নতুন নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে নতুন সামাজিক শ্রেণিরও উদ্ভব হয়েছে যেমন আধুনিক বুর্জোয়াও শিল্পপতি ও পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণি এবং অবশ্যই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এছাড়াও এইসব শ্রেণির আবির্ভাবের আগেই সমাজে উদ্ভব হয়েছিল পেশাদারি সম্প্রদায়ের। এই বুর্জোয়া, শিল্পপতি, পুঁজিপতি, বুদ্ধিজীবী এবং পেশাদারি গোষ্ঠীর মানুষরাই ছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ের নেতৃত্বে।

সম্প্রতিকালের ধ্রুপদী মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় পরিবর্তন ঘটেছে, সংশোধিত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি। বিপানচন্দ্র তার গ্রন্থে *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India, 1880-1905* (1966) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে শ্রেণি দ্বন্দ্বের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং তত্ত্ব। বিপানচন্দ্র মনে করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর ধারণা সৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবদান অপরিসীম। কারণ বুদ্ধিজীবীরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঠিক চরিত্র বুঝতে পেরেছিলেন এবং কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত ভারতবাসীরাই স্বার্থের পরিপন্থী সে সম্বন্ধেও তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতাদর্শ তাই তৈরি হয়েছিল সমস্ত ভারতবাসীর স্বার্থ বিবেচনা করে। তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছিল সমগ্র ভারতবাসীর স্বার্থ। বিপানচন্দ্রের মতে বুদ্ধিজীবীরা কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন গোটা জাতির প্রতিভূ। যদিও তাঁরা অবাধ-বিদেশী পুঁজির লগ্নিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ তারা ভাবতেন এই অর্থনৈতিক উন্নতির পথই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ, তবুও একথাও সত্যি যে বুদ্ধিজীবীরা শুধু ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি ছিলেন না। বরঞ্চ দেখা যায় যে শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ভারতীয়দের সমর্থন বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন পাননি অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তো নয়ই।

প্রায় এই একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় বিপানচন্দ্রের আরও একটি গ্রন্থে *India's Struggle for Independence* (1989) এই লেখায় বিপানচন্দ্রের বক্তব্য যে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে কেবলমাত্র বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীনেই সংগঠিত হয়েছে তা নয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আসলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সম্মিলিত এক গণআন্দোলন।

বিপানচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা যে বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন সেগুলো এভাবে বলা যায়—

উপনিবেশিক ভারতবর্ষে দুই ধরনের দ্বন্দ্ব প্রত্যাশা করা যায়। দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব। মুখ্য দ্বন্দ্ব ছিল সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির স্বার্থের দ্বন্দ্ব। আর একটি ছিল ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত কিছু বিষয়ে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। যেমন শ্রেণি দ্বন্দ্ব। জাতপাত নিয়ে দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব।

উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে ভারতবাসীরা তাদের নিজেদের মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল সেগুলোকে গৌণ বলে মেনে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে মুখ্য মনে করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হন। আর এরই মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদের ধারণাটি ভারতীয়দের মনে আরও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোনও একটি বিশেষ শ্রেণি বা জাতের বা দলের আন্দোলন ছিল না। গান্ধী এবং নেহরু দু'জনেই ভালো করে জানতেন ভারতীয়রা তখনও জাতি হিসাবে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। জাতি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের কাছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল তা হল বিভিন্ন শ্রেণি, সম্প্রদায়, পরস্পরবিরোধীস্বার্থ জগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ মিটিয়ে সকলকে এক ছাতার তলায় সম্মিলিত করা।

যদিও ভারতবাসীদের মধ্যেকার সব দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয়নি তবুও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নানা বৈপরীত্য ও বিবিধতা নিয়েও প্রকৃতপক্ষে একটি গণআন্দোলন হয়ে উঠেছিল।

রজনিপাম দত্তের মত মার্কসবাদীদের বা সোভিয়েত ঐতিহাসিদের সরল সহজ শ্রেণিদ্বন্দ্বের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণকে সুমিত সরকার মানতে অস্বীকার করেছেন। তার বইতে *Swadeshi Movement in India, 1903-1908* (1973) তিনি প্রশ্ন তুলেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর। তাঁর মতে ভারতের সব শিক্ষিত মানুষ বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না। বুর্জোয়া নয় এমন শ্রেণির মানুষও শিক্ষিত সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ফলে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণি মানুষরা সর্বক্ষেত্রে যে প্রগতিশীল ছিলেন তা নয় বরঞ্চ তার উল্টোটাই ঘটেছিল ভারতে শিক্ষিত শ্রেণি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন যোগ ছিল না। সমসাময়িক বিশ্বে যে সব প্রচলিত মতবাদ জনপ্রিয় ছিল যেমন জাতীয়তাবাদ বা উদারতাবাদ সে সবের সঙ্গেও তাদের তেমন একটা পরিচয় ছিল না।

সুমিত সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন স্বদেশি আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর; তার মতে যা

বহুলাংশেই গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সময়কার অন্যান্য কয়েকজন বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রেরণায় এবং যা এই আন্দোলনকে করে তুলেছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

Modern India (1983) গ্রন্থে সরকার সাধারণ পাঠককের উদ্দেশ্য যে সতর্কবার্তা দিয়েছেন তা হল "শ্রেণি এবং শ্রেণি সচেতনতা" বিশ্লেষণের হাতিয়ার মাত্র তাই সেগুলো অত্যন্ত দক্ষতা এবং কিছুটা নমনীয়তার সাথে ব্যবহার করা উচিত। সরকার সাময়িকভাবে জাতীয়তাবাদ ও তার বৈধতা স্বীকার করলেও জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সেই সংক্রান্ত উত্তেজনা বা উদ্বেগকে অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে ভারতে দু'টি স্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল। একটি অভিজাত মানুষদের স্তরে, অন্যটি সাধারণ মানুষের স্তরে। দু'টির মধ্যে কোনটিকেই অগ্রাহ্য করা অনুচিত। এই দুই স্তরে সংগঠিত সংগ্রামের মধ্যে একটা জটিল সম্পর্ক ছিল যার ফলে পরিবর্তনের এবং বিবিধতার মধ্যে দিয়েও তৈরি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটা ধারবাহিকতা।

৩.৩.৩ কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী (এ্যাংলো-আমেরিকান এক্যাডেমিয়া বা কেম্ব্রিজ—ক্যানবেরা দলের নব্য ঐতিহ্যবাদীরা)

এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণে দুটি প্রধান বিষয়ে উঠে আসে। তাঁরা জোর দিয়েছেন মূলত যে দু'টি বিষযের সেগুলো হল :

(ক) জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বার্থ।

(খ) বিভিন্ন আঞ্চলিক-প্রাদেশিক এবং জাতীয় স্তরে অবস্থিত বস্তুবাদী আন্তঃসংযোগ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ চর্চায় কেম্ব্রিজ—ক্যানবেরা দলের ঐতিহাসিকরা আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন ১৯৬০-এর শেষ দশক থেকে। ১৯৬৮ সালে এই গোষ্ঠীর তিন ঐতিহাসিক তিনটি বই প্রকাশিত হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর :

David Anthoay Low, *Soundings in Modern South Asian History*.
Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*
John H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society. Twentieth Century Bengal*.

এই সব ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন ইম্পিরিয়াল বা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নব্য ঐতিহ্যবাদের দ্বারা। পরবর্তী সময়ে এরা নব-ঐতিহ্যবাদী পূর্বসূরিদের কাজের উপর ভিত্তি করে কিংবা নতুন কিছু সংযোজন করে নিজেদের মতো, পরিমার্জনা করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ হন। এই ঐতিহাসিকরা ক্ষমতা ও স্বার্থের তত্ত্বের মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের লেখা বেশ কিছু বই-এর নাম :

(ক) John Strachy, *India* (1888)

(খ) Valentine Chirol, *Indian Unrest* (1910)

(গ) Verney Lovell, *A History of the Indian National Movement* (1920)

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস রচনায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

রুডিয়ার্ড কিপলিং এর বিখ্যাত পংক্তির "প্রাচ্য প্রাচ্যই আর পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্ত্যই" উপর ভিত্তি করে তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেছেন।

তাদের কল্পনায় ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক অস্তিত্ত্ব মাত্র।

তাদের ধারণায় ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ভব ও বিকাশ এবং ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির পাশ্চাত্যকরণ সত্ত্বেও, পশ্চিমি অর্থে ভারতবর্ষে জাতিগঠন অসম্ভব।

বিবিধতা নিয়ে গঠিত ভারতবর্ষ—সেখানে আছে ধর্মে ধর্মে বিভেদ, জাতিতে জাতিতে বিভেদ, এবং সর্বোপরি সেখানে আছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় আছে বহু স্বার্থান্বেষী দল।

এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে মেকি জাতীয়তাবাদী বোধের উপর ভিত্তি করে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা বেশির ভাগই পুরানো/সাবেকি সমাজের অভিজাত গোষ্ঠীর মানুষ। এরা কেবল স্ব স্ব গোষ্ঠীর স্বার্থপূরণে আগ্রহী ছিলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থপূরণে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের উৎস ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস বিশেষ করে হিন্দুধর্মে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অনীহা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু, সমাজের মর্যাদাশালী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। বিশেষ করে চিরোল মনে করতেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত যে একটি ছোট গোষ্ঠী ছিল সে গোষ্ঠীর সদস্যরা নিশ্চিত ছিলেন যে জাতের আধিপত্য বজায় রেখে যদি তারা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে পারেন তাহলেই তাদের স্বার্থোন্বেষণ সফল হবে। এ প্রসঙ্গে চিরোল দেখিয়েছেন ১৮১৮-র পরবর্তী সময়ে চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরা কীভাবে নতুন প্রেক্ষিতে কাঠামোগত কিছু সমন্বয় সাধন করে উনিশ শতকের শেষভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইন বিভাগে বিপুল প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন।

১৯৪৭ সালের আগে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন ব্রুস. টি. ম্যাকলি (Bruce. T. McCully) নামে এক মার্কিন ঐতিহাসিক। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তার বই '*English Education and the Origin of Indian Nationalism*' এ তিনি ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইংরাজী শিক্ষিত অভিজাত নেতৃত্বের মূল্যায়ন করেছিলেন। তাঁর লেখা পরবর্তী সময়ে এ্যাংলো আমেরিকান পণ্ডিত সমাজের উপর যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলেছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিংশ শতকের ষাটের দশকে প্রকাশিত কয়েকটি অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থ।

এছাড়াও কেম্ব্রিজ দলের ইতিহাস রচনা আর অন্য যে সব লেখক ও তাদের গ্রন্থের প্রভাব আছে

সেগুলো হল :

Lewis Bernstein Namier, *The Structure of Politics at the Accession of George III* (1929)

John Gallagher and Ronald Robison, *The Imperialism of Free Tade* (Economic History Review 1953)

Ronald Robison and John Gallagher, *Afirca and the Victorians : The Official Mind of Imperialism* (1961)

নেমিয়ার তার গবেষণায় ইংল্যাণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের সিংহাসন আরোহণ কালে ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করেছিলেন তিনি বিশেষ করে আলোকপাত করেছেন সমসাময়িক নেতৃত্বস্থানীয় রাজনীতিবিদ্‌দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কী আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের? রাজনৈতিক নেতাদের কায়েমী স্বার্থের টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে নেমিয়ার সেই সমকার রাজনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করেছেন।

গ্যালাহার এবং রবিনসন যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে আফ্রিকার অভিজাতরা সেই মহাদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশকতাবাদের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে সহায়ক হয়েছিলেন। এই দুই লেখকের মতে আফ্রিকার অভিজাতরা এ ব্যাপারে মধ্যস্থকারীদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেও যখন তারা দেখেন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত অংশের মুনাফা লাভ করতে পারছেন না তখনই তাদের স্বার্থে ঘা লাগে ও তারা উপনিবেশিক শাসকবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন। আফ্রিকার অভিজাতদের সহযোগী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হওয়ার ব্যাখ্যা করতে নিয়ে গ্যালাহার এবং রবিনসন দু'জনেই ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছাকেই দেখিয়েছেন। স্বার্থসিদ্ধি এবং ইচ্ছাপূরণ না হওয়াতেই আফ্রিকার অভিজাতরা জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব তুলে ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের উত্থান ও বিকাশের মধ্যে তাঁরা কোনও আদর্শগত অনুপ্রেরণা খুঁজে পাননি।

অনিল শীলের ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ *The Emergence of Indian Nationalism : Competition and Collaboration in Later Nineteenth Century*. তে দেখা যায় যে লেখক নেমিয়ারের মডেল "প্রতিদ্বন্দ্বিতা বনাম সহযোগিতা" এই পরস্পর বিরোধী দুই দৃষ্টিকোণ (বাইনারি) থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। শীলের মতে ভারতীয় অভিজাতদের অংশবিশেষের সহযোগিতা না পেলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা হওয়া মুশকিল হত। বাঙালি ভদ্রলোক, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং আয়ার ও আয়েঙ্গার সম্প্রদায়ের তামিল ব্রাহ্মণরা ছিলেন সেই সব অভিজাতদের সহযোগিতায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হতে পেরেছিল। এদের সাহায্যে বিদেশি শক্তি শাসক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোরও অধীনে আসতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু একটা সময়ের পর যখন ভারতীয় অভিজাত সহযোগীর দল বুঝতে পারলেন যে উপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের ব্যবহার করেছে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাদের সহযোগিতার যথাযোগ্য মূল্য দিতে অপরাগ এবং তাদের আর

আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের আশা নেই তখনই তারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী হয়ে উঠতে শুরু করলেন। সহযোগী থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন প্রতিদ্বন্দ্বীতে। এ প্রসঙ্গে শীল আই.সি.এস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত পরিসরে যে সময় থেকে তিনি ব্রিটিশ শাসনের অসারতা (বৈষম্য) উপলব্ধি করেছিলেন সে সময় থেকেই তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেলেন জাতীয়তাবাদীতে। প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্রিটিশদের বৈষম্য নীতি নিয়ে যে নীতিতে ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে ভেদাভেদ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যাপার। তাঁকে যখন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পদোন্নতি থেকে অন্যায্যভাবে বঞ্চিত করা হয় তখন তিনি শাসকের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হন।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই ব্যাখ্যা অনুসারে ঊনবিংশ শতক থেকেই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সহযোগী থেকে জাতীয়তাবাদী এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের সহযোগিতা করেও এখন ভারতীয় অভিজাতরা উপলব্ধি করেন যে বিদেশি শাসকদের থেকে উন্নতির বা স্বার্থসিদ্ধির খুব একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে না তখন থেকেই তারা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরোধী হয়ে উঠতে শুরু করেন। সহযোগী থেকে তারা পরিবর্তিত হন প্রতিদ্বন্দ্বীতে। আর এই অভিজাতদের পরিবর্তিত অবস্থান থেকেই জন্ম নেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।

১৯৭৩ সালে জন গ্যালাহার, গর্ডন জনসন ও অনিল শীল সম্পাদিত *Locality Province and Nation : Essays on Indian Politics, 1870-1940* বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে কেম্ব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকরা যে বিতর্কের বিষয়টি উত্থাপন করেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বলেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামোয় তিনটি স্তর আছে—(ক) জাতীয় স্তর, (খ) প্রাদেশিক স্তর ও (গ) স্থানীয় স্তর। উপনিবেশিক শাসনব্যাবস্থা এই তিনটি স্তরকে সংযুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল এবং জাতীয় স্তরের সঙ্গে প্রাদেশিক, প্রাদেশিক স্তরের সঙ্গে স্থানীয় স্তরকে সংযুক্ত করে একটা সর্বভারতীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ একই শাসনব্যবস্থা আওতায় চলে আসে। একই দেশে একটিই আইনবিধি, ও শাসন ব্যবস্থা আরোপিত করা হয়। সকল ভারতবাসী একই রকমের সুবিধাভোগী এই নীতি প্রযোজ্য করা হয়। মোগল আমলের শাসনব্যবস্থা থেকে খানিকটা সরে এসে ব্রিটিশ সরকার একটি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যবস্থায় প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে ব্রিটিশরা কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের এবং প্রদেশের সঙ্গে স্থানীয় অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। শাসকদের কাছে এই যোগাযোগ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

১৮৫৭ পরবর্তী সময় ব্রিটিশ শাসককুল উপলব্ধি করেন যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালানোর ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই ব্যয় সংকোচের জন্য সিদ্ধান্ত হয় যে শাসনব্যবস্থায় বা প্রশাসনে ব্যবস্থায় কম বেতনের পদগুলোতে ভারতীয় নিয়োগ করা হবে।

কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিদের মতে উপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থায় বা শাসন কাঠামোয় ভারতীয়দের

নিয়োগের ফলে দু'টো ব্যাপার ঘটেছিল। (ক) ভারতীয়দের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি আর (খ) জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। দলাদলি, প্রথমদিকে শুরু হয়েছিল স্থানীয় অঞ্চলগুলোতে তবে ক্রমে সেখান থেকে তা প্রাদেশিক স্তরে এবং সর্বশেষ জাতীয় বা কেন্দ্রীয়স্তরে ঢুকে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে রাজনৈতিক সমিতি গড়ে ওঠে। রাজনৈকি চর্চার ফলে জন্ম নেয় সর্বভারতীয় ঐক্যের ধারণা যার প্রতিফলন দেখা যায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়। তবে রাজনৈতিক দলাদলির যে সূচনা আগেই ঘটেছিল সে দলাদলির রাজনীতি কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে দেখা যেতে লাগল।

অপরদিকে যে সব ভারতবাসী আঞ্চলিক/স্থানীয়, প্রাদেশিক অথবা জাতীয়—এই অন্তর্জালের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেন না তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর একটি সমান্তরাল অন্তর্জাল তৈরি করলেন। আর এই দুই অন্তর্জালের মাধ্যমে থেকেই উদ্ভব ঘটল জাতীয়তাবাদের। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করে পরবর্তীতে এ্যাংলো আমেরিকার ঐতিহাসিকরা তাদের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ :

Gordon Johnson, *Provincial Politics and Indian Nationalism : Bombay and The Indian National Congress; 1880-1975* (1973)

C. A. Bayly, *Provincial Roots of Indian Nationalism. Allahabad, 1880-1920* (1976)

C. J. Baker, *The Politics of South India, 1920-1927*.

D.A.Hashbrook, *The Emergence of Provincial Politics. The Madras Presidency, 1870-1920* (1976)

উপরোক্ত লেখকদের গবেষণায় যে বক্তব্য উঠে এসেছে সেগুলো হল :

(ক) ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির চালিকা শক্তি ছিল নেতাদের আর্থিক ও বস্তুবাদী স্বার্থ।

(খ) স্বভাব-স্বার্থপর জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরা কেবল তাদের বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর ছিলেন।

(গ) কংগ্রেসের নেতারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি মতবিরোধ জড়িয়ে পরেন।

জুডিথ ব্রাউন ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থান সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেন তাতে তিনি দু'টি প্রশ্নের উপর জোর দিয়েছিলেন। (ক) ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে কোন অংশ গান্ধীর মতাদর্শের অনুগামী হয়েছিল? (খ) কী কারণে তারা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করেছিলেন?

জুডিথ ব্রাউনের মতে ভারতীয় সমাজে প্রতিটি শ্রেণি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিবিধ কারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে সঞ্চার হয়েছিল। কোনও তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে না গিয়ে গান্ধী সাধারণ মানুষের ভিতরে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তার কারণগুলোকে স্থানীয় অঞ্চল থেকে প্রাদেশিক এবং জাতীয় স্তরে

তুলে এনে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। গাধীর এই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং কৌশল তাকে অচিরেই জনসাধারণের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

চম্পারন, খেদা ও আহমেদাবাদের একেবারেই স্থানীয় কৃষি ও শিল্প সমস্যাও গান্ধী গুরুত্বের সঙ্গে প্রাদেশিক এবং জাতীয় রাজনীতির স্তরে তুলে এনেছিলেন। এর ফলে ১৯১৯ সালের রাউলাট সত্যাগ্রহে গান্ধী একজন স্থানীয় নেতা থেকে জাতীয় নেতৃপদে উন্নীত হয়ে গেলেন। জুডিথ ব্রাউন দেখিয়েছন যে শুধু নিজেকে যে গান্ধী জাতীয় রাজনীতির স্তরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষান্ত হলেন না তা নয় বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে উৎসাহিত করেছিলেন স্থানীয় সমস্যাগুলিকে জাতীয় স্তরের রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে। গান্ধীর দ্বারা অনুপ্রাণিত এই সব রাজনীতিবিদ্‌দের জুডিথ ব্রাউন চিহ্নিত করেছেন উপ-ঠিকাদার বা Sub-contractor নামে। গান্ধী যেমন করে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে সকল স্তরের অর্থাৎ প্রাদেশিক ও স্থানীয় রাজনীতির ইস্যুগুলো জুড়তে পেরেছিলেন সফলতার সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী কোন নেতা এভাবে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারেননি।

ডি.এ. লো তার গ্রন্থে *Congress and the Raj : Facets of the Indian struggle, 1917-47* (1977) জুডিথ ব্রাউনের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েছেন। ব্রাউনের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। জুডিথের উপ-ঠিকাদার বা Sub-contractor এর তত্ত্বটিকে লো আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর লেখায়। তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের (যেমন বড় কৃষক, গ্রামের অভিজাত বা গ্রাম প্রধান) মাধ্যমে কৃষকের সঙ্গে গান্ধীর যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করেছেন।

বি. আর. টমলিনসনের গ্রন্থে *Congress and the Raj : 1929-1942 : The Penultimate Phase*, (1976) বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের অবতারণা আছে তা ১৯২৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনীতি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে তা রূপান্তরত হয় ভোটের রাজনীতিতে। কেবল এই সময়কালে ঘটা দুটি আন্দোলন এই রাজনৈতিক ধারার বাইরেছিল—১৯৩০-৩১-এর আইন-অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো বা কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন পাশ হবার পর যে আইন অনুযায়ী ভারতের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ব্রিটিশ ভারতের ১১টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনে জয় লাভ করেএবং সরকার গঠন করে। এর ফলে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল কমিটি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে ও স্থানীয় বা আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর ফল কিন্তু খুব একটা ভালো হয়নি; কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। আর কেম্ব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকদের মতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতারা যেহেতু কোনও বিশেষ আদর্শ বা মতবাদের দ্বারা চালিত ছিলেন না। তাদের চালিকা শক্তি ছিল কেবল ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থ তাই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি এসময় প্রকট হয়ে উঠেছিল বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নির্বাচন এবং মন্ত্রীত্ব লাভকে কেন্দ্র করে কলহ।

এই দ্বন্দ্বের রেশ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরও চলতে থাকে। কংগ্রেস লীগ সদস্যদের সামান্য দু'টি দফতরের দায়িত্ব দিতেও অস্বীকার করে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলাকালীন কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সংহতির অভাব—এটাই টমলিনসনের গবেষণার বিষয়।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে কোনও জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব নয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে থাকা অভিজাতরা কেবল মাত্র চালিত হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ও বস্তুগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে। তারা তাদের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সব যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছিলেন তাতে অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত ছিল ভারতীয় সমাজের মূল শ্রেণি ও জাত সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলো।

অবশ্য কেম্ব্রিজ স্কুলের “Power theory” বা “ক্ষমতার তত্ত্ব” দিয়ে ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের এমন সরল বিশ্লেষণ যে সর্বজন গ্রাহ্য তা নয়। ভারতে জাতীয়তবাদের উত্থান ও বিকাশের মতো দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের ‘ক্ষমতার তত্ত্ব’ অনেকাংশেই অসমর্থ। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চায় সবচেয়ে বড় অবদান স্থানীয়রা আঞ্চলিক রাজনীতির ইতিহাসের উপর গুরুত্ব প্রদান এবং তা সর্বভারতীয় ইতিহাস রচনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.৩.৪ সাবঅলর্টান গোষ্ঠী/স্কুল

অভিজাত বর্গের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে সাবঅলটার্ন স্টাডিস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ গুহ উদ্যোগী হন ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস নির্মাণে। এ বিষয়ে লেখা ও সম্পাদিত তার দুটি বই :

Subaltern Studies : Writings on South Asian History and Society (1982) (Edited)
Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (1983)

রণজিৎ গুহ তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে সাবঅলটার্ন স্টাডিস গ্রুপের ঐতিহাসিকরাই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে নিম্নবর্গের মানুষদের ভূমিকা তুলে ধরেন। এই গোষ্ঠীর উত্থানের আগে পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে ইতিহাস রচনা হয়েছেসে ইতিহাস সবটাই রচিত হয়েছে হয় উপনিবেশিক শাসকদের অথবা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এবং সে ইতিহাসে বলাই বাহুল্য নিম্নবর্গের মানুষরা ঠাঁই পাননি। সে ইতিহাসে তারা একেবারেই উপেক্ষিত। তাই উচ্চবর্গের মানুষদের বা অভিজতদের ইতিহাস রচনায় পাওয়া যায় সমাজের উঁচু তলার গতিশীলতার কথা। সেখানে সমাজের নিচু তলায়ও যে গতিশীলতা রয়েছে তার খবর মেলে না, অর্থাৎ অভিজাতদের ইতিহাস রচনার ধরণ বলা যেতে পারে উল্লম্ব, অনুভূমিক নয়।

সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য ছিল উল্লম্ব ইতিহাস রচনার ধারাকে বিপরীতমুখী করে অনুভূমিক ধারায় ইতিহাস রচনা করার।

সাবঅলটার্ন স্টাডিস দলের বা কালেক্টটিভের ঐতিহাসিকদের মতে উপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের

রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ছিল দু'টি।

(ক) জাতীয়তাবাদী নেতাদের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত সংগঠিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে এবং (খ) প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক আন্দোলনের বাইরের ক্ষেত্রে সেখানে সংঘটিত হয়েছিল কৃষক আন্দোলন। শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ছাত্র আন্দোলন আদিবাসী ও দলিতদের আন্দোলন।

গুহ তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের বিদ্রোহগুলির বিশ্লেষণ করলে সেগুলোর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলো হল এই যে বিদ্রোহগুলো ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথেষ্ট আক্রমণাত্মক বা জঙ্গি।

উপনিবেশিক শাসনকালে তিনি মনে করেন জাতীয়তাবাদ ছিল বহুমাত্রিক। বিভিন্ন শ্রেণির ও সম্প্রদায়ের ধারণা মতবাদ, ভার ইত্যাদি মিলিত প্রভাব ক্রমে পড়ে ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ধারায়। আর যেহেতু প্রতিটি গোষ্ঠী বা শ্রেণি আন্দোলনে যোগদান করেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিল, নিজ নিজ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেছিল তাই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সাংগঠনিক এবং অসংগঠিত দু'ই ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল একে অপরের পরিপূরক।

এই প্রসঙ্গে আবার সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটা পার্থক্য টেনেছেন। প্রথম আন্দোলনের লক্ষ্য, তাদের মতে, ভারতবর্ষ থেকে বিদেশি শাসনের অপসরণ। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তি, অনেক বেশি প্রসারিত। শুধুই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই নয় আর্থ সামাজিক পরিবর্তন আনাটাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য। দুর্ভাগ্য যে প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক ক্ষেত্রের বাইরে নিম্নবর্গের পরিপূর্ণ একটি শ্রেণি সংগ্রামে পরিণত হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অতিক্রম করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পরিবর্তিত করতে পারেনি। ফলে নিম্নবর্গের জঙ্গি আন্দোলন মূল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে যেতে পারেনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের একটা খণ্ডিত অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে সাবঅলটার্ন স্টাডিস কালেক্টিভ বহবার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। শ্রেণি নয়, তাদের লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে সম্প্রদায়। বস্তুবাদী বিশ্লেষণের জায়গায় থেকে সরে এসে কালেক্টিভের লেখকরা সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ হয়ে উঠেছেন। মনস্তত্ব ও পরিচয়ের রাজনীতির চর্চাও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমত অবস্থায়, এ সব বিষয়ে চর্চার ফলে উপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে নতুন ধরনের ব্যাখ্যা উঠে আসছে। এ প্রসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই হল :

1. Partha Chatterjee, *Nationlist Thought and the Colonial World : A Derivative Dicourse ?* (1986)

2. Partha Chatterjee, *The Nation and its Fragments. Colonial and Post Colonial Histories.* (1993)

পার্থ চ্যাটার্জী ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পৃথক তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন কিন্তু তাঁর কাছে

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধারণার উপর ভিত্তি করে। পার্থ চ্যাটার্জীর ভাষায় তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—"derivative discourse from the West. বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের ধারণা যে ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপান্তরি হল :

(১) প্রস্থানের মুহূর্ত : জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকিত যুগ পরবর্তী সময়ে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রভাবে যখন জাতীয় চেতনার জন্ম হল।

(২) কৌশলের সময় : যখন জনসাধারণকে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার সমর্থনে নিয়ে আসা হল।

(৩) আগমনের সময় : যখন এই চেতনা প্রকাশ পেতে শুরু করল সুসংবদ্ধ আলোচনায় এবং ক্রমে যখন তা একটি যুক্তিবাদী ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

শেষের দিকে গবেষণামূলক রচনায় চ্যাটার্জী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপের দুটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন।

(ক) বাহ্যিক বস্তুবাদী ক্ষেত্র : উপনিবেশিক রাষ্ট্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো পাশ্চাত্যের জাতীয় রাষ্ট্রে যেমন হয় সে ধাঁচে গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলো বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এই জায়গাগুলোতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশিক শাসনের অসাম্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

(খ) অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র : বুদ্ধিজীবীরা এমন একটি জাতীয় সংস্কৃতির প্রচারের চেষ্টা করছিলেন যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির থেকে আলাদা। এই অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তারা বিদেশি হস্তক্ষেপ বিরোধী ছিলেন। তাই এখানে জাতীয়তাবাদ ছিল সার্বভৌম। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা ভারতীয় সমাজের নিচুতলার/বা নিম্নবর্গের মানুষদের হয় জোরপূর্বক সম্মতি আদায় করে অথবা গায়ের জোরে তাদের প্রতিবাদ দমন করে সবার মধ্যে একটা একাত্মবোধ তৈরি করে ভারতীয় সমাজকে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছিলেন।

পার্থ চ্যাটার্জীর মতে অভিজাত আর নিম্নবর্গের রাজনীতি এমনভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত যে তাকে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনীতি কখনওই সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হবে না।

৩.৪ ১৮৫৭ পরবর্তী সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি

১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর থেকেই উপনিবেশিক শাসননীতি অনেক বেশী রক্ষণশীল ও কঠোর হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সমাজে ভূস্বামীদের প্রাধান্য স্বীকার করে ব্রিটিশ শাসক ভূস্বামীদের আরও বেশি ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে ভূসম্পত্তির আধিকারিকরা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৭৭ সালের রাজকীয় দরবারে অর্থাৎ দিল্লি দরবারে যেখানে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারত সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই দরবারের অভিজাত ভূস্বামীদের, দেশীয় রাজন্যবর্গের আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারতীয় সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা মান্যতা দিয়েছিল। তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল। এই সময়ে জমিদার শ্রেণিও উপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বেশ

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। স্থানীয় জমিদাররা স্বার্থ রক্ষার্থে ১৮৫১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। (British Indian Association)।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টস অনুযায়ী আইন সভায় বা Legislative Council's গুলোতে খুবই সীমিত সংখ্যায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ দেওয়া হয়। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে নন-অফিসিয়াল (non-official) ভারতীয় সদস্য সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এই সব সদস্যরা আগে থাকতে গভর্নরের অনুমোদন করা নয় এমন কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতেন না। উপমহাদেশ জোরদার বিক্ষোভের পর যদিও ১৮৬৫ সালে আয়কর তুলে নেওয়া হয়। ১৮৬৭ তে আবার তা পুনরায় অন্য নামে আরোপিত করা হয়। এই কর সব রকমের ব্যবসাও ও পেশার উপর ধার্য করা হয়। আয়করের বদলে এই করের নাম হয় সার্টিফিকেট ট্যাক্স। ১৮৭০ সালে আরও একটু পোশাকী কথায় আবার এই কর ৩.১২% হারে লাগু করা হয়েছিল। এর সঙ্গে, অপরদিকে ৩১শে মার্চ ১৮৭০ সালে সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে জানা যায় যে ইংরেজি শিক্ষার খাতে বরাদ্দ ব্যয় কমিয়ে উপনিবেশিক সরকার সেই অর্থ জনসাধারণের শিক্ষাখাতে ব্যয় করবে এবং সে শিক্ষা হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে। এ সময়ে উপনিবেশিক সরকার সামরিক খাতে, হোম চার্জেস অর্থাৎ ভারতে শাসনব্যবস্থা চালানোর যে ব্যয় হয় তার জন্য, এবং সামগ্রিক ভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা চালানোর জন্য যা খরচ হয় পাবলিক ওয়ার্কসের খাতে যা ব্যয় হয় সেই খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করতে শুরু করে।

১৮৭৬ সালে লর্ড লিটন ভাইসরয় থেকে ভারতে আসার পর থেকেই এত রকমের আইন ও নীতি ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দিতে থাকেন যে তাদের মধ্যে ক্রমে অসন্তোষ ও হতাশা বেড়ে উঠতে থাকে। চারিপাশে ক্ষোভের আবহাওয়া তৈরি হয়।

১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করা হয়। ভারতীয়দের দাবি ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র লন্ডনের সঙ্গে কলকাতায়ও করা হোক। সে দাবিও অপূর্ণ থেকে যায়। এর উপর, ১৮৭৮ সালে ভাইসরয় আবার ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (আইন) পাশ করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের ব্রিটিশ নীতি সমালোচনার অধিকার খর্ব করে দেয়।

(এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে, এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের একাংশ ই.ই. গ্লাডস্টোনের নেতৃত্বে এই আইনের প্রতি ধিক্কার জানান)।

ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৮৭৬ তে লিটন তার কুখ্যাত আর্মস এ্যাক্টের প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন। এই আইনের মূল বক্তব্য ছিল ভারতীয়রা যদি তাদের কছে কোনও প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে চান তাহলে তাদের সরকারি অনুমোদন লাগবে অর্থাৎ লাইসেন্স লাগব। এই আইনের আওতায় বাইরে রাখা হল ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গিদের।

১৮৮০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে উদারপন্থী দল ক্ষমতায় আসে যার ফলে লর্ড লিটন পদত্যাগ করেন। তার জায়গায় ভারতে নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড রিপন। কিন্তু দুর্ভাব্যবশত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে সংকীর্ণ রক্ষণশীলতা ছিল তা আর দূর করা সম্ভব হয়ে উঠল না।

যদিও রিপন ব্যক্তিগত ভাবে উদারপন্থী সংস্কার সাধনে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি চেষ্টা করেছিলেন ভারতে আঞ্চলিক স্তরে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার। এছাড়াও তিনি চেয়েছিলেন ভার্নাকুলারে প্রেস এ্যাক্ট বাতিল করতে। আর্মস এ্যাক্ট বা অস্ত্র আইনের সংশোধন করতে চেয়েছিলেন যাতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ খানিকটা দূর করা যায়। রিপনের প্রস্তাবগুলোতে অবশ্য শাসক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা বিশেষ সায় ছিল না। সবসময়ই রিপনকে তাঁরা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতেন।

এই বিশেষ তীব্র আকার নেয় পৌঁছল যখন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য কর্টনি ইলবার্ট। ১৮৮৩ সালে বিতর্কিত ইলবার্ট বিলটি পেশ করলেন। এই বিল ভারতীয় জুরিদের ক্ষমতা দিয়েছিল ইউরোপীয়দের বিচার করবার। শুধু ইংরেজ রক্ষণশীল দলের সদস্যরাই না উদারপন্থী দলেরও একাংশ এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল মেয়েলী ভাবাপন্ন ভারতীয় পুরুষরা কখনওই পুরুষালী ইয়োরোপীয়দের বিচারের যোগ্যতা থাকতে পারে না। আর তাছাড়া ভারতীয় পুরুষরা যেভাবে ভারতীয় মহিলাদের অশ্রদ্ধা অসম্মানের সঙ্গে অন্তপুরস্থ করে রাখেন তারা কি ভাবে একজন ইংরেজ মহিলার আত্মসম্মান এর চরিত্রের বিশুদ্ধতা বুঝতে সক্ষম হবেন?

ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিক্ষোভ এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে শেষমেশ রিপন বাধ্য হয়ে এই বিল খারিজ করে দেন। সংশোধিত বিলে বলা হয় যে ইউরোপীয়দের বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয় জুরিদের সঙ্গে ইউরোপীয় জুরিদের থাকা বাধ্যতামূলক। ইলবার্ট বিল বিতর্কের পর ভারতীয়রা উপলব্ধি করেন যে মহারানীর ঘোষণাপত্রে (১৮৫৯) যতই ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে সাম্যের প্রতিশ্রুতি থাকুক না কেন উপনিবেশিক শাসনে বাস্তবে তা কখনোই সম্ভবপর হতে পারবে না।

৩.৫ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান এবং বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সমিতির রাজনীতি

১৮৫৭ পরবর্তীতে ভারতের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়—

১৮৫৭ পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতের ইতিহাসে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ মূলত ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষার্থে। ১৮৬০ এর দশকে এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে অন্তর্কলহ এবং দলাদলি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছয় যে বাংলার জনজীবনে ধীরে ধীরে তার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। অভিজাত ভূস্বামীদের নেতৃত্বাধীন সমিতিগুলো এসময় থেকেই তাদের প্রাধান্য হারাতে থাকে। পুরাতন সমিতিগুলোর জায়গায় উঠে আসতে থাকে পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন নতুন সব সমিতি। ১৮৭৫ এ প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান লীগ এবং অবশেষে ১৮৭৬ সালে স্থাপিত হয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পেশাদারি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করতেন। ১৮৫৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট বা সনদ আইনের পুনর্নবীকরণ বা রিনিউ হওয়ার আগেই ১৮৫০ সালের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বে এ্যাসোসিয়েশন ও মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন।

এইসব সমিতির সকল সভ্যই ছিলেন ভারতীয় প্রায় একই রকমের দাবি জানিয়ে তিনটি সমিতির সদস্যরা তিনটি পৃথক আবেদন পত্র লন্ডনে পাঠান। তাদের দাবিগুলো ছিল যথাক্রমে—আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ। দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থার মতো অত্যন্ত অযোগ্য একটি শাসনব্যবস্থা এবং তারই মতো আরও যে সব সংখ্যায় অন্যন্য ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলোর সংশোধন। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, ভারতীয়দের উপর শত্রুতাভাবাপন্ন বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন বন্ধ করা, তাদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা না চাপানো, শিক্ষা ও পরিষেবামূলক ব্যবস্থার প্রতি আরও বেশী আগ্রহী হওয়া, লবণ ও আফিমের ব্যবসার সরকারী একচ্ছত্র অধিকার রদ করা ইত্যাদি। উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অপসারণ নয় বরঞ্চ উপনিবেশিক শাসকের কাছে থেকে বিভিন্ন দাবি আদায়ের আবেদন—এটাই ছিল আধুনিক ভারতের রাজনীতি ও রাজনীতির হাতিয়ার। এরই উপর গড়ে উঠেছিল ভারতীয় রাজনীতির এক নতুন ধারা। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমিতিগুলোর এটাই ছিল মস্ত এক অবদান।

১৮৭৬-এ দাদাভাই নওরোজী ও নওরোজী ফরদুনগী ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে বোম্বের জনজীবনে বোম্বে এ্যাসোসিয়েশনকে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে উদ্যোগী হন। এ সময় বোম্বেতে এ ধরনের আর একটি সমিতিও ছিল ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। অবশ্য এই সমিতিটি দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি।

রাজনীতিতে যে সময় তরুণ প্রজন্মের নেতাদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন—পি. এম. মেটা, এম. জি. রানাডে, কে.টি তেলাং প্রমুখ। ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত পুনা সর্বজনিক সভাও সমসাময়িক রাজনীতিতে যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সভার সদস্যরা সকলেই বেশ দক্ষতার সঙ্গে সভা কাজ পরিচালনা করতেন। তাঁরা তাদের সভাকে জনসাধারণের সভা এই পরিচয়ে পরিচয় করাতেন।

তুলনামূলকভাবে মাদ্রাজের রাজনৈতিক সমিতিটির বিকাশ ঘটেছিল ধীরগতিতে। এমন কি ১৮৬২র পর মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তি ঘটে। তবে আবার ১৮৮৪ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভা স্থাপিত হবার পর থেকেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সক্রিয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রেসিডেন্সী শহরগুলোর বাইরে আরও অন্যান্য যে সব রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হল পাঞ্জাব লাহোর ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, যুক্ত রাজ্যে (United Provinces) এলাহাবাদ পিপলস' এ্যাসোসিয়েশন।

ভারতীয় সমাজে নতুন গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সাংস্কৃতির নেতৃত্ব দিয়েছিল অবশ্যই ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, পেশাদারী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা। এই রাজনীতি সচেতন নেতৃত্ব উপনিবেশিক শাসনের অবলুপ্তি চায়নি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবিপূরণের আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তা আদায় করা। তাদের কিছু দাবি ছিল অঞ্চলভিত্তিক আবার কিছু ছিল জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি :

- আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব দাবি
- প্রশাসনের ক্ষেত্রে কার্যনিবাহী বিভাগকে (executive) বিচার বিভাগ (judiciary) থেকে আলাদা করা।

- সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ভারতীয়করণ এবং একই সঙ্গে ভারতে এবং ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- সুতি বস্ত্রের পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ।
- হোম চার্জেস ও যুদ্ধ খাতে ব্যয় সংকোচন
- ভারত ও ইংল্যাণ্ডের আর্থিক সম্পর্কের চুক্তিভিত্তিক পুনর্গঠন
- ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার

এই সব দাবি পেশ করা ছাড়াও ভারতীয়রা প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন আয়কর, ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট, অস্ত্র আইন, আরোপের বিরুদ্ধে। কয়েকটি সমিতি তাদের কার্যাবলীর মধ্যে কৃষক সমস্যাও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সমিতির সদস্যদের অনেকেই জড়িত ছিলেন বাংলার নীল বিদ্রোহে, মহারাষ্ট্রে ডেকান রায়েটে অথবা কৃষকদের উন্নয়নের জন্য নানান কাজের সঙ্গে ভারতীয় জনজীবন সমিতিগুলো তাদের কাজের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সচেনতা তৈরি করতে পেরেছিল। ফলে উপনিবেশ সরকারও রাজনীতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে উঠল রাজনৈতিক সমিতিগুলোর তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারছিল।

৩.৬ সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ

সাধারণভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার উৎস বলে চিহ্নিত করা হয় উনিশ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সমিতিগুলোতে পেশাদারি মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব রাজনৈতিক কার্যকলাপ। কয়েকজন ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন ভারতে আধুনিক রাজনীতির উৎস রাজনৈতিক সমিতি সমূহের কার্যকলাপ নয়, শিক্ষিত ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তারও আগে সমাজসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উপনিবেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল শাসক গোষ্ঠীর মনে যা শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য শাসকের প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন ছিল শোষিতের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, তাদের ইতিহাস, ভাষা, আইন-কানুন, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে জ্ঞান। শাসকের এই প্রচেষ্টা এবং তার ফল প্রভাবিত করেছিল দেশীয় বুদ্ধিজীবীদেরও। তারাও পশ্চিমের পণ্ডিতদের চোখ দিয়ে পুনরাবিচার করলেন দেশের অতীত, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান সমূহকে। সন্ধান পেল নিজেদের শক্তি এবং দুর্বলতার। এই অতীত অনুসন্ধান ফলে অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে প্রকাশ সর্বপ্রথম দেখা যায় ১৮২৮ সালে যখন রামমোহন রায় স্থাপন করেন ব্রাহ্মসমাজ। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেবল অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়ই নয়, রামমোহনকে প্রভবিত করেছিল জ্ঞানদীপ্ত ইউরোপের বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, স্বাধীনতার মন্ত্র এবং সাম্যবাদ। উনিশ শতকের কুসংস্কার আচ্ছন্ন অন্ধকারে ঢাকা,

অবক্ষয়িত সমাজকে রামমোহন সংস্কার দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরাতে চেষ্টা করেছিল। রামমোহনের পর আরও অনেকেই সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। যে সব প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেগুলো হল :

- পরমহংস মণ্ডলী এবং মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সভা
- উত্তর ভারতে এবং পাঞ্জাবে আর্য সমাজ
- যুক্ত প্রদেশে কায়স্থ সভা
- পাঞ্জাব সাধন সভা
- মহারাষ্ট্র সত্যশোধক সমাজ
- কেরালায় শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন সভা

অপরদিকে মুসলমান, শিখ এবং পারসি সমাজেও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল যথাক্রমে আহমদিয়া ও আলিগড় আন্দোলন, সিংহ সভা এবং রেহনুমাই মাযদায়সনান (Rehnumai Mazdayasnan) সভার মাধ্যমে। যদিও মূলত ধর্মসংস্কার এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তাহলেও এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ শুরু হওয়া আন্দোলন। নিছক সংকীর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। তাদের মধ্যে দেখা মেলে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা ও উদারতা, যুক্তিবাদ ও সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা।

রাজা রামমোহন রায় কিংবা অক্ষয়কুমার দত্তের মতো ব্যক্তিরা বিশ্বব্যবস্থা যে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় চলে তা জোরের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে চেয়েছিলেন এবং যুক্তিবাদের প্রেক্ষিতে সমসাময়িক ধর্মীয় সামাজিক প্রচলিত রীতিনীতিকে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কোনও অলৌকিক বা আধিদৈবিক বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। তিনি উৎসাহী ছিলেন মানবসেবায় আর জনহিত সাধনায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বস্তুগত অবস্থান ব্যাখা করতে গিয়ে ধর্মচর্চার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার মাত্রা যোগ করেছিলেন।

সৈয়দ আহমেদের মতে যে ধর্ম মানব সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায় সেই ধর্মই স্বার্থক ধর্ম। মহারাষ্ট্রের জে. এইচ. দেশমুখ প্রচার করতেন ধর্মকে যুগপোযোগী করে তোলাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের কাঠামোতেও পরিবর্তন আনা জরুরী।

আসলে ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দু'টো :

(ক) সাংস্কৃতিক আদর্শগত লড়াই। এই লড়াই ছিল ঐতিহ্যশালী প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে পশচাদপদ, অনগ্রসর উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে যেমন পৌত্তলিকতা, বহু দেবদেবীর পূজা, পুরোহিতন্ত্র, পুরোহিতের একচ্ছত্র ধর্মব্যাখ্যার অধিকার, জটিল ধর্মাচরণের পদ্ধতি, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি।

(খ) সাংস্কৃতিক আদর্শগত লড়াই উপনিবেশিক সংস্কৃতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম যুগের সমাজ সংস্কার করা সমাজে জাতিভেদ প্রথার কুপ্রভাব সম্পর্ক যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাই তারা এই

প্রথা বিলোপ করবার সর্বত্র চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন রায় এই প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন অবশ্যই কিন্তু বাস্তবে এই প্রথা সমাজ থেকে দূর করতে পারেননি। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রানাডে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো ব্যক্তিত্বরাও। এই প্রথার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র প্রতিবাদ এসেছিল সমাজে যারা তথাকথিত নিচু জাত বলে পরিচিত তাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নিম্নজাতির মানুষদের আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন জ্যোতিরাও ফুলে এবং নারায়ণ গুরু প্রমুখেরা।

এছাড়াও নারী প্রশ্ন ও নারীর উন্নতি ছিল সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম একটি একক। সংস্কারকরা বুঝতেন যে পরিবারে এবং এসব সমাজে নারীর অবস্থান সামজিক প্রগতির মাপকাঠি তাই স্ত্রীজাতির উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। সমাজসংস্কারকরা ভারতীয় সমাজের সংস্কার সাধানে কিন্তু অন্ধের মতো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অনুকরণ করেননি। তারা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ভাবনার সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মেলবন্ধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কুসংস্কার মুক্ত আধুনিক ভারতীয় সমাজ।

দুর্ভাগ্যজনক এই যে উনিশ শতকের এই ঐতিহ্য আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা মিলিয়ে যে আধুনিকীকরণের চিন্তা করা হয়েছিল তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল এই শতকেরই শেষের দিকে। উপনিবেশিক শাসন যত বেশি ভারতে বিস্তৃত হতে শুরু করল ততই ভারতীয়রা যেন বেশি করে কেবল নিজেদের অতীত অস্তিত্বকে নিজেদের ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের প্রাচীন গরিমা ও ঐতিহ্য পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা দেখা গেল সর্বক্ষেত্রে, ভাষায়, আচার অনুষ্ঠানের বিধিতে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, ধর্মে। দেশজ ভাষা, দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্প, সাহিত্য দেশীয় খাদ্যাভ্যাস, দেশীয় পোশাকআশাক, দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, ঔষুধাদি, প্রাক্ উপনিবেশিক যুগের কারিগরি বিদ্যা ইত্যাদির পুনাবিষ্কারের প্রতি ভারতীয়দের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তৈরি হল। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের ফলে সৃষ্টি হল একটি বিকল্প সাংস্কৃতিক আদর্শ যা উপনিবেশিক শাসকদের সাংস্কৃতিক আদর্শের একেবারে পরিপন্থী। এই দুই সাংস্কৃতিকে আদর্শের টানাপোড়েনের ফলে পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার। উপনিবেশিক রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিরোধ হিসাবেই হয়েছিল ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক আদর্শের পুনরুত্থান। আর এটাই ছিল উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম প্রতিবাদ।

৩.৭ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা : মিথ (কিংবদন্তী/কল্পনা) অথবা বাস্তব সত্য

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং বিকাশের ইতিহাস ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে ডাব্লু. সি. ব্যানার্জি (উমেশচন্দ্র) সহ ৭২ জনের উপস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটাই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ঘটনার ঠিক বছর দুই আগে ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উদ্যোগে কলকাতাতে শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল

কনফারেন্স। (Indian Natinal Conference) তবে শেষপর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রসারে একমাত্র প্রধান একটি সংগঠন হিসাবে পরিচিত পেয়েছিল।

১৯৫০ এর দশকের প্রায় সব ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির মূলে ছিল এল্যান অক্টাভিয়ান হিউম নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারি আধিকারিকের (Civil Servant) মস্তিষ্কপ্রসূত একটি পরিকল্পনা। সে সময়কার ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে আলোচনা করে তার সহযোগিতায় হিউম অবশেষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৬ সালে।

উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে ক্ষোভ এব বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল তা যাতে ষড়যন্ত্রের রূপ নিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না পরিণত হতে পারে সেই কারণে লর্ড ডাফরিন ভবিষ্যতে হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রতিরোধ করতে জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন।

একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে দেশের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পেশাদারি সম্প্রদায় এবং জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গ তাদের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভের কারণ ও বিরোধিতা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে পারবেন। ডাফরিনের এই তত্ত্বকে বলা হয় সেফটি ভালভ থিয়োরি।

তবে হিউমের সেফটি ভালভ তত্ত্বই যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ তা বলা কিন্তু ঠিক নয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেকাংশে দায়ী ছিল ১৮৭০ এবং ১৮৮০ দশকে প্রেসিডেন্সী প্রদেশগুলোতে অবিরাম ঘটতে থাকা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার শেষ পরিণতি হিসাবে জন্ম নেয় এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হঠাৎ করে হয়নি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ১৮৮৫ ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয়রা যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বিদেশী শাসনের প্রতিরোধ করতে সক্ষম, সেই রাজনৈতিক সচেতনতা থেকেই তৈরি হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ।

এ. ও. হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয়দের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের কারণেই তার পক্ষে বোম্বাইতে ২৮-৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ সাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সফলতার সঙ্গে সংগঠিত হয়েছিল।

তবে এ প্রসঙ্গে একথা বলতে হবে যে যদিও ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় হিউম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তবুও এটাও ঠিক যে যদি হিউম নাও থাকতেন তাহলেও কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হতই কারণ সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই ১৮৭০ এবং ১৮৮০ দশকের রাজনৈতিক সমিতিগুলোর রাজনীতি চর্চা এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। সে সময়ে রাজনৈতিক বিক্ষোভগুলোর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল—লেক্সলকি আইন (LexLoci Act) বিষয়ে। ইলবার্ট বিলের ব্যাপারে প্ল্যান্টেশনের শ্রমিকদের এবং ইংল্যাণ্ড ইমিগ্রেশন এ্যাক্ট বিষয়ে। এছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগী হয়েছিলেন সর্বভারতীয় স্তরে একটি জাতীয় তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে। তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সংগৃহীত অর্থ দিয়ে যাতে ভারতে এবং ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা যায়। যদিও এই উদ্যোগ এসেছিল মূলত বাংলা থেকে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভারত সভা

(Indian Association) এর তরফ থেকে তাহলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কিন্তু শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য প্রেসিডেন্সী শহরগুলোতে এমনকি লাহোর, অমৃতসর, মেরাঠ, কানপুর, আলিগড়, পুণা, আহমেদাবাদ,সুরাট, পাটনা এবং কটকের মতো প্রাদেশিক ছোট ছোট শহরগুলোতে। সারা দেশ জুড়ে একটি ঐক্যের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণ ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয় সমাজের অভিজাতদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বন্ধন নিয়ে আঞ্চলিক ভেদাভেদ দূর করে সকলে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে ছিল আঞ্চলিক ঐক্য সাধনের ভারতবাসীকে এক সূত্রে আবদ্ধ করা। প্রথম অধিবেশনই সদস্যরা এ বিষয়ে একমত হয়ে এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। আঞ্চলিক বিভেদ দূর করতে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতি বছর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষের নানান স্থান ঘুরে ফিরে করা হবে এবং প্রতি বছরের অধিবেশনে যারা সভাপতিত্ব করবেন তারা হবেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা। ১৮৮৮ সালে স্থির হয় যে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হবে তখনই যখন বিপুল সংখ্যক সদস্যরা হিন্দু হোক বা মুসলমান সে প্রস্তাবকে অনুমোদন করবেন। কংগ্রেস অধিবেশনে কার্যপ্রণালী পার্লামেন্টের কার্যপ্রক্রিয়া অনুসারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালানো হবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বেশ কিছু সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। একথা অনস্বীকার্য। এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষরাই। অনাভিজাত বা নিম্নবর্গের মানুষদের কোনও প্রতিনিধিত্ব ছিল না, অন্ততঃ গোড়ার দেকে তো বটেই। প্রথম অধিবেশনের প্রায় সকল সদস্যরা কোনও না কোনও পেশায় নিযুক্ত ছিলেন, যেমন কেউ ছিলেন আইনজীবী কেউ বা ডাক্তার, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার এরা ছাড়াও ছিলেন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিরা। অবশ্য কিছুকালের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনে ভূস্বামীদের প্রাধান্য দূর হয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে চলে এসেছিল।

যদিও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় ঐক্য সাধনের তবুও প্রথম থেকেই সংগঠনের মধ্যে আঞ্চলিক বিভেদ বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। যেমন প্রথম অধিবেশনে সদস্য সংখ্যার কথা যদি বলা যায়, যেখানে বোম্বাই থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আটত্রিশ জন, মাদ্রাজ থেকে একুশ সেখানে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং আওয়াধি থেকে মাত্র সাত। বাংলা ও পাঞ্জাব থেকে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সর্বসাকুল্যে কেবল চার ও তিন ভাগ প্রতিনিধি। জাতীয় কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল গোড়ার দিকের বেশিরভাগ সদস্যরাই ছিলেন বর্ণ হিন্দু; বেশ কয়েকবছর ধরে এই ধারার অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রথম যুগের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল মধ্যপন্থী। সেসময়কার সদস্যরা ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র বা ভারত থেকে বিদেশি শাসন অপসারণে আগ্রহী ছিলেন না। শাসকদের প্রতি তাদের যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বস্ততা ছিল। তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশিক শাসন কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে সীমিত মাত্রায় কিছু সংস্কার সাধন ও সীমিত কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাবিপূরণ আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে। বলা যেতে পারে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তার যাত্রা শুরু করেছিল সীমিত কিছু লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে

একথা মানতেই হবে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল।

কংগ্রেসের যারা সদস্য ছিলেন তারা যেহেতু নানান পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং নিজ নিজ পেশায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারা কেউই সর্বক্ষণ রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারতেন না। বছরে একবার ভারতের কোনও একটি শহরে নির্বাচিত কোন সভাপতির অধীনে অধিবেশনে মিলিত হতেন। ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ তাদের কাম্য ছিল না। ব্রিটিশ সংবিধানে তাদের আস্থা ছিল তারা কেবল ব্রিটিশ শাসনে 'অ-ব্রিটিশ' যা কিছু ছিল তারই বিরোধিতা করেছিলেন। 'সুসভ্য' ব্রিটিশ জাতির কাছে তাদের উত্থাপিত দাবি ছিল :

- উপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার।
- সেক্রেটারি অফ স্টেটকে ভারত বিষয়ে যে ইন্ডিয়া কাউন্সিল উদারনীতি গ্রহণ করতে বাধার সৃষ্টি করে সেই ইন্ডিয়া কাউন্সিলের অবলুপ্তি।
- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সম্প্রসারণ। স্থানীয় সংগঠন, চেম্বার অফ কমার্স, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি থেকে অন্ততঃ ৫০% নির্বাচিত সদস্যের কেন্দ্রীয় ও আইন সভায় অন্তর্ভুক্তি।
- উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে নতুন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।
- ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী সভায় (Executive Council) দু'জন ভারতীয় সদস্যর অন্তর্ভুক্তি এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের কার্যনির্বাহী সভায় যথাক্রমে একজন করে ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা।
- আইন সভায় বাজেট নিয়ে আলোচনা এই বিষয়ে প্রশ্ন করবার অধিকার।
- ভারত সরকারের বিরুদ্ধে হাউস অফ কমনস্ এর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আপিল করবার অধিকার।
- ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেস এর ভারতীয়করণ।
- সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচন। ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের জন্য অন্ততঃ আর্থিক ব্যয়ভার বহন করবার আবেদন।
- ভারতীয়দের সামরিক বিভাগে উচ্চপদে নিয়োগ।
- জুরি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
- অস্ত্র আইন বাতিলের দাবি। দেয় রাজস্বের পরিমাণের খাতে অতিরিক্ত মূল্যায়ন না হয় তাই ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ।
- লবণ আইনকে বাতিলের দাবি।
- চা বাগান ইত্যাদি প্লান্টেশনে কর্মরত অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের জীবন ধারণের এবং কর্মক্ষেত্রের মান উন্নত করবার দাবি।

কংগ্রেসের এই সব দাবিগুলোর মধ্যে অনেক দাবিই প্রাক্-কংগ্রেস আমলে বিভিন্ন প্রদেশ অবস্থিত রাজনৈতিক সমিতিদের তরফ থেকে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রথম যুগের কংগ্রেসের সদস্যরা ছিলেন মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। অধিকাংশ ঐতিহাসিকরাই এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন।

৩.৮ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব

কংগ্রেসী রাজনীতিবিদরা কেবল প্রশাসনিক সংস্কারের দাবিই জানাননি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক নীতিরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে তারা বুঝেছিলেন কীভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ তাঁরা এবং উনিশ শতকের শুরু থেকে উপনিবেশিক সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে শোষণ করে চলেছিল। কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন ক্রমাগত করে চলা উপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের সমালোচনা ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মনে বিদেশী শাসকের প্রতি একটা বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল যা উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরু—এই সময়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে সহায়তা করেছিল।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাঁরা আশা করেছিলেন যেহেতু সে সময়ে ব্রিটিশ জাতি ছিল বিশ্বসেরা তাই হয়ত বা ব্রিটিশ উদ্যোগ ভবিষ্যতে ভারতের আধুনিকীকরণ সম্ভবপর হবে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ থেকেই তারা ক্রমে নিরাশ হয়ে আস্থা হারাতে শুরু করেন। তাঁরা উপনিবেশিক সরকারের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। উপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য উপনিবেশের সম্পদ অপহরণ ও সর্বতোভাবে উপনিবেশকে আর্থিকভাবে শোষণ করা। এরপর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণনীতির তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। নানা বক্তব্যে তাদের সমালোচনা প্রকাশ পেতে থাকে। উপনিবেশিক শোষণ নীতির সমালোচনা করে তাঁরা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর ফলে দেশবাসীর মধ্যে শোষণকারী উপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে বিরূপ মনোভঅব সৃষ্টি হতে শুরু করে যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তরিত হয়। যে সব বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশিক অর্থনীতির সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের ধারণাকে উন্মোচিত করেছিলেন তারা হলেন—দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত, জি.ভি. যোশী, জি. সুব্রুমনিয়া আইয়ার, জি. কে গোখলে প্রমুখ।

ভারতে উপনিবেশিক শাসনের বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখান যে ভারতীয় অর্থনীতির বিকালের প্রধান অন্তরায় ছিল উপনিবেশিকতাবাদ। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প এবং অর্থ বিষয়ে (finance)—এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে ব্রিটিশ অর্থনীতি। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি হয়ে পড়েছে অনগ্রসর।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের লেখায় বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে প্রথম যুগে উপনিবেশিক শাসকরা লুটপাট ও মার্কেন্টাইল নীতি অনুসারে একচেটিয়া একতরফা বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির শোষণ করেছিল। তারপর ক্রমশ শাসকরা তাদের এই শোষণ পদ্ধতিকে আরও মার্জিত করা হলে ফ্রী ট্রেড বা অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগের নীতির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও বেশি অনগ্রসর ও আরও বেশি ব্রিটিশ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন করে তুলেছিল।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। যে দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত সে দুটি হল :

1. Dedabhai Naorogi, *Poverty and UnBritish Rule in India* (1901).
2. R. C. Dutt, *Economic History of India*. 2 vols. (1901-1904)

বিদেশি শাসকদের নীতির ফলে ভারতীয় অর্থনীতির অবক্ষয় ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় অর্থনীতি যে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে সে সম্পর্কে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় জনসাধারণকে আগাম সতর্ক বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন। উপরন্তু তাঁরা অর্থনৈতিক অধঃপতন থেকে বেরিয়ে আসবার রাস্তাও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন হতে পারে একমাত্র দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ ভারতে শিল্পায়নের ফলে।

ভারতের অর্থনীতির অবক্ষয় আরও একটি কারণ কুটির শিল্পের অবক্ষয়, হস্তশিল্পের বিনাশ। এছাড়াও ভারতের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা দায়ী করেছন ভারতীয় অর্থনীতিতে রেলের ভূমিকাকে, এবং ব্রিটিশ শুল্ক নীতিকে। তবে তাঁদের মতে ভারতীয় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা উপনিবেশিক শাসকের শোষণ নীতির অন্তর্গত 'নিষ্কাশন তত্ত্ব'টির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব রোপণ করেছিলেন। বিদেশি শাসক, উপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিকরা, সামরিক নেতারা, বেসামরিক কর্মচারীরা, আধিকারিকরা কতরকম ভাবে কত রকম কৌশলে ভারতের অর্থ এবং সম্পদ নিষ্কাশন করে ভারতে বাইরে গিয়ে নিয়েছিলেন সে বিষয় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের নজর এড়ায়নি। তাঁরা এই সম্পদ নিষ্কাশনের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন বিদেশিরা বেতন এবং পেনশনের মাধ্যমে, ঋণের উপর সুদ হিসাবে, পুঁজিপতিদের মুনাফার রূপে, হোম চার্জেস হিসাবে ভারতের অর্থ সম্পদ ব্রিটেনে চালন হয়ে গেছে। নিষ্কাশন তত্ত্বের প্রবক্তা দাদাভাই নওরোজী মনে করতেন ভারতে থেকে ব্রিটেনে সম্পদ নিষ্কাশনই ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে মন্দ দিক। আর ভারত থেকে এই অর্থ সম্পদ আহরণের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। দাদাভাই নওরোজী ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতি-সমূহকে দায়ী করেছিলেন ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করবার জন্য। রমেশচন্দ্র দত্ত আর একজন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী যিনি দাদাভাই নওরোজীর মতের সমর্থক ছিলেন। ব্রিটিশদের ভারতীয় অর্থসম্পদ নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা। উপনিবেশিক শাসনের শোষণকারী স্বরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করে তাঁরা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। বিংশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও উপনিবেশিকরা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। এমনকি গান্ধাবাদী রাজনীতির যুগেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি মূল্য ইস্যু ছিল অর্থনৈতিক শোষণ।

৩.৯ হিন্দু পুনরুত্থান ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্তর

গোড়ায় কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি ছিল। তাদের মধ্যে আবার বেশিরভাগই বর্ণ হিন্দু অর্থাৎ উচ্চবর্গের হিন্দু। যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ। কংগ্রেসে মুসলমান সদস্য সংখ্যা ছিল শতকরা ৫.৫। এই জন্য কংগ্রেসের মধ্যে একটা হিন্দু রক্ষণশীলতার ধারা এই সময় লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেসের হিন্দুদের প্রাধান্য লক্ষ্য করে মুসলমানদের নেতা সৈয়দ আহমেদ খান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দু আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে এমন কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলোর দ্বারা কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমান নেতারা প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু

১৮৯৩ সালের ঈদের গোহত্যা কেন্দ্র করে যে দাঙ্গা হয় তাতে কংগ্রেসের নীরবতা মুসলমানদের কংগ্রেসের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। আর এর ফলে ১৮৯৩র পর থেকে কংগ্রেসে মুসলমান সদস্যরা সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুসলিম সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্য তেমন বিশেষ একটা চেষ্টাও দেখা যায়নি। কংগ্রেসী নেতারা এ ব্যাপারে তেমন একটা ভাবিত ছিলেন না। সে সময়ে মুসলমানদের কংগ্রেসের সমতুল্য কোন আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হয়নি। মুসলিম লীগ স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে।

হিন্দু কংগ্রেসীদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব তৈরি হবার কারণ উনিশ শতকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুত্থান। হিন্দু অতীতের পুনরুত্থান ঘটেছিল। সে সময়ে হিন্দুধর্ম কেন্দ্রিক সে সব সামাজিক সংস্কার আন্দোলন পড়েছিল। আরও বলতে গেলে সে সময়ে ভারতে জাতি গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। 'ভারতীয় জাতি'র যে সংজ্ঞাটা তৈরি হয়েছিল তাও কিন্তু ছিল হিন্দুধর্মের প্রতীক। ইতিহাসও কল্পকথার উপর আধারিত।

যদিও মানুষের ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মাচরণ পালন ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ থাকা উচিত তবুও ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ধর্ম একটা প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল। হিন্দু অতীতের পুনরুত্থানের ফলে "হিন্দু পরিচিতি" বা হিন্দুসত্ত্বা হিন্দুধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের চেতনায় দৃঢ়ভাবে গেঁথে নিয়েছিল। সমসাময়িক কয়েকজন রাজনৈতিক খানিকটা সচেষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু সমাজের কাঠামোগত হিন্দু সংস্কার আনতে। যুক্তিবাদে আলোকে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতিতে কিছু পরিবর্তন আনতে তবুও সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসী নেতারা সামাজিক কুপ্রথা বা কুসংস্কারের অপসারণের তেমন চেষ্টা করেননি। উল্টো পরোক্ষভাবে তারা রক্ষণশীল হিন্দুদের সমর্থন করেছিলেন Age of Concent (1891) বা সহবাস সম্মতি বিল বিষয়ে বিতর্কের সময়। এর পরবর্তী সময়ও কংগ্রেসের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে সমর্থন করেছিলেন। ১৮৯১ তে নাগপুর অধিবেশনের পর কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষে গৌরক্ষিণী সভা একটা বিরাট মিটিং করেছিল। কংগ্রেসের এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মুসলমানদের কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল। এর ফলে জাতীয়তাবাদী অন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তারা দূরে সরে যায়। মুসলমানরা সাধারণভাবে আর্য-সামাজিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতির হিন্দু প্রাধান্য জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করে তোলে, যখন সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী জাতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী ধারাটির উদ্ভব ঘটে। আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে চরমপন্থী মতবাদের উত্থাপনের ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি মধ্যপন্থা থেকে অনেকটাই সরে আসে।

৩.১০ স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী ধারণা

জাতীয়তাবাদীদের ধারণার উদ্ভব এবং বিকাশের প্রথম যুগে রাজনীতি বিষয়সূচিতে গণআন্দোলনের কথা ছিল না, যে বিষয় সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল তা হল ভারতীয় সমাজকে প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে

সচেতন করে তোলা ভারতীয় সমাজের সাধারণ মানুষের ভিতরে রাজনৈতিক চেতনা জানানো। এছাড়াও আরও একটি কাজ ছিল—জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব গড়ে তোলা, জাতীয়তাবাদের ধারণাকে একটি স্পষ্ট রং রূপ দেওয়া। রাজনৈতিক সূচিতে থাকা এই দুই বিষয়ের বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার ছিল সংবাদ মাধ্যম। সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করে ওই সময়ে রাজনৈতিক জনমত গঠনের একটা চেষ্টা শুরু হয়েছিল। যেহেতু কংগ্রেসের সংগঠনে অনেক সাংবাদিক ছিলেন তাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদ মাধ্যমে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে আলোচনা হত যার ফলে কংগ্রেসের রাজনীতি ভারতীয় সমাজে বহুল প্রচারিত ছিল এবং সর্বসাধারণ এ বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচারে ও প্রসারে অতএব বলা যেতে পারে সংবাদ মাধ্যম একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার নিদর্শন পাওয়া যায় সে সময়ের প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্র পত্রিকা থেকে :

(ক) জি. সুব্র্যামনিইয়া আইয়ার "হিন্দু ও স্বদেশী মিত্রান"

(খ) বাল গঙ্গাধর তিলক "কেশরী" ও "মারহাট্টা"

(গ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর "বেঙ্গলী"

(ঘ) শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা"

(ঙ) গোপালকৃষ্ণ গোখলের "সুধারক"

(চ) এন. এন. সেনের "ইন্ডিয়ান মিরর"

(ছ) দাদাভাই নওরোজীর "ভয়েস অফ ইন্ডিয়া"

(জ) জে. পি. ভার্মার "হিন্দুস্থানী" ও "এ্যাডভোকেট"

জাতীয়তাবাদ প্রকারের প্রথম যুগে সংবাদ পত্রপত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক দিকটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হত না যতটা দেওয়া হত সংবাদ পরিবেশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ধারণার প্রচার ও প্রসারকে। সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসায়িক দিকটায় নয়, যে সসময় গুরুত্ব পেয়েছিল তার জনসেবার দিকটা।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষের লগ্ন থেকেই সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা—ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে একটা বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করবার চেষ্টা, উপনিবেশিক রাষ্ট্র সেই প্রথম যুগ থেকে করতে শুরু করেছিল। এর ফলে সংবাদ মাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতার লড়াই এর সঙ্গে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। ১৮৭০ এর দশকে লর্ড লিটনের প্রশাসনিক নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদ পত্র-পত্রিকাগুলোতে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। বিশেষ করে ১৮৭৬-৭৭ এর দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসাধারণের প্রতি সরকারি উদাসীনতা সংবাদ মাধ্যমগুলোর তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। খোলাখুলি স্পষ্টভাষায় কঠোর সমালোচনার ফলে সংবাদ মাধ্যমের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞার জারি করেন লর্ড লিটন। ১৮৭৮ সালে পাশ হয় ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। প্রচুর সংখ্যক ছাপখানা, ছাপার কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পের

প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। সরকার-বিরোধী মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে এই সন্দেহে সরকার সংবাদ মাধ্যমের উপর দমননীতির প্রয়োগ করবার অধিকারী হয়ে উঠে।

লিটনের এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের পদক্ষেপে সারা দেশ রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল হয়ে উঠে। দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদ শুরু হয়। জন সমাবেশে, মিটিং-এ, মিছিলে সকলেই লিটনের এই দমননীতিকে ধিক্কার জানান। জনবিদ্বেষ বাগে আনতে লর্ড লিটনের উত্তরসূরি লর্ড রিপন এই ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট কে বাতিল ঘোষণা করেন ১৮৮১ সালে।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত কাগজ বেঙ্গলীতে সর্বক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিরেধিতা করে লেখা প্রকশিত হত,—তা সে প্রশাসনিক বিচারবিভাগীয়, অর্থনৈতিক নীতি যে বিষয়ই হোক না কেন। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার জন্য বিশেষত সরকারী নীতির কঠোর সমলোচনা করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রথম ব্যক্তি যাকে শাসক জেলে বন্দি করে।

অপরপক্ষে *কেশরী* এবং *মহারাষ্ট্র* এই দুই সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাল গঙ্গাধর তিলক জাতীয়তাবাদের প্রচার করতেন। তার কাগজে তিলক জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতেন তা ক্রমে মধ্যপন্থী রাজনীতিকে সরিয়ে দিয়ে চরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ভেতরে এবং বাইরেও। পরিশেষে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতা ভারতবাসীর মনে সদর্থক জাতীয় চেতনার জাগরণের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১১ সাংবিধানিক রাজনীতির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

যদিও উনিশ শতকের শেষভাগে ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলে (অথবা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে) ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। তবুও এই দুটি মঞ্চকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অন্ততঃ গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদী চেতনা গঠনে এবং প্রসারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। ১৮৬১'র ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টের ফলে ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী সভার সম্প্রসারণ ঘটে। সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয় ছয় থেকে বারোতে। সিদ্ধান্ত হয় যে মনোনীত সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক সভ্য ব্রিটিশ বা ভারতীয় কোন সরকারি পদে থাকবেন না। ১৮৫৭ পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার আগ্রহী হয় উপনিবেশিক শাসন সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিমত জানতে, তাই স্থির হয় যে আইনসভায় ভারতীয়দের সভ্যপদ দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে এই সরকারি সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়নি। ১৮৬১ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত আইনসভায় যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় সভ্য ছিলেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই হয় দেশীয় রাজন্যবর্গ নয় তাদের কর্মচারীরা, নয়ত বড় মাপের জমিদার, বণিক অথবা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ সরকারিপদের কর্মচারী। খুবই কম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন বুদ্ধিজীবী আইন সভায় মনোনীত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যে অল্প কয়েকজন ছিলেন তারা হলেন যথাক্রমে—স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, কৃষ্টদাস পাল, ভি. এন মাণ্ডলিক, কে. এন নলকার এবং রাসবিহারী ঘোষ। আইন সভার অধিবেশনে যখন ভার্নাকুলার প্রেস বিল, লবণ কর, হ্রাস করাবার প্রস্তাব অথবা বেঙ্গল টেনেন্সি বিলের মত ইস্যুগুলোর উপর আলোচনা চলছিল তখন

সভ্য সংখ্যা কম থাকার হেতু উপরোক্ত বিষয়গুলোরে উপর জোরদার ভাষায় জাতীয়তাবাদী মতবাদ পেশ করা যায়নি। যদিও গোড়ার যুগের জাতীয়তাবাদীদের দাবি ছিল স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার তবুও তারা খুবই সন্তর্পণে সসংকোচে নমনীয়ভাবে তাদের দাবি সরকারের কাছে পেশ করতেন কারণ তাদের ভয় ছিল তাদেরকেও না সরকার অবিশ্বস্ত এবং রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায় না ভূষিত করে। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতাদের দাবি ছিল সামান্য আরও বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের আইন সভায় অন্তর্ভুক্তি যাতে তাঁরা বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন। তার জন্য প্রয়োজন আইনসভার সম্প্রসারণ ও যথাযথ সংস্কার সাধন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে সরকার ১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টসে বাস্তবায়িত করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ইম্পিরিয়াল (কেন্দ্রীয়) এবং প্রাদেশিক আইন সভায় সদস্যপদ বাড়ানো হয়। ঠিক হয় কেউ কেউ মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলো থেকে এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আইন সভার সদস্যপদ পাবেন। সদস্যদের বাজেট নিয়ে আলোচনার অধিকার দেওয়া হল কিন্তু বাজেটে পরিবর্তন আনায় অধিকার দেওয়া হল না।

১৯০১ সাল পর্যন্ত বছরে গড়পড়তা মাত্র তেরো দিন ইম্পিরিয়াল আইন সভার মিলিত হতেন। আর সরকারি পদাধিকারী নন এমন ভারতীয় সদস্য সংখ্যা সেই অধিবেশনগুলোতে থাকত ২৪ জনের মধ্যে ৫ জন। ১৮৯২ এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট নিয়ে অখুশী ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা। তাই এরপর তাঁরা এবার দাবি জানালেন পছন্দসই বাজেট না হলে তাদের সেই বাজেট সংশোধনের অধিকার চাই। শ্লোগান তুললেন ‘No Taxation without representation’ (প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর দেবেন না ভারতবাসী) বিংশ শতকের শুরুর বছরগুলো থেকেই দাদাভাই নওরোজী, গোখলে এবং তিলকরা কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার ধাঁচে ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তাদের নানা দাবিদাওয়া এবং সেগুলোর পাওয়ার ক্ষোভ যাতে প্রকাশ করে তাদের হতাশ খানিকটা লঘু করতে পারেন তাই ভাইসরয় সহ ব্রিটিশ অফিসার চেয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা একটা মঞ্চ ব্যবহার করে তাদের সব ক্ষোভ উগরে দিল। ব্রিটিশদের ভয় ছিল ক্ষোভ ভাসতে থাকলে সেটা ভবিষ্যতে বিক্ষোভের চেহারা নেবে। সেইমত ব্রিটিশ শাসক জাতীয়তাবাদীদের আইন সভাকে তাদের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে দিলেও অত্যন্ত কৌশলগত ভাবে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা দিলেন না। জাতীয়তাবাদী নেতারা অবশ্য আইন সভাকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সব ক্ষোভ ব্যক্ত করতে লাগলেন। প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা, সরকারি নীতি বিশেষ করে জাতীয় অর্থব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিলেন আইন সভাকে কেন্দ্র করে। ফলে শেষ পর্যন্ত অবস্থার ফেরে কাউন্সিলই হয়ে দাঁড়াল জাতীয়তাবাদের প্রচার কেন্দ্র। আর কাউন্সিলের দেওয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভাষণ বক্তৃতা, রাজনৈতিক বক্তব্য সব সংবাদ মাধ্যম জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে শুরু করল। জনসাধারণও সংবাদপত্র পত্রিকার থেকে রাজনীতিতে বিষয় পড়ে, জেনে, আইন সভার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কৌতূলী হয়ে উঠলেন যা পরবর্তীকে তাদের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলবার প্রথম

সোপান হিসাবে কাজ করেছিল। আইন সভার মধ্যে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা রাজনৈতিক লড়াই করেছিলেন তাদের মধ্যে বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কালীচরণ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং রাসবিহারী ঘোষ, মাদ্রাজ থেকে পি.আনন্দ চারলু, সি. শঙ্কর নায়ার এবং ভিজায়ারাঘবচাইয়ার, যুক্তপ্রদেশ থেকে মদন মোহন মালব্য, অযোধ্যানাথ এবং বিশ্বম্ভর নাথ এবং বোম্বাই থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক, ফিরোজশাহ মেটা, চিমনলাল সেতলবাড়, এন. জি. চন্দ্রভারকর ও গোপাল কৃষ্ণ গোখলে।

৩.১২ উপসংহার

i. ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের সূচনা ও বিকাশ ঘটে।

ii. ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি/চরিত্র এবং জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ ও বিকাশ—এই সব বিষযগুলো নিয়ে বিতর্কের ফলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ঐতিহাসিকরা যেমন—জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী বা স্কুল, মার্কসবাদী গোষ্ঠী বা স্কুল কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী বা স্কুল এবং সর্বশেষ সাবঅলটার্ন গোষ্ঠী বা স্কুল এ বিষয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করে মতামত প্রকাশ করেছেন।

iii. কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক মনে করেন যে উপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা পরিণতি লাভ করেছিল জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উত্থানের মধ্যে দিয়ে।

iv. পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিকাশের ও প্রসারের ফলস্বরূপ জন্ম হয়েছিল নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এই সম্প্রদায়ের মানুষরাই ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

v. ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ভারতে জাতীয়তাবাদের উত্থানের কারণ আবিষ্কার করেছেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে চলাকালীন, তাদের মতে, ভারতীয়রা বিভিন্ন সমিতি গঠন করতে শুরু করে যার ফলে সামাজিক জনজীবনে একটা পরিবর্তন আসে। এবং যে কারণে দেখা যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও বিভিন্ন সমিতি এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠা হতে শুরু হয়েছে।

vi. আঠার'শ পঞ্চাশের দশক থেকে রাজনৈতিক সমিতিগুলো আবির্ভূত হতে থাকে। প্রথম যুগে এইসব সমিতিগুলোতে স্থানীয় রাজ্যের শাসকদের বড় জমিদার ও বণিকদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আঠারো শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমিতির আবির্ভাব দেখা যায়। এইসব সমিতিগুলোতে কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়ের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উত্থানের প্রথম যুগ থেকেই বড় জমিদাররা বণিকদের হাত থেকে নেতৃত্ব বলে যায় নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের হাতে।

vii. ইম্পিরিয়াল (কেন্দ্রীয়) এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলোকে (Legislative Councils) ধীরে ধীরে গোড়ার দিকের মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে এই সময়ে সংবাদপত্র, পত্রিকাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.১৩ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. উনিশ শতকের শেষভাগে তিনটি প্রেসিডেন্সীতে অর্থাৎ বোম্বে ও মাদ্রাজের "রাজনৈতিক অঙ্কের" যার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব ঘটেছিল তার বিশ্লেষণ আপনি কীভাবে করবেন?

২. আঠার'শ যাট ও সত্তরের দশকে বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠার কারণগুলির ব্যাখ্যা আপনি কীভাবে করবেন?

৩. আপনি কি মনে করেন ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সুরক্ষিত করবার একটি ব্রিটিশ সতর্কতামূলক পরিকল্পনা? এই প্রসঙ্গে সেফটি ভালভ তত্ত্ব এবং সেটির সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা কী যুক্তির ভিত্তিতে ভারতে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ব্যাখ্যা করেছেন?

৫. কীভাবে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা ও সমাজতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন?

৬. আপনি কি মনে করেন কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আর একটি সম্প্রসারিত সংস্করণ মাত্র?

৭. কিভাবে সাবঅল্টার্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাগুলোকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন?

৮. ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ও বিকাশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

৯. কীভাবে আধুনিক সাংবাদিকতা ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের পটভূমিকা তৈরি করেছিল?

১০. উনিশ শতকের সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সে যুগের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের কতটা যোগ ছিল?

১১. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে করা অর্থনৈতিক সমালোচনা কীভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী

চেতনা গড়ে তুলেছিল তার ব্যাখ্যা লিখুন।

১২. বাংলা প্রেসিডেন্সীতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ভারত সভা বা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা উপর টীকা লিখুন।

১৩. আপনি কীভাবে উনিশ শতকের ভারতে নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান এবং এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতীয়তাদী চেতনার উন্মেষের যোগকে ব্যাখ্যা করবেন?

৩.১৪ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, Madras : MacMillan, 1983.

Bipan Chandra et.al. India's Struggle for Independence, 1857-1947, New Delhi : Penguin, 1989.

Shekher Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition and After : A History of Modern India,* Hyderabad : Orient Black Swan, 2014.

Ishita Banerjee-Dube, *A History of Modern India,* New Delhi : Cambridge Univesity Press, 2014.

Bipan Chandra, Amales Tripathi. Barun De, *Freedom Struggle,* New Delhi : National Book Trust, 1987.

Bipan Chandra, *History of Modern India*, Hyderabad : Orient Black Sway, 2001.

Anil Seal. *The Emergence of Indian Natioanlism : Competition and Collaboration in Later Nineteenth Century*, Cambridge : The University Press, 1968.

John R. McLane, *Indian Nationalism and the Early Congress*. Princeton. Princeton University Press, 1977.

S. R. Mehrotra, *The Emergence of the Indian National Congress*, New Delhi : Rupa and Co. 2007.

Sudhir Chandra, *Dependence and Disillusimment. Emergence of National Conciousness in Late Nineteenth Century India.* New Delhi, Oxford University Press, 2011.

John Gallagher. Gordon Johnson and Anil Seal, *Locality, Provience and Nation : Essays on Indian Politics. 1870-1940*. Cambridge, the University Press, 1973.

Christopher Baker, Gordon Johnson, Anil Seal, *Power, Profit and Politics. Essays on Imperialism, Nationalism and Change in Twentieth Century India*, Cambridge, the University Press, 2009.

একক ৪ ❒ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায় : প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ ভূমিকা

৪.২ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতার সূচনা

৪.৩ রাজনৈতিক সমিতির যুগ

৪.৪ কংগ্রেসের রাজনীতি

৪.৫ কংগ্রেসে চরমপন্থা

৪.৬ বিপ্লবীদের উত্থান

৪.৭ গান্ধীর উত্থান

৪.৮ উপসংহার

৪.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৪.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে শিক্ষার্থীরা উপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী সংগঠিত আন্দোনের ইতিহাস সম্পর্কে জানাবেন। এই এককে যে সব বিষয় অলোচিত হবে সেগুলো হল :

- উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতার সূচনা
- রাজনৈতিক সমিতিগুলির কার্যকলাপ
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা ও কংগ্রেসের রাজনীতি
- কংগ্রেসে চরমপন্থার উত্থান
- বিপ্লবের রাজনীতি, বিপ্লবীদের কার্যকলাপ
- ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থান
- উপনিবেশিক বিরোধিতা : প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি
- উপনিবেশিক বিরোধিতা : বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গি

● উপনিবেশিক বিরোধিতা : নিম্নবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি

৪.১ ভূমিকা

ভারতে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশিক শাসন শুরু হয় ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তবুও দেখতে গেলে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পর থেকেই ইংরেজ কোম্পানি হয়ে উঠে বাংলার সত্যিকারের শাসনকর্তা। বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার রাজনীতিতে কোম্পানির শাসন আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভারতে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তেমন কোনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানিক প্রতিবাদ দেখা যায়নি। বরঞ্চ উচ্চবর্গের ও বর্ণের মানুষ, বিশেষ করে হিন্দুরা ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পিছিয়ে পড়া ভারতীয়দের সামাজিক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার সাধন দ্বারা উন্নত ও আধুনিক করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছিল সমাজের নিচু তলার থেকে। উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের কাছে সে সময় উপনিবেশিক শাসন ছিল আশীর্বাদ-স্বরূপ। তাই মহাবিদ্রোহে তাদের যোগদান ছিল সীমিত।

মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা, বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে মোটামুটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে।

৪.২ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতার সূচনা

সর্বপ্রথম বাংলার সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের উপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয় ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। যদিও মূলত নীল চাষ বিষয়টিতে সম্পৃক্ত ছিল বেশিরভাগ বাংলার কৃষিজীবী মানুষেরা বা কৃষক সম্প্রদায় তবুও এই বিদ্রোহের সমর্থনে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলার তৎকালীন গণমাধ্যম, বিশেষ করে 'হিন্দু পেট্রিয়টের মতন পত্রিকা' ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতন সম্পাদক, নীল চাষীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক; ড্রামাটিক পারফরমেন্সের আইন প্রণয়ণ করেন এর পরবর্তীতে লর্ড লিটনের সময়ে ১৮৭৮ তে গৃহীত হয় ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট। এই দুই আইনেরই উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করা। নাটক, গান ইত্যাদির দ্বারা উপনিবেশ বিরোধী মতাদর্শ উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী মতাদর্শকে জাগিয়ে তুলেছিল—ঔপনিবেশিক সরকার এই বিরুদ্ধ মতবাদ বা মনোভাব সহ্য করতে রাজি ছিল না।

৪.৩ রাজনৈতিক সমিতির যুগ

উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে। তবে কংগ্রেস কিন্তু ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। প্রচুর সংখ্যক রাজনৈতিক সমিতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অগেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেমন—ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বেঙ্গল ব্রিটিশ

ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন এই সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু সহ বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। এই সমিতি যে উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেছিল সেগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উপর জনমত গঠন ও একটি সর্বজনীন ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ঐক্য গঠন। ১৮৮৩-৮৪ সালে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে রেন্ট বিলটিকে কৃষকদের স্বার্থে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের একত্রিত করে একটি গণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অস্ত্র আইন এবং ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরোধিতা করে। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রচেষ্টা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটানো। তাই ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর উপর আলোচনার জন্য একটি শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত রাজনৈতিক সংগঠনকে বাস্তবে রূপায়িত করবার। এইভাবেই ইন্ডিযান এ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা তার কার্যাবলী দিয়েই কংগ্রেস ও কংগ্রেস রাজনীতির উত্থানের পটভূমি অনেকাংশেই তৈরি করে দিয়েছিল।

ভারতীয়দের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ দানা বাঁধছে সেটা বুঝেই ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। ভারতবিদ্বেষী লর্ড লিটন এমন সব নীতি এবং আইন প্রণয়ন করতে শুরু করেন যা ভারত বা ভারতবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী এবং বৈরিভাবাপন্ন। ভারতসভা এই সমস্ত নীতি এবং আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আর এর ফলে সারা দেশে তৈরি হয়েছিল, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। ১৮৮০ সালে লর্ড লিটনের পরিবর্তে লর্ড রিপন ভারতের ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রিপনের ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ছিল। তাই দেশের বুদ্ধিজীবীরা তাকে স্বাগত জানান। ১৮৮০-র দশকের প্রথম দিকের বছরগুলোতে যে বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে গঠনের বিষয়টি। ইলবার্ট বিল বিতর্ক এই সংগঠন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয়তাকে আরও বেশি করে প্রকট করে তুলে ধরে। আর বিতর্কের প্রভাব এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তা থেকে এমন একটি পরিস্থিতি গড়ে ওঠে যার পরিণতি হিসাবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্রিকাগুলো একযোগে জাতীয় ঐক্যে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরতে থাকে।

ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভারতসভা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিখ্যাত ব্যক্তি এবং সংগঠনদের একটি সম্মেলনে একজোট হয়ে সর্বভারতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আমন্ত্রণ জানায়। ১৮৮৩-তে এইরকম একটি সম্মেলন সংগঠিত হয়। বলাইবাহুল্য যে, এই সম্মেলনের যে সব মানুষরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা কেউ সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি নন, তাঁরা ছিলেন সমাজের উপরের স্তরের বাসিন্দা তবুও একথা অনস্বীকার্য যে দেশের শিক্ষিত বর্গের মানুষ এবং জাতীয় নেতাদের একত্র হয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে সুযোগ দিয়েছিল সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে পারস্পরিক মতবিনিময়ের। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে অবশ্যই ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যথার্থ পূর্বসূরি।

৪.৪ কংগ্রেসের রাজনীতি

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যদিও খুব সীমিত তবুও আরো বেশি প্রতিরোধ সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত রূপ ধারণ করে। কংগ্রেসের আন্দোলন হয়ে ওঠে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের আরএকটি নাম। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত যদিও কংগ্রেসের নেতৃত্বে সে ভাবে কোনও ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। তবে একথা ঠিক যে আঞ্চলিক বহু নেতাকে সে সময় একটি সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার কাজে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর সেখানে বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। এমনকি কংগ্রেস চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভবের পরও কংগ্রেসে বাংলার আধিপত্য বজায় ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের পর কংগ্রেসে বাংলার নেতাদের প্রভাব ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে এবং সে জায়গায় পশ্চিম ভারতের নেতারা বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে শুরু করেন। তাই প্রথম প্রথম বাংলার জনগণের একটা বড় অংশ গান্ধীকে নেতা হিসাবে সহজে মানতে নারাজ ছিলেন।

এমনকি ১৯৪০-এর দশকেও বাংলার জাতীয়তাবাদীদের কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে এই গান্ধী বিরোধী মনোভাব ছিল সুস্পষ্ট। তবে ১৯৪০-এর পরবর্তী সময়ে গান্ধীর অনুগামীরা বাংলার রাজনীতিতে নিজের অস্তিত্ব দলবদ্ধভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। প্রসঙ্গত এই সময় থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে বাংলার প্রভাব ও হ্রাস পেতে শুরু করে। চার্লস ই. ট্রেভেলিয়নের মতে উনিশ শতকে শেষ পঁচিশ বছরে বাংলার রাজনীতিতে দুটি মডেল বা ধারা দেখা যায়। প্রথম রাজনীতিক ধারাটি একান্ত নিজস্ব স্বদেশি। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করে ভারত থেকে বিদেশি শাসন উৎখাত করার রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়, রাজনৈতিক মডেলটি পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক প্রভাবে তৈরি হয়েছিল। এই দ্বিতীয়টির প্রভাব কেবল সেইসব লোকেদেরই উপর পড়েছিল যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা শহরাঞ্চলে। এদের লক্ষ্য সাংবিধানিক উপায়ে ভারতের অবস্থার উন্নতি ঘটানো এং স্বায়ত্ব শাসন লাভ। কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল এই দ্বিতীয় আদর্শের ধারাটি। এই রাজনৈতিক আদর্শের ধারায় বিশ্বাসী মানুষদের আস্থা ছিল অহিংস রাজনৈতিক পদ্ধতিতে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে তাদের পদ্ধতি অহিংস হলেও তা ছিল একেবারে আলাদা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে চরমপন্থী রাজনীতির বিকাশ বাংলায় ঘটে। বাংলার জনগণ এই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অতিদ্রুত এই রাজনীতি বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়াও বাংলায় একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শেরও উদ্ভব হয় এই সময়ে। এটি বিপ্লববাদের রাজনীতি। বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ শাসন নির্মূল করবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের রাস্তাই একমাত্র পথ। বাংলার মানুষ কেন "নিষ্ক্রিয় রাজনীতি" বা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস রাজনীতির আদর্শ গ্রহণ করেননি তার ব্যাখ্যায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী বলেছেন যে বাংলায় শক্তি পূজা জনপ্রিয়। শক্তির উপাসনা বাঙালি সংস্কৃতির এতটাই গভীরে যে তার লক্ষ্যে "নিষ্ক্রিয় রাজনীতি" বা গান্ধীবাদী অহিংসার রাজনীতি গ্রহণ

করা সম্ভব ছিল না। বাঙালির এই মানসিকতাই বিপ্লববাদের উত্থানের প্রেক্ষিত সহজেই তৈরি করতে পেরেছিল।

৪.৫ কংগ্রেসের চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব

উনিশ শতকের শেষের দিক নাগাদ একদল তরুণ কংগ্রেসী কংগ্রেসের মধ্যপন্থী রাজনীতির উপর থেকে আস্থা হারাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে তাঁরা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে। এই তরুণ দলের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লাজপত রাই এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের মধ্যে এই গোষ্ঠী চরমপন্থী বলে পরিচিত। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে এই চরমপন্থায় বিশ্বাসী গোষ্ঠীর একজন শক্তিশালী সমর্থক। চরমপন্থায় বিশ্বাসী রাজনীতিবিদরা মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী রাজনীতিকে মনে করতেন "ভিক্ষায় রাজনীতি।" তাঁরা বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ ভারতবর্ষে কোনোদিনই সত্যিকারে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। চরমপন্থীরা অনেক বিপ্লবীদলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। যেমন অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন একজন বিপ্লবী এবং তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের চরমপন্থী অনেক নেতাদেরই যোগাযোগ ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের সময় চরমপন্থীরা বাংলার রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে চরমপন্থী নেতৃত্ব মধ্যপন্থীদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার একটা সফল প্রচেষ্টা করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী কংগ্রেসী নেতারা এমন সব আইন-কানুন দিয়ে এমন একটি কংগ্রেসের নতুন সংবিধান তৈরি করেন যার ফলে চরমপন্থীরা কংগ্রেসের রাজনীতিকে কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

৪.৬ বাংলার রাজনীতিতে বিপ্লবীদের উত্থান

১৯০২ সালে স্থাপিত হয় অনুশীলন সমিতি। এই সময় থেকেই বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন একটি সুসংগঠিত আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। এর কিছু সময় পরে যুগান্তর নামে আরও একটি বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাংলার বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল গীতার বাণী দ্বারা; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ও বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছিল এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। দেখা গেছে যে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যা এসেছিল শিক্ষিত হিন্দু পরিবারগুলি থেকে। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতবর্ষ। আর এই প্রশ্নেই ছিল তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের তফাৎ। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভারতে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা। অন্তত ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলাকালীন বাংলায় বিপ্লবী কার্যাবলী অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের রাজনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। গান্ধীর অহিংস গণআন্দোলন শুরু হওয়র পরও বিপ্লবী আন্দোলন এবং গান্ধীবাদীগণ আন্দোলন দুটোই ভারতের রাজনীতিতে সমান্তরালে ঘটে চলেছিল। বিশেষ করে ১৯৩০ এর দশকে বাংলার বিপ্লবীবাদীরা একটু বেশি পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সময়েই ঘটেছিল চট্টগ্রাম লুণ্ঠন, বুড়িবালামের যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা। বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বা নৈরাজ্যবাদী বলে অবহিত করা অনুচিত। তারা বিশ্বাস

করত হিংসার জবাব সশস্ত্র বিপ্লব। হিংস্র অত্যাচারী দমনকারী উপনিবেশিক শাসন নির্মূল করবার একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব। মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করা এবং জাতীয় সরকার গঠন ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় দু-দশক ধরে বিপ্লবীরা রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে কংগ্রেস নেতৃত্ব-র মত বিপ্লবীরা কখনও তাদের স্বপক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা করেননি। শ্রমজীবী বা কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ও কোনো উদ্যোগ বিপ্লবীরা নেননি। বিপ্লবী আন্দোলনের এটাই দুর্বলতা যে বিপ্লবীরা সাধারণ জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাদের আন্দোলনের শরিক করে তুলতে পারেননি।

৪.৭ গান্ধীর উত্থান

জাতীয় রাজ্যনীতিতে গান্ধীর উত্থান ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার ইতিহাসও কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বাঙালি রাজনীতিবিদদের আদর্শের সঙ্গে গান্ধীর রাজনৈতিক অবস্থান বা মতাদর্শের দীর্ঘদিন ধরে একটা সংঘাত চলেছিল। গান্ধীর আমলে (অর্থাৎ গান্ধী যে সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন) বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি এক নতুন মোড় নিয়েছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন সূচনার প্রাক্-কালে গান্ধীকে বাংলার নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল। বাংলার নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে আশঙ্কা ও আপত্তি ছিল গান্ধীর বক্তব্যে যা উনি ১৯২০ সালের গোড়ায় মুসলমানদের একটি সভা রাখেন। উনি বলেছিলেন "আপনাদের আমার শর্ত মানতে হবে, আমার একনায়কতন্ত্র মানতে হবে এবং এই একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত সামরিক শাসনবিধিও স্বীকার করে নিতে হবে।"

বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা জাতীয়তাবাদের যে সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাদের মনে হয়েছিল গান্ধীর বক্তব্য তাদের সেই পরিচিতি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। বাংলার নেতৃবর্গ একেবারেই অস্বীকৃত ছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গান্ধীর ব্যক্তিগত একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নেওয়ার ব্যাপরে। বিপিনচন্দ্র পাল স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন "গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য চিন্তার স্বাধীনতাকে হত্যা করবে এবং অযৌক্তিক শ্রদ্ধার গুরুভার তাদের ব্যক্তিগত চেতনাকে অসাড় করে তুলবে।

বাঙালী সমস্ত তত্ত্বের সঙ্গে গান্ধীবাদী মতাদর্শ-র ব্যবধান বিস্তর তাই তা গ্রহণে অপারক ছিল বাঙালি। গান্ধী এসেছিলেন গুজরাটি বেনে বা ব্যবসায়ী পরিবার থেকে। বৈষ্ণব ধর্ম ও জৈন ধর্মের প্রভাব তাঁর চরিত্রে এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে রাজনীতিতেও তিনি অহিংস নীতি আরোপ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মবাসনা ত্যাগের তত্ত্বে যাতে বাঙ্গালি নেতাদের বিশ্বাস ছিল না। ফলে তাঁরা গান্ধীর মতাদর্শকে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ বাঙালি নেতাদের মানসিকতায় গভীর ছাপ ফেলেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা। সেখান থেকে তারা শিখেছিলেন আত্মবিশ্বাসী বলীয়ান হতে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিজের অধিকারের দাবি উপস্থাপিত করতে।

বাংলার নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগদান করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তার কারণ এই ধরনের অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালি নেতাদের যোগদানের অভিজ্ঞতা আগেই হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী

আন্দোলনের সময়ে। গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরুর ঠিক আগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লেখেন "আমরা যখন অসহযোগী ছিলাম তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এ বিষয় ছিল চিন্তার বাইরে"। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল ছিল মারাত্মক। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল বাংলা এবং বাংলার মানুষ। প্রতিশোধ স্পৃহার প্রতিফল ঘটেছিল ব্রিটিশদমন নীতিতে। বাঙালি রাজনীতিবিদদের একটি অংশের ভাবনা ছিল যে অসহযোগ আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নিলে তা হিংসাত্মক হয়ে উঠবে আর হিংসাত্মক আন্দোলনে দমন ব্রিটিশ সরকার হিংসা দিয়েই করবে। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, এবং মতিলাল ঘোষ আদর্শগত কারণে। চিত্তরঞ্জন দাশ অবশ্য গান্ধীর সঙ্গে সমঝোতা করে একটি মীমাংসায় আসেন। চিত্তরঞ্জন দাশ শর্ত রাখেন যে পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার ও খিলাফৎ প্রসঙ্গের সঙ্গে স্বরাজ বা স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানকে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতে হবে। এছাড়াও দলের আর একটি শর্ত ছিল শ্রমিক এবং কৃষকদের কংগ্রেসের গঠনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। কাউন্সিল বয়কট করার যে পরিকল্পনা গান্ধীর ছিল সি.আর. দাশ তারও বিরুদ্ধাচরণ করেন। গান্ধী চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে সাময়িকভাবে কাউন্সিল বয়কটা করবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। তাঁর দেওয়া শর্ত পূরণ হলেই সি.আর. দাশ রাজি হন অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করতে। এদিকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক বছরের মধ্যেই গান্ধী জয় করে নেন বালার যুবকদের মন। ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় তাতে সর্বস্তরের মানুষকে সমন্বিত করার একটা প্রচেষ্টা কংগ্রেসের তরফে লক্ষ্য করা যায়।

বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে অনুশীলন সমিতি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করবার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সমিতির কয়েকজন সদস্য সি.আর. দাশের সঙ্গে যোগ দেন। তারা গান্ধীকে এক বছর সময় দেন অহিংস আন্দোলন করার জন্য। এই সময় পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলা তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল একটি প্রস্তাব রাখেন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই প্রস্তাবটি ছিল একটি সংশোধনের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটি কিন্তু কংগ্রেস সাবজেক্ট কমিটি নাকচ করে দেয়। অন্যদিকে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন গান্ধীর স্বপক্ষে যায় এবং সি. আর. দাশের আর কোনোও উপায় থাকে না প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া। সি. আর. দাশের স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ স্তিমিত শুরু করে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পুরোপুরি চলে যায় স্বরাজ পার্টির হাতে, বিশেষ করে বাংলায়। সি. আর. দাশের যোগ্য নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাসী মুসলমানরাও জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধ সমস্ত ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত জরুরী, যা চিত্তরঞ্জন দাশ উপলব্ধি করেছিল।

মুসলমানদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন দাশ। হয়ত এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটা শক্তিশালী ভিতের ওপর গড়ে উঠতে পারত, বিকশিত করতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানান। তাই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। এর পরিণতি দেখা যায়, যখন

এক সময় আর কোনও উপায় থাকে না। কংগ্রেসে বাধ্য হয় মুসলমানদের আলাদা নির্বাচক মণ্ডলীর দাবি মঞ্জুর করা ছাড়া।

৪.৮ উপসংহার

এই একক পাঠ করে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে উপনিবেশকতাবাদ প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে এবং বিরূপ প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হতে শুরু করে। বাংলার উনিশ ও বিশ শতকে যে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির উদ্ভব ঘটে তা উপনিবেশকতাবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি উপনিবেশকতাবাদের মতাদর্শ ও রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। উপনিবেশকতা কে প্রতিহত করবার যে সংগ্রাম শুরু হয় ভারতে সেই প্রতিবাদের আন্দোলনের ধারা কিন্তু একমাত্রিক ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবাদের যা প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে অনেকবার। সভা সমিতি রাজনীতির বা আবেদন নিবেদনের রাজনীতির জায়গা নিয়েছে সরাসরি সংঘাতের রাজনীতি। রাজনীতিতে চরমপন্থার উত্থান; এই এককের পাঠ্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আবার ভারতের রাজনীতির মঞ্চে গান্ধীর প্রবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন এক প্রতিবাদের ধরণ সংযুক্ত হয়েছিল। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বহুমাত্রিক ও বহুমুখী ঐতিহাসিক গতিপথের।

৪.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. উপনিবেশিক বাংলার সমিতির প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কংগ্রেস রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর পর্যালোচনা করুন।

৩. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিপ্লবীদের ভূমিকার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৪. ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের মূল্যায়ন করুন।

৪.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bipan Chandra and others : *India's Struggle for Indepdendence, 1857-1947*. New Delhi.

Sumit Sarkar : *Modern India, 1885-1947*, New Delhi.

Shekhar Bandyopadhyay : *From Plassey to Partition and After*. New Delhi.

Sugata Bose and Ayesha Jalal : *Modern South Asia*, New Delhi.

অমলেশ ত্রিপাঠী : *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭*

একক ৫ ❒ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায় : বিপ্লববাদ

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ ভূমিকা
৫.২ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদী সংগ্রাম : প্রেক্ষিত
৫.৩ বিপ্লবী সংগঠন : প্রথম পর্যায়
৫.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিপ্লবী আন্দোলন
৫.৫ বিপ্লবীরা : ভারতে ও ভারতের বাইরে
৫.৬ আন্তঃযুদ্ধ সময়কালে বিপ্লবী আন্দোলন
৫.৭ বাংলা ও বিপ্লবী আন্দোলন : ১৯২০ এর দশক ও তারপর
৫.৮ কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা
৫.৯ উপসংহার
৫.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা জানবেন নিম্নলিখিত এই বিষয়গুলো সম্পর্কে :

- কংগ্রেস রাজনীতি ও নেতৃত্বের বাইরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে/সংগ্রামে বিবিধ ভারতীয় কণ্ঠস্বরগুলি
- রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে উপনিবেশিক সরকার কেমন করে কী পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলো দমনের প্রয়াস করেছিল
- ভারতীয় বিপ্লবীরা কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই-এ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল
- কীভাবে ভারতীয় ও বিদেশি সাহিত্য ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছিল এবং কীভাবে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৫.১ ভূমিকা

১৮৫৭'র পরবর্তী সময়ে উপনিবেশিক সরকার ভারত শাসনক্ষেত্রে রক্ষণশীল পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। লর্ড বেন্টিংক এর বেনথামীয় উদারপন্থার যুগ বহু অগেই গত হয়েছিল। ১৮৫৭'র পরে ভারতীয়দের প্রতি বৈরিতাভাবাপন্ন লর্ড লিটনের শাসনকালে (১৮৭৬-১৮৮০) এমন সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যাতে ভারতীয়দের বেশ কিছু মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে বুদ্ধিজীবীর যারা সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সেই সুবাদে রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সচেতনও ছিলেন, তাঁদেরই উদ্যোগ কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রধানত এই তিনটি শহরে রাজনৈতিক সভা বা সমিতি গঠিত হতে শুরু হয়েছিল। এই ধরনের রাজনৈতিক সভা/সমিতির উদ্ভব, উনিশ শতকের শেষাশেষি নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের 'রাজনৈতিক অঙ্ক'টাকে একেবারেই পাল্টে গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত এইসব রাজনৈতিক সভা/সমিতিগুলো ক্রমে ক্রমে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ও সমন্বয় স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে খুব আবছাভাবে হলেও একটা সর্বভারতীয় ধারণা এসময় তৈরি হতে শুরু হয়েছিল। অবশেষে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল ১৮৮৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সভা'র মতো একটি জাতীয় সভা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এবার শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫-এ বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

গোড়ার দিকে এইসব সভা/সমিতিগুলোর চাহিদা ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি। এরা উপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের আবেদন জানাত। তবে অচিরেই বোঝা গেল যে ভিক্ষাবৃত্তি বা আবেদন নিবেদন পদ্ধতিতে সমিতিগুলো তাদের অভীষ্ট লাভ করতে পারবে না। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পরও কংগ্রেসের সদস্যরা প্রথম প্রথম এই আবেদন নিবেদন নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। কিন্তু ক্রমে কংগ্রেস সদস্যদের একাংশ বুঝতে পারলেন যে অধিকার লাভের জন্য আবেদন নিবেদন নীতি যথেষ্ট নয়। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিকল্পপথের সন্ধানে ব্যস্ত হলেন, এর ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব অঞ্চলে জন্ম নিল চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের। আর এর পরে চরমপন্থী রাজনীতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে উদ্ভব ঘটল বিপ্লবী আন্দোলনের। বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের, সংগঠন, মূলত শরীরচর্চার আখড়া, পাঠচক্র এই ধরনের সংগঠনকে কেন্দ্র করে। যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি, বাংলার এই দুই দলের বিপ্লববাদী রাজনীতিতে অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্যদের লড়াই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

অমলেশ ত্রিপাঠী এবং সুমিত সরকারের মতো ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী গণবিক্ষোভ, কংগ্রেসের ভিতরে ভাঙ্গনের ফলে মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী এই দুই গোষ্ঠীর উত্থান এবং বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। এর সময়কাল বিশশতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে বা বলা ভালো বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায়।

এছাড়াও কংগ্রেসের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী সদস্যদের বিতর্ক, আলোচনা, মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রস্তাব এবং তা নিয়ে কংগ্রেস মধ্যপন্থীদের সঙ্গে উপনিবেশিক সরকারের আলাপ-আলোচনা— এই সবই ছিল বিপ্লববাদ ও বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশের প্রেক্ষিত।

৫.২ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদী সংগ্রাম : প্রেক্ষিত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উপনিবেশিক রাষ্ট্রকে বিপ্লববাদীদের চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামো এবং ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধের চরিত্রের সঙ্গে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রথম যুগের ইতিহাস এদিক দিয়ে জড়িত ছিল। অপর দিকে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতির মধ্যে কংগ্রেসের বৃত্তের মধ্যেই সে জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বিপ্লববাদের উত্থানের গোড়ার দিকের ইতিহাস।

উনিশ শতকের শেষে এবং শতকের শুরুতে চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যেই প্রোথিত ছিল বিপ্লববাদের শিকড়। আবার ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থা ঋণী ছিল উচ্চবর্গীয় রাজনীতিবিদদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাছে। কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। উদয় হয়েছিল অভিজাত মধ্যপন্থী, যথাক্রমে তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে। উদারতাবাদের ব্যর্থতার ফলে ভারতের উদ্ভব ঘটেছিল চরমপন্থী রাজনীতির। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের অবদান ছিল বিপ্লবী চরমপন্থী রাজনীতির মতাদর্শ গড়ে তোলবার পিছনে। তাঁদের লেখা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে গড়ে উঠেছে বিপ্লববাদের মতবাদ। এছাড়াও প্রথমযুগের বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুগের ইতিহাস, ফরাসি বিপ্লব, ইটালির ঐক্য আন্দোলনের গুপ্ত সমিতিগুলির ভূমিকা, বিশেষ করে ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে কারবোনারী, আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার নিহিলিস্ট, এ্যানারকিস্ট ও পপুলিস্ট অন্দোলন।

ভাইসরয় লর্ড কার্জনের অধীনে উপনিবেশিক শাসন কাঠামোর চরিত্র হয়ে উঠেছিল স্বৈরতান্ত্রিক। স্বৈরতন্ত্র প্রকাশ পেয়ে ছিল বিশেষ করে সরকার দ্বারা গৃহীত কয়েকটি নীতি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে :

(ক) ১৮৯৯ সালের কলকাতা মিউনিসিপাল এমেণ্ডমেন্ট বা সংশোধন আইন যার ফলে প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

(খ) ১৯০৪ সালের ইউনিভার্সিটিস আইন যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল।

(গ) ১৯১৪ সালের দ্য ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল সিক্রেটস এমেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বহুলাংশে হ্রাস করে দিয়েছিল।

কার্জন মনে করতেন পাশচাত্য ধারণায় যে সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ তাই সঠিক। তিনি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তার এই চরমপন্থী ভাষণে ব্যক্ত করেন। কার্জনের এই বক্তব্য ভারতীয়দের বিশেষ করে শিক্ষিত ভারতীয়দের অনুভূতিকে আঘাত হানে। এই সময়ে বিভিন্ন মতাদর্শ ও তাদের পারস্পরিক টানাপোড়েনের মধ্য থেকে স্বদেশীভাব উত্থান ঘটে। যদিও রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক বক্তৃতায়ে তিনি যে স্বদেশি সমাজের উত্থানের আদর্শ তুলে ধরেছিল তার সঙ্গে সরাসরি চরম স্বদেশিবাদের উত্থানে সম্পর্ক না থাকলেও এ কথা ঠিক যে সে সময়ে তার এই বক্তৃতাটি বাংলার মানুষদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তার "গঠনমূলক স্বদেশী" এই ধারণা ওপর আলোচনা চরমপন্থী রাজনীতির আদর্শ নির্মাণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় সমাজকে ব্রিটিশ উপনিবেশকাতবাদের প্রভাব মুক্ত করার যে লক্ষ চরমপন্থী রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল তা রবীন্দ্রনাথের "গঠনমূলক স্বদেশী" ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভঙ্গের দিনে স্বদেশি আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের উৎসাহী হয়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য রাজনীতির দ্বারা উদ্দীপিত হন। অন্যদিকে অবশ্য তার এই উদ্দীপনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তিনি ভারতের সমস্যার সমাধান খুঁজতে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অথবা চিত্তরঞ্জন মতো তিনি চরমপন্থায় আস্থা পোষণকারী কংগ্রেস নেতাদের থেকে দূরে থেকে নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছিলেন।

প্রথম দিকের বিপ্লবী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ আধিকারিক এবং তাদের ভারতীয় সহযোগীদের রাজনৈতিক হত্যার ঘটনার মধ্যে। মহারাষ্ট্রের চাপেকর ভাইরা এসময়ে বোম্বের এক কুখ্যাত প্লেগ কমিশনার ওয়ালটার র‍্যাণ্ড ও তার সহযোগী লেফটেন্যান্ট ভাইসরয়কে হত্যা করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। প্লেগ হত্যাকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে বিংশ শতকের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কিছু কিছু গুপ্ত সমতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে মিলন মেলা ও ভি.ডি সাভারকর স্থাপিত অভিনব ভারত উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ সালের পর থেকে অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকা খোলাখুলি বিপ্লবী ক্রিয়াকার্যের পক্ষে প্রচার চালাতে শুরু করে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নরকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯০৮ সালে কিশোর ক্ষুদিরাম বোস ও প্রফুল্ল চাকি মুজাফ্‌ফরপুরের কুখ্যাত জর্জ ডগলাস কিংসফোর্ডকে যিনি পরবর্তীতে কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আসীন হন, হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুই বিপ্লবীর বোমায় নিহত হন দুই ব্রিটিশ মহিলা। কিংসফোর্ড জুরিগাড়িতে আছেন ভেবে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে ওই দুই ব্রিটিশ মহিলা নিহত হন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে প্রফুল্ল চাকি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন, কারারুদ্ধ হন ও পরে তার ফাঁসি হয়। তাদের শহীদত্ব বরণ জাতীয় চেতনায় গভীরভাবাবেগ সঞ্চার করেছিল। মদনলাল ধিংড়া ১৯০৯ সালে স্যার কার্জন উইলির হত্যাপরাধে লন্ডনে জেলবন্দি হন এবং পরে তারও ফাঁসির হুকুম হয়। স্যার কার্জন দীর্ঘকাল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে চাকরি করে। অবসর নিয়ে কয়েক বছর আগে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পবয়স্ক ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মনোভাব আংশিকভাবে হলেও ধিংড়ার উইলি হত্যা পরিকল্পনা পিছনে ছিল।

প্রথম যুগের বিপ্লবীদের কার্যাবলী ছিল দুভাগে বিভক্ত। কুখ্যাত ব্রিটিশ আধিকারিক, বিশ্বাসঘাতক এবং ব্রিটিশ গুপ্তচরদের হত্যা বিপ্লবী কার্যাবলী বাস্তবায়িত করবার জন্য ডাকাতি ও লুটপাট দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। এই ধরনের ডাকাতি স্বদেশি ডাকাতি নামে জনপ্রিয় হয়েছিল সে সময়ে।

৫.৩ বিপ্লবী সংগঠন : প্রথম পর্যায়

বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের চরমপন্থীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের থেকে আলাদা যদিও তাদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র ছিল। মূলত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর ছিল অঞ্চলভিত্তিক এবং চরমপন্থী কংগ্রেসী রাজনীতির আওতার বাইরে। ভারতবর্ষে চরমপন্থী বিপ্লবাদের ইতিহাসে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের বিভাজন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বারীন ঘোষ বড়দাদা অরবিন্দ ঘোষকে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন যে "শ্রদ্ধেয় দাদা—এখনই উপযুক্ত সময়। আমাদের জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য সারা দেশ জুড়ে মিষ্টান্ন (বোমা) প্রস্তুত রাখতে হবে। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। ইতি স্নেহের ভাই বারীন্দ্র ঘোষ।" আর এরপর পরই ১৯০৮ সালে ঘটে যায় মুজফ্‌ফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। মানিকতলায় পুলিশী তল্লাশী এবং আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বিংশশতকের প্রথম দিকে যে সব বিপ্লবী সংগঠনগুলো আত্মপ্রকাশ করেছিল সেগুলো সবই গুপ্ত সমিতি। এই সময়ে ইস্কুল ও কলেজগুলো চরপমন্থী বিপ্লবদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত শরীর চর্চার আখড়াগুলো। এইসব আখড়ায় সদস্যরা ছিল মূলত ছাত্র বয়সে তরুণ, উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক পরিবারের। আখড়াগুলোই পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত হয়েছিল বিপ্লবী সংগঠনে। আখড়াতে চলতে শরীরচর্চা (প্রধানত কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধের পাঠ) এবং পঠন-পাঠন। সভ্যদের এই সক্রিয় উদ্যোগই বিপ্লবী গঠনের প্রথম সোপান। অনুশীলন সমিতি সর্বপ্রথম বিপ্লবী দল। এই দল প্রতিষ্ঠার তারিখ নিয়ে মতবিরোধ আছে। ডেভিড.এম. লাউসে-র মতে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ এর মধ্যবর্তী কোনও সময়ে জেনারেল এসেম্বেলী কলেজ যার নাম পরে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছিল স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেই কলেজের ছাত্র সতীশচন্দ্র বসু ও ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্রের উদ্যোগে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। যদিও ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ ছিল অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অনুশীলন সমিতি স্থাপনের নেপথ্যে। রজতকান্ত রায় অবশ্য দাবি করেছেন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠিত হয় প্রমথনাথ মিটর, সরলাদেবী ঘোষাল ও কাকুজ্যো কাকুকে নামে জনৈক রহস্যময় ভদ্রলোকের উৎসাহে। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারি অফিসার ও তাদের সহযোগীদের হত্যা করা। এ সময়ে বরোদার যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে অরবিন্দ তার দূত হিসাবে কলকাতায় পাঠান। অরবিন্দের মামা সত্যেন বসুর তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুর অনুশীলন সমিতির শাখা খোলা হয়। কিছুকাল পরে বারীন ঘোষ মেদিনীপুরে গেলে অনুশীলন সমিতি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রমথ মিটরের আগ্রহ ছিল প্রধানত শরীরচর্চায় কিন্তু অরবিন্দের কাছে বিপ্লববাদের প্রচার ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ. সি. ব্যানার্জি, সরলা ঘোষাল, বি.সি. পাল, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখরা পি. মিত্রের শরীর চর্চা দলে যোগদান

করেছিলেন যেটি অরবিন্দের দল থেকে স্বতন্ত্র ছিল। অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রর সংগঠন সমন্বয় দক্ষতার অভাব এবং ক্ষমতালিপ্সা হেতু প্রথম প্রথম অরবিন্দ গোষ্ঠীর খুব বেশি সাংগঠনিক সম্প্রসারণ ঘটেনি। ১৯০৫ এর পরে অবশ্য রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের আর্থিক সহায়তার ফলে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

গোড়ার দিকে বিপ্লবীদের সংগঠন গঠনে এই ব্যর্থতা অরবিন্দের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে ছিল ধর্মকেন্দ্রিক বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে। এ ব্যাপারে অবশ্য বারীন্দ্রেরও যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে ধর্মকেন্দ্রিক চরিত্র কিন্তু আকৃষ্ট করেছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। আর এই কারণেই বিপ্লবী আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হতে পারেনি বলে অনেকে মনে করেন। নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ যোগদান করেননি এই আন্দোলনে। অপরদিকে পুলিনবিহারী দাসের ঢাকা অনুশীলন সমিতি গ্রাম বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করবার একটা প্রচেষ্টা করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমান সম্প্রদায় বিপ্লবী আন্দোলন যোগদানে বিরত ছিল কারণ প্রথমত, আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রভাব, দ্বিতীয়ত, ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণ ঘটলে তাতে সমিতির ভূমিকা। অনেক বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ইস্তাহারে মুসলমান সম্প্রদায়ের যোগদান এই মর্মে স্পষ্ট উল্লেখ থাকত।

সি. আর. দাশের মতো জাতীয়তাবাদী ব্যারিস্টাররা যারা চরমপন্থী দলের সদস্য ছিলেন, তারাও বিপ্লবী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। এছাড়াও বিপ্লবীদের সমর্থন এসেছিল ধনী জমিদার এবং উত্তরবঙ্গের আইনজীবী বা প্লীডারদের থেকে। কিন্তু ১৯০৮ সাল যখন সত্যি সত্যিই রাজনৈতিক হত্যা ঘটতে শুরু করল তখন এই দুই এলিট শ্রেণি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। বিপ্লবী দলে প্রধানত যোগদান করতেন পূর্ববঙ্গের ছোটখাটো ভূস্বামী পরিবারের সদস্যরা। এই সব পরিবারের মূল আয়ের উৎস জমিজমা ছিল। তবে জমি থেকে যেহেতু বিশেষ একটা আয় হত না তাই পরিবারের সদস্যরা রোজগারের জন্য অন্যান্য বৃত্তিতে নিজেদের নিযুক্ত করতেন। জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল স্বল্পবিত্ত-মপঃস্বলের পরিবারের ছাত্ররা হতেন বিপ্লবীদলের সদস্য। ছাত্ররাই ছিলেন বিপ্লবীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিপ্লবীদলের যেসব সদস্যদের আর্থিক অবস্থান নিয়ে উপরে আলোচনা হয়েছে সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলে এই সব সদস্যরা কিন্তু ছিলেন বংশপরম্পরায় বাংলার তিনটি শিক্ষিত জাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলায় যে তিন বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, বিপ্লবী দলের সদস্যরা সেই "শিক্ষিত তিন জাতের" ছিলেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা মাত্র দুই বা তিনটি বড় বিপ্লবী দলের কার্যক্রম বিবেচনা করে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের ব্যাখ্যা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে বিপ্লবী রাজনীতিতে অনেক বেশী সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী ছিল বাংলা, পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্রের স্থানীয় অথবা জেলার ছোট ছোট দলগুলো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে থাকা ঢাকা অনুশীলন সমিতির অজস্র শাখা কেন্দ্রগুলি ছিল অন্য দিকে সুসংবদ্ধ। কলকাতার অনুশীলন সমিতির অধীনে থাকা শাখা কেন্দ্রগুলো উপর কলকাতার সমিতির কর্তৃত্ব ছিল সীমিত।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত ভারতীয় আধিকারিক এবং সাক্ষীদের বিপ্লবীর হত্যা করেন। মামলায় অভিযুক্ত নরেন গোঁসাই যখন পরবর্তীতে সরকারী সাক্ষী হতে রাজী হন তখন আলিপুরের

প্রেসিডেন্সী জেলের ভেতরেই তাকে বিপ্লবীরা খুন করেন। বিপ্লবী আন্দোলন রুখতে ব্রিটিশ সুরক্ষার আইনে সংশোধন করা হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার কঠোর হয়। বিচার ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জেলবন্দি করা, জুরি ছাড়াই বিশেষ বিচার ব্যবস্থা, যাতে মামলার দ্রুত সম্পত্তি হতে পারে ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৯০৮-এ ফৌজদারী আইনের সংশোধনের ফলে গভর্নর জেনারেলের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয় বিপ্লব দমন করবার জন্য। বিপ্লবী দলগুলিকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে শুধু বাংলারই নয় সারা ভারতবর্ষে প্রধান বিপ্লবী দলগুলো গোপন আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তী পর্যায় অনুশীলন সমিতিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূর্ব বাংলার সংগঠন বলে তকমা দেওয়া হয়। আর পশ্চিমবাংলার বিপ্লবীদের চিহ্নিত করা হয় যুগান্তর দলের সভ্য বলে। এর ফলে পশ্চিমে বাংলায় যে সমস্ত স্বাধীন ছোট ছোট বিপ্লবী দল ছিল তাদেরও পরিচয় হয় নতুন যুগান্তর দলের শাখা হিসাবে। অনুশীলন সমিতির মতোই যুগান্তর দল প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। বাংলার সন্ত্রাসবাদের উপর আলোচনায় ঐতিহাসিক গোপাল হালদার মত প্রকাশ করেছেন যে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত একটি দলকে ব্রিটিশ যুগান্তর বলে দাগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লিওনার্ড গর্ডন বলেছেন যে ১৯১৪-১৫ সালের আগে থেকেই যুগান্তর দল একটি সুসংগঠিত দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডেভিড লাউসে এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। তাঁর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী কার্যাবলী যুগান্তর দল তৈরির জন্য দায়ী।

পূর্ব বাংলায় যুগান্তর কিন্তু অনুশীলন সমিতির মত সুসংগঠিত ছিল। তবে এরই মধ্যে এই দুই দল একে অপরের সহযোগী হয়েই বহুক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেছে ঠিকই তবে সময় সময়ে এরা যে যার মতো নিজেরা স্বাধীন ভাবেও কাজ করেছে আবার কিছু ক্ষেত্রে এই দুই দলের মধ্যে রেষারেষিও হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ পর্যায়গুলোতে এই দুই দলের মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবীদের কেউ কেউ আবার এ সময়ে মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা হলেও পরে সে আদেশ পরিবর্তিত হয়ে হয় যাবজ্জীবন কারাবাস। অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে বেড়িয়ে অবশেষে পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন। বিপ্লবী আন্দোলনকারী দলগুলো অন্তরীণ হয়ে যায়। ইদানিং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির এই ধারাকে অনেকেই মধ্যপন্থী রাজনীতির বিকল্প বলে বিবেচনা করেছেন।

মর্লে-মিন্টো সংস্কারের ফলে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড এস. পি. সিনহা ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিল বা সভার প্রথম ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হন। অনেকেই মনে করেন যে বিপ্লবী আন্দোলনের কোপে পড়ে সরকার বাধ্য হয় এম.পি. সিন্হাকে নিযুক্ত করতে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেওয়া হয়। ভারতের ব্রিটিশ রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতা থেকে নতুন দিল্লিতে। এর ফলে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাংলায় রাজনীতিবিদ্দের আধিপত্য কমতে শুরু করে। যদিও বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় তবুও

বিপ্লবী আন্দোলনের কিন্তু এখানে ইতি হয় না।

ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মতোই ভাইসরয়রাও ছিলেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-কালে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ঘটেছিল তা হল ২৩ সে ডিসেম্বর ১৯১২ সালে। বিপ্লবীরা তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের জীবননাশের চেষ্টা করেন। কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় সভাযাত্রায় হাতির পিঠে ভাইসরয় যখন সওয়ার হয়েছিলেন তখন রাসবিহারী বোস ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এই দুই বিপ্লবী তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। হত্যার চেষ্টা বিফল হয়ে বটে তবে বোমার আঘাতে ভাইসরয় গুরুতর আহত হন।

এই সময়ে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের সুসংবদ্ধ একটা সম্পর্কের জাল বোনা হয়েছিল। ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র বাঁধার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু।

৫.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিপ্লবী আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হবার একটি প্রেক্ষিত তৈরি করে দিয়েছিল। যদিও প্রথম দিকে যুগান্তর দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে খানিকটা দুর্বল ছিল। পরবর্তীতে অবশ্য তাদের বৈপ্লবিক কার্যাবলীতে যৌক্তিকতার সংবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ চলাকালীন যুগান্তর দলের সভ্যরা পূর্ববাংলার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ হবার চেষ্টা করে। বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে যে এই পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল না তা নয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এমনকি বিদেশেও সে সব বিপ্লবী দলগুলো ছিল তাদের মধ্যে পারস্পরিক একটা সহযোগিতা গড়ে তোলবারও প্রচেষ্টা চলেছিল। বৈপ্লবিক কার্যাবলীর সম্মিলিত যে পরিকল্পনার তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হল—(ক) ভারতে এবং বার্মাতে ভারতীয় সৈন্যদলকে প্রেরণা জোগান, (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বসবাসকারী পাঞ্জাবী শিখ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে গদর বা বিপ্লবের আদর্শ প্রচার এবং তাদের স্বদেশে ফেরার আর্জি জানানো। (গ) ভারতীয় বিপ্লবীদের বিশেষত বাংলার বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন্য জার্মান অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি। (ঘ) ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলোর সদস্যসংখ্যা বাড়ানো বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য তাদের প্রশিক্ষিত করা সর্বোপরি সমস্ত বিপ্লবী দলগুলোকে একত্রিত করে সুসংবদ্ধ করে তোলা।

বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সাধন হয়নি। তার জন্য আংশিকভাবে দায়ী অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নজরদারি। যুদ্ধরত ব্রিটিশ শক্তি কোনোভাবেই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যের সুরক্ষার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে দিতে নারাজ ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময় ধরে একটানা যে ভারতীয় বিপ্লবীরা তাদের কর্মসূচি কার্যকরী করেছেন তা নয়। এই সময়ে সময়ে বিশেষে তাঁরা সক্রিয় হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লবীদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কীর্তি কলকাতার রোডা কোম্পানীতে ৫০টি মাউসার পিস্তল, ও ৪৬,০০০ বুলেট ডাকাতি। এই সময় উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এই বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আমেরিকা থেকে আসত পাঞ্জাবী বিপ্লবীরা। তাদের সঙ্গে

বিপ্লবী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে গিয়েছিল বাংলার বিপ্লবীরা। ওই অঞ্চলে বিপ্লবীরা কার্যক্রম ছিল মূলত সশস্ত্র ডাকাতি।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে 'কোমাগাটা মারু' নামক একটা জাপানী জাহাজ কলকাতার কাছে বজবজে আটকা পড়ে। সেই জাহাজের যাত্রী পাঞ্জাবী গদরপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের গোলমাল বাঁধে যা দাঙ্গার রূপ নেয় এবং যার পরিণতিতে প্রায় কুড়ি জনের মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় বিপ্লবীরা বিশেষ করে গদরপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। বরকাতুল্লা, তারকনাথ দাস, সোহন সিং ক্যালিফোর্নিয়া ও অন্যান্য শহরের ভারতীয় অধিবাসীদের বৈঠকে-এ এই ঘটনার অনেকবার উল্লেখ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলকালীন যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে অনেক বিপ্লবীরাই জার্মানী বা জাপানের সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। সেসময়ে লাহোরে বসবাসকারী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সারা উত্তর ভারত জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ভারতীয় সেনার তরফে কোনও সহযোগিতা না পেয়ে তিনি জাপানে পালিয়ে যান।

এই সময়ে যতীন মুখার্জীর (বাঘাযতীন নামে খ্যাত) নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরাও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেন। ১৯১৫-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ কলকাতায় দু-দুটো ডাকাতি করে, তারা নগদ ৪০০০ টাকা তোলেন। এই একই বছর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) জাভা যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র জাহাজে, সমুদ্রপথে ভারতে আমদানি করবার ব্যবস্থা করতেন। ইতিমধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে দ্য ইনস্রেস ইনটু ইন্ডিয়া নামে একটা আইন প্রণয়ন করে।

(ক) অভিবাসী পাঞ্জাবীদের বিদেশ থেকে ভারতে পুনঃপ্রবেশের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আগত অধিবাসীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হয়। (খ) যাতে ভারতে ফেরার পর তাদের ক্রিয়াকলাপের উপর সুস্পষ্ট নজরদারি সম্ভবপর হয়। (গ) যুদ্ধের প্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা জারি করে দেশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। প্রায় একই সঙ্গে মার্চ ১৯১৫-তে ভারত সুরক্ষা আইন গৃহীত হয় যার ফলে ভারত সরকার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। যে কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে এবং বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইবুনালে খুব দ্রুত সেইসব সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার করতে। দমনমূলক সরকারি নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে ওঠার কারণে বাংলায় এবং উত্তরভারতেও বিপ্লবী কার্যাবলী ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে। ভারত সুরক্ষা আইনে প্রায় ১৬০০ জনের বিচার শুরু হয়। এদের মধ্যে বহুজনকেই গৃহবন্দি হিসাবে রাখা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ভারত সুরক্ষা আইনের সবকটি ধারাই আরও দুমাস পর্যত বলবৎ রইল। ব্রিটিশসরকারে আশঙ্কা ছিল বিপ্লবীদের সমগ্র সংগ্রামের প্রচেষ্টা রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতে ব্রিটিশসরকার বিপ্লবী দমনে তৎপর হয়ে উঠল। ভারত সুরক্ষা আইন নাকচ হয়ে যাবার পর অন্তত ৮০০ থেকে ১০০০ জন বিপ্লবীকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তায় পড়েছিল। এই প্রেক্ষিতে এস.এস.এ.টি রাউলাটের সভাপতিত্বে ভাইসরয় ১০ই ডিসেম্বর

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি নির্ণয় এবং ভারতের কোথায় কোথায় এ ধরনের ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি চলছে ও ব্যাপারে তদন্ত করার দ্মজন্য রাউলাট কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া কমিটির উপর দায়িত্ব ছিল সরকারকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া কোন ধরনের আইন প্রণয়ন করা উচিত ও কীভাবে তা করা যায়। যদি বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের ফলে রাজনৈতিক সমস্যা বা সঙ্কটদেখা দেয়।

১৫ই এপ্রিল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রাউলাট কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয় সিডিশন কমিটি ১৯১৮ রিপোর্টে; (রাউলাট রিপোটও) বিপ্লবী কার্যকলাপ রুখতে কিছু আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়, যেমন বিচার ছাড়াই গ্রেফতার আর জুরি ছাড়াই বিশেষ ট্রাইবুনালে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেফতার করা যে কোনও লোকের বিচার। রিপোর্টে প্রকাশিত প্রস্তাবগুলোকে আইনের রূপ দেওয়া হয় ২১শে মার্চ ১৯১৯ রিভেল্যুশনারি এ্যন্ড এনারকিক্যাল এ্যাক্টের নাম দিয়ে।

স্বদেশি আন্দোলন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৮৮৭-১৯৫৬-এর মধ্যবর্তী কালে রাজনীতির অভিনয় নেতা হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উত্থান ঘটে। কুড়ি বছর বয়সে মানবেন্দ্রনাথ রায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। সে বছরই তিনি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার ত্রাণ শিবিরে কাজ করেছিলেন। সেই সময় থেকেই সাংবাদিক হিসাবে যুগান্তরে (পত্রিকা) তার লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে। তিনি দুটো ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ছিলেন তাই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১০) বিচারে "ব্রিটিশ ভারতের সম্রাটকে তার শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে।" (সহজ কথায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে) তাঁকে সহ আরও ৪৫ জনকে দণ্ডিত করা হয়। এক বছরের মাথায় তারা সকলেই প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান। মানবেন্দ্রনাথ রায় জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জার্মানী থেকে ভারতে অস্ত্র আমদানি করার চেষ্টা করেন কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে এ ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় অবস্থিত ব্রিটিশ কোম্পানী বার্ড এ্যাণ্ড কোম্পানিতে তহবিল লুঠ করে স্বদেশি ডাকাত দল। সে দলে মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন। তিনি গ্রেফতার হন কিন্তু বেইলে ছাড়া পেয়ে এপ্রিল মাসে রেভারেণ্ড সি. এ. মার্টিনের ছদ্মবেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের দূত হয়ে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যান বাটাভিয়াতে। সে কাজে সফল হননি। তিনি যাকে গুরু বলে মানতেন সেই যতীন মুখার্জীর মৃত্যু সংবাদ তিনি সেখানে পান। ভারতে না ফিরে তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করে পৌঁছে যান সানফ্রান্সিকোতে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে তিনি যোগদান করেছিলেন যা তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

১৯০৮ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত রাজনৈতিক ডাকতির অসংখ্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সাধারণ চোর ডাকাতির নয় এইসব ডাকাতি করত স্বদেশি ডাকাতি দল; বেশীরভাগ সদস্যরাই ছিল বাঙালি ভদ্রলোক। ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, লুঠ করা অর্থ ব্যয় করা হত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য হাতিয়ার/অস্ত্র কিনতে। পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে ১৯০৮ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে বাংলায় ৮৪টা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই ঘটেছিল পূর্ববাংলায়। পশ্চিমবাংলায় ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেফতার মানিকতলায় মুরারীপুকুরের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি এবং আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তীব্র আঘাত মেনেছিল বিপ্লবী কার্যকলাপের উপরে। রাজনৈতিক ডাকাতি ছাড়াও বেশ কিছু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে ও এসময়ে

ঘটেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নপদস্থ সরকার কর্মচারীরা ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য। ১৯০৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এই ধরনের ৪৭টি হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়।

৫.৫ বিপ্লবীরা : ভারতে ও ভারতের বাইরে

বিপ্লবীরা বিদেশে বসবাসকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ভারতের বাইরে অনেক জায়গায় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিপ্লবের কাজে সক্রিয় এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ভি. ভি. সাভারকার, হরদয়াল, মাদাম কামা, অজিত সিং প্রমুখ।

স্বচ্ছল জীবনের খোঁজে বহুসংখ্যক পাঞ্জাবের অধিবাসী প্রধানত হোশিয়ারপুর জেলা থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই ভারত ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে। এদের মধ্যে বহুজনই কানাডা বা উত্তর আমেরিকায় বসবাস করবার অনুমতি পায়নি। আর যারা পেয়েওছিলেন তাদের কেউ বর্ণ বিদ্বেষের শিকার হতে হচ্ছিল। ব্রিটিশ শাসক আশঙ্কা করছিল যে উত্তর আমেরিকার সাদা চামড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভারতের অভিবাসীদের যোগাযোগের ফলে আমেরিকায় সেই সময় জনপ্রিয় হতে থাকা সমাজতন্ত্রবাদ যদি ভারতীয়দের প্রভাবিত করে তাহলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। এইসব বিবেচনা করেই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয়দের কানাডার অভিবাসনের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই সময়ে তারকনাথ দাস নামে এক ভারতীয় ছাত্র *ফ্রি হিন্দুস্তান* বলে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা বিশেষ করে তাদের উত্তর আমেরিকায় ভারতীয়দের অভিবাসনের নীতির বিরোধিতা করে তারকনাথ দাস উত্তর আমেরিকায় প্রথম ভারতীয়দের নেতা হয়ে ওঠেন। তারকনাথ তার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জঙ্গি জাতীয়তাবাদের প্রচার করতেন।

জি. ভি. কুমার লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের অনুকরণের ভ্যানকুভারে স্বদেশি সেবক হোম প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি স্বদেশি সেবক নামে এক গুরুমুখী কাগজও প্রকাশনা করতেন। সেখানে তিনি সমাজ সংস্কার প্রচার করতেন এবং ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রেরণা জোগানোর চেষ্টা করতেন। তারকনাথ দাস এবং জি. ভি. কুমার দুজনেকেই ভ্যানকুভার থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। অতঃপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটেলে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠা করে সেখানে প্রতি শনিবার করে ২৫ জন ভারতীয় শ্রমিককে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার প্রচেষ্টা করতেন।

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া হাউস ছিল বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের ঘাঁটি। খালসা দিওয়ান সোসাইটি ছিল শিখ অভিবাসীদের এই একই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান। ভগবান সিং নামে এক পুরোহিত যিনি এবং মালেশিয়াতে কর্মরত ছিলেন ১৯১৩ সালে ভ্যানকুভারে বেড়াতে এসে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে উৎখাত করার বিষয়ে খোলাখুলিভাবে বক্তৃতার মাধ্যম প্রচার করতে লাগলেন বিপ্লবী সেলাম হিসাবে উনি 'বন্দেমাতরম্' ব্যবহার করতেন। ভদ্রলোক কানাডায় তিন মাস ছিলেন। রাজনৈতিক বিপ্লবী মতবাদ প্রচারে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে পৌঁছান,

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যপৃত হন। কয়েক বছর পর উনি উগ্রবাদী বুদ্ধিজীবী কিছু গোষ্ঠীর সভ্যদের কাছে নৈরাজ্যবাদ, সিন্ডিক্যালিস্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বসবাসকরা ছাত্রদের যে দৈনন্দিন সমস্যা বা অসুবিধা সেই নিয়ে কোনো মন্তব্য করতেন না। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর হামলা হবার পর উনি সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন কারণ তারপরই তিনি যুগান্তর সার্কুলার প্রকাশ করে তাতে ভাইসরয় হত্যার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। মে ১৯১৩ সালে পোর্টল্যাণ্ডে স্থাপিত হয় হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন। হরদয়াল ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন মুক্ত আমেরিকাকে। তাঁর কর্ম পরিকল্পনায় তিনি আমেরিকার স্বাধীন পরিবেশকে ব্রিটিশ ভারতের পরাধীন পরিবেশের থেকে বেশী উপযোগী মনে করতেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির প্রেক্ষাপট হিসাবে। এ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহ কমিটি গদর নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে পত্রিকা। সানফ্রান্সিসকো শহরে হবে পত্রিকার কার্যালয়। সম্ভাব্য নাম ও ঠিক হল যুগান্তর আশ্রম। গদর আন্দোলন শুরু হল গদর পত্রিকা মারফৎ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে। এছাড়াও পত্রিকাতে প্রকাশিত হল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিশ্লেষণ। তিলক, অরবিন্দ, সাভারকর, মাদাম কামা, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, অজিত সিং, সুফি আম্বা প্রসাদ প্রভৃতিদের লেখা প্রকাশিত হয় গদর পত্রিকায়। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল অথবা রাশিয়ার গুপ্ত সমিতিগুলো বীরত্বের বাহিনীর সঙ্গে।

১৯১৪ সালে তিনটি ঘটনা গদর আন্দোলনকে গতিধারা উপর প্রভাব ফেলেছিল। সেগুলো হল হরদয়ালের গ্রেফতার ও সে অবস্থা থেকে পলায়ন, কোমাগাটা মারুর, ঘটনা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। এরই মধ্যে রামনাথ দাস আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের একজন বাসিন্দা রাজনৈতিক সারকুলার-এ-আজাদি (Circular of Liberty) নামে একটি ইস্তেহার প্রকাশ করে স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করার ঘোষণা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেসব বিপ্লবীদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ করে দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল গদর পার্টি। একটি বিশেষ মিটিং করেছিল পার্টির সদস্যরা কী উপায়ে যুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায় এবং কী কৌশলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈনিকদের গদর পার্টির মতাদর্শের প্রাপ্তি আস্থাভাজন করে তোলা যেতে পারে ইত্যাদি আলোচনার জন্য। ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গদর পার্টি যুদ্ধ ঘোষণা করে। এয়লান-এ-জঙ্গ এর প্রস্তাব গৃহীত এবং তার ব্যাপক প্রচারও হয়।

মহম্মদ বরাকতুল্লাহ, রামচন্দ্র এবং ভগবান দাস অনেকগুলো পাবলিক মিটিং-এর আয়োজন করেন এবং সেখানে উপস্থিত ভারতীয়দের ভারতে প্রত্যাবর্তন করে সমগ্র বিপ্লব গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া হয়। বিশিষ্ট নেতারা জাপান, ফিলিপিন্স, চিন, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মাতে গিয়ে সেখানকার ভারতীয়দের ভারতে ফিরে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে রাজি করানোর বহু চেষ্টা করেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকার ভালো মতোই 'গদর পরিকল্পনা' সম্পর্কে অবহিত ছিল তাই—ইনগ্রেস ইনটু ইন্ডিয়া অর্ডিন্যান্সটি কার্যকরী করা হয়। পাঞ্জাবী

জনগণ কিন্তু গদর আন্দোলনে যোগ দিতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। ১৯১৪-র নভেম্বর মাসে গদর পার্টির সদস্যরা ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সফল হয় না। এরপর তারা বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল এবং বিষ্ণুগণেশ পিংলের মধ্যস্থতায় রাসবিহারী বসু ১৯১৫-র জানুয়ারি পাঞ্জাবে এসে পৌঁছে গদর বিপ্লবের হাল ধরেন।

রাসবিহারী বসুও বিভিন্ন সেনা কেন্দ্রে কর্মরত সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে অবশেষে ১৯১৫ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে সেনা বিদ্রোহের দিন বলে স্থির করেন। তারপর ঠিক হয় ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু সি. আই. ডি এই ষড়যন্ত্রের খবর আগেই পেয়েছিল তাই সময় মতো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে গদর বিদ্রোহ প্রতিহত করতে সফল হয়। বিশিষ্ট নেতা এবং কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। রাসবিহারী বসু অবশ্য গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়ে যান। পাঞ্জাবে আর মান্দালয়ের ষড়যন্ত্রীদের বিচার হয় ৪৫ জন বিপ্লবীকে মৃতুদণ্ড দেওয়া হয় আর ২০০র বেশি সংখ্যা বিপ্লবী দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বার্লিনে অবস্থিত কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী জার্মান সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেন। বার্লিন কমিটির যোগাযোগ ছিল আমেরিকা কর্মী গদর নেতা রামচন্দ্রের সঙ্গে। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এং বরকতুল্লাহের আফগানিস্তানের আমীরের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কাবুলে তারা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু তাদের কোনও প্রচেষ্টাই সফলতা লাভ করতে পারেনি।

৫.৬ আন্তঃযুদ্ধ সময়কালে বিপ্লবী আন্দোলন

১৯১৯ থেকে ১৯২৩ এই সময়ে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ খুব একটা তেমন ঘটেনি। অসহযোগ আন্দোলন উপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধিতার একটা বিকল্প পথের সন্ধান দেখাল। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ফলে বিপ্লবীরা প্রচ্ছন্ন সম্মতি জানালেন গান্ধী প্রদর্শিত পথে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে। সাময়িকভাবে এই পথে আন্দোলন তারা মেনে নিলেন। ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বিপ্লবীদের প্রতিনিধি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র সঙ্গে গান্ধীর খোলাখুলি একটা আলোচনা হল। তাতে সমস্ত বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে দত্ত গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে বিপ্লবীরা অন্তত গান্ধীকে এক বছরের জন্য একটা সুযোগ দিতে রাজি। এই সময়ে তারা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বীকার করছেন এবং কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতেন। কিন্তু গান্ধী নেতৃত্ব কংগ্রেস স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে, এক বছর পর বিপ্লবীরা বিপ্লবের রাস্তায় ফিরে গেলেন। ১৯২৩ থেকেই আবার রাজনৈতিক ডাকাতির সংখ্যা বাড়তে লাগল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাটগাঁ বা চিটাগাং দুটো ডাকাতির ঘটনা এবং কলকাতা শহরও তার আশেপাশে আরও দুটো ডাকাতির ঘটনা।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মার্কসবাদ এবং রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের কথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। বিশেষত ভারতে বিপ্লবী মতাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিতে। এই সময়ে বিশিষ্ট বিপ্লবী এম. এন. রায় দ্বিতীয় কমিনটর্ন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল চলাকালীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৫-এ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) কানপুরে

পার্টি সংগঠন থেকে প্রতিষ্ঠা করে কাজ করা শুরু করে। যদিও সি.পি.আই-এর রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে অনুশীলন বা যুগান্তর বিপ্লবী দলের কার্যক্রমের পার্থক্য ছিল তবুও সংগঠনগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, অন্ততঃ আংশিকভাবে। এম.এন.রায় উদ্যোগী হয়ে ভারতে বিপ্লবীদের মধ্যে আদর্শ প্রচার করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য অনুশীলন এবং যুগান্তর দল মার্কসবাদে উৎসাহী হয়ে তাদের কয়েকজন সদস্যকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠান।

রাউলাট আইন বিপ্লবীদের উপর সীমিত প্রভাব ফেলেছিল। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারত সুরক্ষা আইন বিপ্লবী কার্যাবলী অনেকটাই দমন করতে পেরেছিল। যখন রাউলাট আইন পাশ হয় তখন অধিকাংশই বিপ্লবীই জেলবন্দি ছিলেন। রাউলাট আইন প্রণয়ন হবার পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন দিকে মোড় নিল যখন এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু হল। আগেই বলা হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিপ্লবীরাও যোগদান করেছিলেন কিন্তু চৌরিচৌরা ঘটনার পর যখন গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত তাদের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি নিরুৎসাহী করে তুলেছিল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারত সুরক্ষা আইনে যে সব বিপ্লবীরা জেলবন্দি ছিলেন তারা জেল থেকে ছাড়া পেলেন। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের আইন রয়েল এ্যামনেস্টির বিধান অনুযায়ী এর ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীর আন্দোলনে যোগদান করলেন। যুগান্তর দলের সদস্যদের গান্ধীর প্রতি সমর্থন থাকলেও অনুশীলন কিন্তু সেই তুলনায় গান্ধী বিরোধী ছিল বলা যায়। অনুশীলন দল প্রকাশিত ইস্তাহারে কংগ্রেসের রাজনীতি যথেষ্ট সমালোচনা থাকত। অসহযোগ আন্দোলন-এর ব্যর্থতার পর বিপ্লবীরা আবার বিপ্লবের পথেই ফিরে গেলেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন প্রচুর সংখ্যক বিপ্লবীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই অধিবেশনের মুখ্য আলোচিত বিষয় ছিল তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ও কর্তৃপদ্ধতির কৌশল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল বিপ্লবী কার্যক্রম আবার শুরু করবার অনুকূলে। ১৯১৯-এর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রায় সমস্ত দমনমূলক আইন নাকচ করে দিয়েছিল। ১৯২১ সালের আগেই রাউলাট আইন ও ১৯১০-এর ইন্ডিয়া প্রেস এ্যাক্ট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। তাই এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবীরা সুযোগ তোলেন জনসাধারণের মধ্যে তাদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রচার করবার। এই সময় প্রচুর পরিমাণে বিপ্লবী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি হল বিজলী, আত্মশক্তি, সারথি, মুক্তিকাম। বাংলার যুবকদের বিশেষ করে ছাত্রদের উপর এই বিপ্লবী ইস্তাহার গুলির গভীর প্রস্তাব বিস্তার করেছিল। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন নামে একটা নতুন বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয় ইউনাইটেড প্রভিন্সে এই সময় নাগাদ। অনুশীলন দলের সভ্যরা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করলেও আশ্চর্যজনক যে এই সংগঠন বাংলায় সক্রিয় ছিল না। বরঞ্চ সেই তুলনায় যুগান্তর দল আগের থেকে রাজনৈতিক ভাবে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে সূর্য সেনের নেতৃত্বে যুগান্তর দল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে অফিস থেকে ১৭০০০ টাকা লুট করে। সন্দেহভাজন কয়েকজন গ্রেফতার হলেও প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যান। যেহেতু বিপ্লবীদের

নিশানায় ছিলেন ভারতীয় আধিকারিকরা তাই ব্রিটিশ সরকার তেমন কোনও কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেনি। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে যখন গোপীনাথ কুখ্যাত চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে আরেক সাহেব ই. ডে. কে হত্যা করেন। তিন মাস পর আবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটে যখন টেগার্টের বদলে খুন হন মিঃ ব্রুম বলে আরেক ব্রিটিশ ভদ্রলোক। এই দুই ঘটনায় টনক নড়ে ব্রিটিশ শাসকের। বিপ্লবীবাদ দমন করতে আবার তারা সচেষ্ট হন। ভারত সুরক্ষা আইনের সমতুল্য কঠোর দমনমূলক আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করতে তৎপর হয়ে উঠোন। কিন্তু ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল আর ভুল করতে রাজি ছিল না। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছিল তার পুনরাবৃত্তি আর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল চায়নি। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার পুরো বিষয়টাকেই লণ্ডনের লেবার পার্টির সরকারের কাছে উপস্থাপিত করল। এর ফলস্বরূপ বেঙ্গল ক্রিমিনাল এমেণ্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স পাশ হল ২৫শে অক্টোবর ১৯২৪ সালে। আবার এই আইন বলে পুলিশ বিশেষ ক্ষমতা পেল বিনা বিচারে সন্দেহজহনক ব্যক্তিদের আটক করবার। এই পর্যায়ে বহু বিপ্লবী জেল বন্দি হলেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে দু'বছরের জন্য বন্দি করে রাখা হল বর্মার মান্দালয়ে জেলে। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ২৫ শে মার্চ ১৯২৫ সালে বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্সকে যথাযথভাবে আইনে পরিণত করলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৮৩ ব্যক্তি গ্রেফতার হন যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন সি. আর. দাশের স্বরাজ দলের সদস্য। আগেই বলা হয়েছে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন (এইচ. আর. এ) প্রতিষ্ঠায় হয়েছিল দুই অনুশীলন সমিতির সদস্যের উদ্যোগে। তাদের মধ্যে একজন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন সমিতির বেনারস শাখা থেকে অপরজন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী ছিলেন ঢাকা শাখায়। গদর পার্টির মতো হিন্দস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন ছিল বাংলার বাইরে আর একটি বিপ্লবী সংগঠন। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন ছিল মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লবের আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত। এইচ. আর. এ-র সঙ্গে গদর পার্টির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যুক্তপ্রদেশে সক্রিয় বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে বিপ্লববাদের আরও বেশি প্রসারিত করার জন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে সৃষ্টি হয় এইচ.আর.এ। সংগঠনটির সংবিধানে দেখানো হয় গণতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করাই এইচ. আর. এ-র প্রধান লক্ষ্য। ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্রিটিশ ভারতে অবস্থিত একটা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটির সভ্যদের দায়িত্ব ছিল এইচ.আর.এ—শাখাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের যেসব বিপ্লবীরা বিদেশের মাটি থেকে লড়ছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। এসবের সঙ্গে এইচ.আর.এ-র লক্ষ্য ছিল যথাক্রমে—(ক) ইংরাজী ও আঞ্চলিক ভাষায় ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের (সি.আই.ডি) কাজকর্মের নিন্দা করে লেখা প্রকাশ করা। (খ) বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি মানুষের সহানুভূতি গড়ে তোলা। (গ) সি.আই.ডি নিয়োজিত গুপ্তচরদের সন্ধান করে হত্যা করা। (ঘ) অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। (ঙ) অর্থের জোগাড় করা। (চ) যোগ্য ব্যক্তিদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়া বা জার্মানিতে পাঠানো এ বিষয়ে এম.এম.রায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি চেষ্টা করেছিলেন রাশিয়া থেকে আর্থ-সামরিক সাহায্য সংগ্রহ করতে। অন্যদিকে যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কমিটির একটা

মিটিং-এ যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী একটা পাঁচদফা পরিকল্পনা তৈরি করেন, যাতে ছিল : (১) সি.আই.ডি-র বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার। (২) সরকারের দমনমূলক নীতি ও আইনের সমালোচনা। (৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রসের কাজকর্মের মূল্যায়ন। (৪) বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রচার এবং (৫) প্রকাশনার জন্য লেখা সংগ্রহ।

এইচ.আর.এ-র উপর ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন প্রধান সংগঠক নগেন্দ্র সেনকে নিয়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের তীব্র মতবিরোধ শুরু হল। এরই মধ্যে অনুশীলন সমিতি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল যথাক্রমে নলিনী দত্ত, চারুবিকাশ দত্ত ও সুরেশ ভরদ্বাজের অধীনে। যুগান্তর দলে থেকে বেড়িয়ে এল একটা গোষ্ঠী সূর্য সেনের অধীনে।

১৯২৩ আর ১৯২৫ এর মধ্যে এইচ.আর.এ দলের নির্দেশে তিনটি সফল ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা তাদের অধীনস্থ ভারতীয় চাকুরদের বদলে বিপ্লবীদের লক্ষ্যে এবার পড়ে দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীরা ও মহাজনরা। এইচ.আর.এ জোড় ধাক্কা খায় যখন শচীন সান্যাল এবং যোগেশ চ্যাটার্জি দু'জনেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। অন্যান্য অনেক সদ্যসদেরও ওই সময়ে কারারুদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে কাকোরিতে ডাকাতির ঘটনার পর। কাকোরি ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ। (১৯২৫ আগস্টের ৯ তারিখে কাকোরি নামক স্থানে ট্রেন ডাকাতির ফলে ৪৫০০ টাকা লুঠ হয় ও একজন ট্রেন যাত্রীর মৃত্যু ঘটে) এই পুলিশী ধরপাকড়ের হাত থেকে বেঁচে যান একমাত্র চন্দ্রশেখর আজাদ। এইচ.আর.এ. এর কলকাতা শাখা এরপর বোমা তৈরির কাজে প্রবল উৎসাহী হয়ে পড়ে যা অচিরেই পুলিশের নজরে আসে। দক্ষিণেশ্বরের পুলিশী তল্লাসীর ফলে ১১ জন সদস্য ধরা পড়েন এবং এখানেই বাংলায় হিন্দুস্তান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের ইতি ঘটে।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা চলেছিল দু'বছর ধরে অবশেষে ১৯২৭ সালে আশফুল্লাখান খান, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং এবং রাজেন্দ্র লাহিড়ী এই চারজনের ফাঁসির আদেশ হয়। পাঁচজন যাবজ্জীবনের সাজা পান। আরও এগারোজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যদিও হিন্দুস্তান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশন ছিল মূলত উত্তর ভারতভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন, তবুও একথা ঠিক এই দলের গোড়াপত্তনে কিন্তু অনেক বাঙালী বিপ্লবীদের অবদান ছিল। বিশেষ করে ইউনাইটেড প্রভিসেন্স-এর বাঙালি বিপ্লবীদের যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রান্তিক সদস্য। উত্তর ভারত ও বাংলার বিপ্লবীদের এই যোগাযোগের ফলে একটা পারস্পরিক নির্ভরতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বোমা বানানোর পদ্ধতির আদান-প্রদান যেমন হত তেমনি মাঝে মাঝে বিপ্লবের কৌশলগত দিকগুলো নিয়েও আলোচনা চলত।

১৯২০'র দশকের একটাই ছিল বিশেষত্ব। ১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এইচ.আর.এ-এর সংবিধান রচনা করেন। সেখানে তিনি লেখেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য হচ্ছে সুসংবদ্ধ সমগ্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রগণ। সান্যালের আত্মজীবনী *বন্দি জীবন* এবং কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কারাগার বন্দি বিপ্লবীরা পরবর্তী যুগের বিপ্লববাদী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

কাকোরি পরবর্তী পর্যায়ে ভগৎ সিং চেষ্টা করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিপ্লবী দলগুলোকে একত্রিত করে পুনর্গঠন করতে। এই মর্মে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৮-৯ সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিরূপে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলাতে একটা সম্মেলন আহ্বান করেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব থেকে আগত প্রতিনিধিরা সংগঠিত হতে সম্মত হন। ট্রেড ইউনিয়ন এবং কমিউনিসম দ্বারা এর অনুপ্রাণিত ছিলেন। ওর দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির পতন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলতে। ভগৎ সিং ও তার সহকর্মী কমরেডদের উদ্যোগ এই পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফিরোজ শাহ কোটলার মিটিংয়ের ফলস্বরূপ জন্ম নিল হিন্দুস্তান সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন। বাঙলার বিপ্লবীরা এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি। যুগান্তর দল এবং অনুশীলন সমিতি স্বাধীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের সেই স্বাধীন অবস্থানের পরিবর্তন চায়নি। হিন্দুস্তান সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লবী আদর্শের অমিল ছিল। বাংলার বিপ্লবী দলগুলোতে জাত এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ করে ১৯১০ সালের পর থেকে। হিন্দুস্তান সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়শনের (এইচ.এস.আর.এ) আপ্রাণ চেষ্টা ছিল বিপ্লব ও বিপ্লবীদের প্রতি একটা ইতিবাচক জনমত গঠন। তাদের লক্ষ্য স্থির ছিল যার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর পরিকল্পনা ছিল সুসংবদ্ধও সুচিন্তিত। বাছাই করা সরকারি অফিসারদের উপর আক্রমণ ছিল এইচ.আর.এ এর লক্ষ্য।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে এইচ.এস.আরএ.-এর নেতৃত্বে প্রথম আক্রমণ হয় পুলিশের সিনিয়র সুপারিনন্টেডেন্ট জে.এ. স্কটের উপর লাহোরে। পুলিশের বড়কর্তা স্কট লাহোর রেলস্টেশনে লালা লাজপত রাইয়ের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন বিরোধী অহিংস বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর পুলিশকে লাঠি চার্জের আদেশ দেন। সাইমন কমিশন গঠন করা হয়েছিল ভারতীয়দের কিছু সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য। এর সদস্যরা ছিলেন শেতাঙ্গ। লাঠির আঘাতের ফলে লাজপত রাই-এর মৃত্যু হয়। এইচ.এস.আর.এ. এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়। ভুলবশতঃ ভগত সিং এবং রাজগুরু যার উপর দায়িত্ব ছিল স্কটকে চিনিয়ে দেওয়ার, স্যাণ্ডার্স নামে ২১ বছরের পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার উপর গুলি চালান। চন্দ্রশেখর আজাদও চেনান সিং নামে এক ভারতীয় পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করেন। স্যান্ডার্স লাজপত রাই এর লাঠি চালানোর সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ছিলেন তাই ভুল লোককে গুলিবিদ্ধ করলেও ভগৎ সিং ও রাজগুরুর সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। এইভাবে যে শহীদত্ব প্রাপ্ত লাজপত রাই-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ তাঁরা নিতে পেরেছিলেন।

সর্বভারতীয় এইচ.এস.আর.এ-এর নেতৃত্বস্থানীয়রা সিদ্ধান্ত নেন জনসাধারণকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করতে। সেই লক্ষ্যই এই পার্টি প্রচার করতে শুরু করে। ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ সালে প্রস্তাবিত পাবলিক সেফটি বিল এবং ট্রেড বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা ফেলেন। তাঁদের বিবেচনায় এই দুই বিল পাস হলে সাধারণভাবে সকল ভারতীয় ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হবে, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের। এইচ.এস.আর.এ এর উদ্দেশ্যে ছিল বোমার ঘায়ে কাউকে

ঘায়েল না করে "বধির" সরকারের কানে দমনমূলক দুই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভারতীয়দের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া। এ বোমার সঙ্গে ছোঁড়া পার্টির লিফলেটে এ কথা লেখা ছিল। এবং এই অপরাধে আদালতে যখন তারা বিচারাধীন থাকবেন তখন তারা আদালত কক্ষকে রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করে তাদের আদর্শ ও ঔদ্ধত্যের কথার জেলের জনগণকে জানাবেন।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে শুকদেব, রাজগুরু ছাড়াও আরও দশজন বিপ্লবীর বিচার হয়। আদালতে বিচারের সময় তাদের নির্ভীক ও প্রতিবাদী মনোভাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং বিপ্লবীদের অভীষ্ট পূরণ হয়। দেশের মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি তাঁরা লাভ করেন। বিচারের পর জেলবন্দি অবস্থায় তাঁরা অনশন শুরু করেন জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেন যে তাঁরা কোনো সাধারণ অপরাধী নয়, তাঁরা রাজনৈতিক বন্দি তাই তাদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে হবে। তাদের এই অবস্থানের জন্য আরও একবার জনগণের বিপুল সহানুভূতি তারা অর্জন করলেন।

এইচ. এস. আর. এ তে বাঙালি বিপ্লবীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। তার মধ্যে অন্যতম যতীন্দ্রনাথ দাস জেলে অনশন- রত অবস্থায় ৬৪ দিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। তারিখ ছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯। সারা দেশের মানুষ অনশনকারীদের সমর্থনে একজোট হয়। ট্রেনে করে যখন যতীন দাশের মরদেহ লাহোর থেকে কলকাতায় আনা হয় তখন প্রতিটি স্টেশনে মানুষের ভীড় উপচে পড়ছিল। প্রত্যেকেই এসেছিলেন শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

বটুকেশ্বর দত্ত কানপুরের প্রবাসী বাঙালী। তার আদি বাড়ি বর্ধমানে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা ফেলার সময় তিনি ছিলেন ভগৎ সিং-এর সঙ্গে। ধরাও পড়েন একই সঙ্গে।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় এবং অন্যান্য আরও মামলায় বহু বিপ্লবী দোষী সাব্যস্ত হন। সকলেরই দীর্ঘমেয়াদি শাস্তি হয়। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে দীপান্তরে চালান করা হয় (আন্দামান সেলুলার জেলে)। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৩ শে মার্চ ১৯৩১ সালে তাদের ফাঁসি হয়। তার আগেই কমরেড চন্দ্রশেখর আজাদ ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইতে নিহত হন।

৫.৭ বাংলা ও বিপ্লবী আন্দোলন : ১৯২০ এর দশক ও তারপর

১৯২৭-২৮ সালে সাইমন কমিশন গঠন হবার পর বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। বিপ্লবী কার্যাবলী আবার শুরু হল। এরই মধ্যে যে অল্প কয়েকটি বিপ্লবী দল মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এইচ.আর.এ., ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে এই দলের ঘোষিত লক্ষ্য কিছুটা অদলবদল ঘটল। সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রভাবে দলের নাম পরিবর্তিত হয়, হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন থেকে হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশন।

১৯২৬ পর্যন্ত বাংলা বিপ্লবী আন্দোলন খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মার্চ ১৯২৭ পর বাংলার সরকার সিদ্ধান্ত নিল ক্রিমিনাল ল এ্যামেণ্ডমেন্ট অর্ডিনান্স (১৯২৪) এবং বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' এ্যামেণ্ডমেন্ট

এ্যাক্ট (১৯২৫) এর ধারায় সকল বন্দিদের মুক্ত দেওয়া হবে।

এই সময়ে বাংলার রাজনীতিতেও দুটো নতুন দল উঠে এল (ক) শ্রীসংঘ ও (খ) দ্য বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স। সতীশ পাকরাশির উৎসাহে অনুশীলন সমিতিরও পরিচয় হল মার্কসবাদের সঙ্গে। সে সময়ে মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত আরও বেশ কয়েকটি সংগঠন বাংলায় ছিল। তাদের মধ্যে দুটি হল রিভোল্ট গ্রুপ অফ অ্যাডভান্স পার্টি। এদের সদস্যরা আগে থেকেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সতীশ পাকরাশি বা ধরণী গোস্বামীর মতো সংগঠকরা গণ আন্দোলনের আদর্শে বাংলার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে হেমচন্দ্র ঘোষের শ্রীসংঘ ও সুভাষ বোসের বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বাংলার রাজনীতিতে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় আত্মপ্রকাশ করল। ১৯১২ থেকেই হেমচন্দ্র ঘোষ ও তার বিপ্লবী সংগঠন দ্য রেভল্যুশনরি ফ্রের্টারনিটি বিপ্লবের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। দ্য রেভল্যুশনরি ফ্রেটারনিটি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীসংঘ ও বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স। ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্নাতক স্তরের ছাত্র অনিল রায় ১৯২১-২২ সালে শ্রীসংঘের গোড়াপত্তন করেন। কিছু সময় পর প্রতিষ্ঠা করেন সোশ্যাল সার্ভিস লীগ। পরবর্তীতে এই সংগঠন দীপালি সংঘের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ঢাকার একটি মহিলা সংগঠন হিসাবে পরিচিত লাভ করে। অপরদিকে এই একই সময়ে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল তাদের গোপন বৈপ্লবিক কাজকর্মে পুনর্গঠনে সচেষ্ট হয়। দলগুলোর সদস্যদের মধ্যে অনেকেই তখন কংগ্রেসের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতেন যার ফলে জনসাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বেড়ে গিয়েছিল। আবার অনেক সদস্য সি.আর. দাসের স্বরাজ পার্টির সহযোগী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সদস্যরা যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নেতৃত্বাধীন বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের দুটি শাখায় যোগদান করেন।

এযাবৎকাল বিপ্লবীরা যেসব ব্রিটিশ অফিসাদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের মধ্যে চার্লস টেগার্ট ছিলেন অন্যতম। ভারত বিদ্বেষী কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ছিলেন দেশবাসীর অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র। ১৯২০-এর দশক ধরে বিপ্লবীরা বহুবার চেষ্টা করেছিলেন টেগার্ট হত্যার। ১৯২৪-এর জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট হত্যার পরিকল্পনা করেন। ভুলবশতঃ টেগার্টের বদলে নিহত হন আরনেস্টড নামে আরও একজন ইংরেজ।

এই ঘটনার পর সরকার নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বিপ্লবী বা বিপ্লবীদের সহযোগী সন্দেহে পুলিশ বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে। নতুন আইন পাশ করা হয় ব্রিটিশ বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করবার জন্য। সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করা হয় এবং জনতার প্রতিবাদ সত্ত্বেও গোপীনাথ সাহাকে ফাঁসিতে ঝোলান হয়।

সাহা মামলার পর ১৯২৫-২৬ নাগাদ পুলিশী তৎপরতা কলকাতা ও তার আশে-পাশের শহরতলীতে বহু সংখ্যক বোমা বানানোর কারখানার হদিস পাওয়া যায়। এ সময়ে লক্ষ্ণৌ শহরের কাছে কাকোরিতে ট্রেন ডাকাতির ঘটনা জড়িত বিপ্লবীদের মধ্যে পুলিশ নয়জন বাংলার বিপ্লবীকে চিহ্নিত করেন। একদিকে সরকারের দমন অন্য দিকে অনুশীলন যুগান্তর রেষারেষি-র ফলে বিপ্লবী কার্যক্রম বেশ কিছু সময়ের জন্য

সীমিত হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তুলল ইন্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মির সহযোগী সংস্থা চট্টগ্রাম রিভোল্ট গ্রুপ।

এই দলের নেতা ছিলেন সূর্য সেন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেচিলেন। চট্টগ্রামের একটি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন বলে তিনি সকলের কাছে 'মাস্টার দা' নাম পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য তিনি গ্রেফতার হন ও ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত তিনি জেলবন্দি থাকেন। সে সময়েও তিনি ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। চট্টগ্রামে সূর্য সেন ও তার দলের সদস্যদের সকলেই কংগ্রেসের সংগঠনের জন্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯২৯ সালে সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সচিব ছিলেন। তাঁর পাঁচ সহযোগী ছিলেন এই কমিটির সদস্য।

সূর্য সেন একজন অসাধারণ সংগঠক ছিলেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল। কবিতা ভালবাসতেন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। তার মানবিকতা বোধ ফুটে উঠেছিল তার বিপ্লবী আদর্শে—"মানবিকতা বোধ বিপ্লবীর একটি বিশেষ গুণ"—তার এই উদারপ্রকৃতির মধ্যে দিয়েই তার আবেগের প্রকাশ হয়েছে। তরুণ বিপ্লবীদের এক বিরাট দল তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যে দলে ছিলেন অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত (পরে যোশী)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁরা সহস্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে চট্টগ্রামের দুই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছিলেন। এই লক্ষ্য পূরণের প্রথম ধাপ হিসাবে তাঁরা চট্টগ্রামকে সমগ্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন ধার্য হয় ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০। ইন্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মির পতাকার নীচে ৬৫ জন তরুণ বিপ্লবী কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে একত্রিত হন। ছ'জনের একটি দল গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে এবং লোকনাথ বলের অধীনে দশজনের একটি দল অক্সিলিয়ারী ফোর্স আর্মারী লুঠ করে; লুণ্ঠনকারী দলের কেউই গোলাবারুদের সন্ধান পাননি। ডাকাতির সময়ে বিপ্লবীরা "ইনকেলাব জিন্দাবাদ" সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক" ও "গান্ধী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল" স্লোগান দিতে থাকেন। তারা চট্টগ্রাম অস্থায়ী বিপ্লবী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি তাই বিপ্লবীরা ঠিক করেন ব্রিটিশ নজর এড়াতে তারা সুরক্ষিত আশ্রয়ের খোঁজে চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয়ে নেবেন। দুর্ভাগ্যবশত ২২শে এপ্রিল লুণ্ঠনের মাত্র চারদিন পর বিকেলের দিকে ব্রিটিশ ফৌজ জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় আশিজন ব্রিটিশ সৈন্য ও বারোজন বিপ্লবীর প্রাণ যায়। বিপ্লবী দলের নেতা সূর্য সেন পালিয়ে প্রতিবেশী গ্রামগুলোতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে সরকারি কর্মচারী ও সম্পত্তির উপর হামলা চালান। প্রচুর খোঁজাখুজি ও নিপীড়ন চালিয়েও সূর্য সেন ও তার দলের সদস্যদের হদিস পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যে থেকে একটা ছোট দল প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাবে সশস্ত্র হামলা চালান ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ঘটনার পর গ্রেফতারি এড়াতে প্রীতিলতা আত্মঘাতী হন। শেষমেষ একজন জমিদারের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯৩৩ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি মাসে মাস্টার দা সূর্য সেন পুলিশের হাতে ধরা

পড়েন। বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ব্রিটিশ সরকার। ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে ফাঁসি হয় সূর্য সেনের। এরপর তার সহযোগীদের অনেকেই গ্রেফতার হন। দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের দণ্ডে দণ্ডিত হন তাঁরা। সাধারণ মানুষের জগতে এবং জাতীয়তাবাদী ভাবনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে শুধু বাংলায়ই নয় ভারতের অন্যান্য স্থানেও বিপ্লবী দলগুলোতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ১৯৩০-এর আগস্ট মাসে পুলিশের ইন্সপেক্টর এফ.জে. লোম্যান ঢাকায় নিহত হন ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ বসুর হাতে। আহত হন ওনার সহকর্মী এরিক হডসন। ডালহৌসী স্কোয়ারে কুখ্যাত কলকাতার পুলিশ কমিশনারের আরও একবার হত্যার চেষ্টা হয়। সন্দেহের বশে দীনেশ মজুমদার গ্রেফতার হন বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার দলের বিনয় বসু, বাদল ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতায় ব্রিটিশ শাসনের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন। বিপ্লবীদের গুলিতে মারা যান এন.এ. সিম্পসন। ইন্সপেক্টর অফ প্রিজনস যিনি "প্রতিরোধমূলক অন্তরীণ" নীতির সমর্থক ছিলেন। সরকার বিনয় বসুকে লোম্যানের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করে। রাইটার্সের আলিবদ্ধ যুদ্ধে বা বারান্দা যুদ্ধে বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। ঘটনাস্থলে বিনয় ও বাদল আত্মঘাতী হলেও গুরুতর আহত দীনেশ গুপ্তকে পুলিশ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে। এক বছর পর বিশেষ এক ট্রাইবুন্যালে দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে রাজনৈতিক হত্যার ফলে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন কয়েকজন পুলিশের আধিকারিক; বহু ভারতীয় সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশের গুপ্তচরদেরও বিপ্লবীরা নিশানা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন মেদিনীপুর জেলার তিনজন জেলা শাসক,একজন কলকাতার জজ, কুমিল্লা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুই স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী কুমিল্লা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করেন)। এসময়ে আরও একটি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনা হল ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্য স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর বীণা দাস নামক এক ছাত্রীর গুলি চালানোর ঘটনা। মোট কথা ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল এই তিনবছরে মোট ১২ জন অফিসার এবং ২০ জন সাধারণ কর্মচারী নিহত হন।

রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা এই সময় দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সারা বাংলায় কলকাতা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রছাত্রীরাই এ সময় প্রচুর সংখ্যায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড জড়িয়ে পড়েন। এরা বেছে বেছে ব্রিটিশ ক্লাব, খেলার মাঠ, রেস কোর্সের মত জায়গায়ই আঘাত হানতেন। ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়নের উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা এবং তরুণ দল সন্ত্রাসের সাহায্যে ব্রিটিশ সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শাসকের মনে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা চালাতেন।

অবশ্য হিন্দুস্তান সোস্যালিট রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে ফাঁসি এবং কারাদণ্ড হবার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ইউ.পি., পাঞ্জাব, বাংলায় বিপ্লবী কার্যক্রম অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছিল। বাংলায় সূর্য সেনের মৃত্যুর পর, বলা যায় বিপ্লবী কার্যক্রমে ছেদ পড়ে গিয়েছিল। জেলবন্দি

অনেক বিপ্লবীরাই এ সময়ে মার্কসদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠেন মাকর্স প্রদর্শিত পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী তত্ত্বে তারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেন এবং পরবর্তীতে জনগণের বিচার তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৭র নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশে যখন অস্থায়ী সরকারি গঠন করা হয় তখন বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কেউ কেউ রেভল্যুশনারী পার্টি বা ওই ধরনের অন্যান্য বামপন্থী দলে যোগদান করেন। আবার কিছু সংখ্যক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে গান্ধীর অনুগামী হয়ে উঠেন।

৫.৮ কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বিপ্লবীদের কোনও না কোনওভাবে যোগসূত্র ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের চরিত্র কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভবও বিকাশ মধ্যপন্থা-চরমপন্থী বিরোধ এসব বিষয়ের আলোচনার মধ্য থেকেই কংগ্রেসের নীতির উপর বিপ্লববাদের প্রভাব সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী হয়ে যায়। যেমন কংগ্রেস নীতির সঙ্গে বিপ্লবী রাজনীতির কোথায় কতটা মিল এবং কোথায় তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। কখনো নিবিড় তবে বেশির ভাগ সময়ই গোপনে।

১৯২৩-র দশকে গান্ধী বিরোধী আন্দোলনের অহিংসনীতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন কারণ তার মনে হয়েছিল ভারতীয় পরিস্থিতি অহিংস নীতি বাস্তবধর্মী। এই নীতির উপর ভিত্তি করে আন্দোলন গড়ে তুললে। দ্রুততার সঙ্গে লাভ সম্ভব হবে। তাই গান্ধী ভারতীয়দের আবেদন জানিয়েছিলেন অহিংস আন্দোলনে নিতে। কংগ্রেস এবং হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন ১৯২০ এর দশকে শেষের দিকে একসঙ্গে লাহোর, দিল্লি, এবং কানপুরে একসঙ্গে আন্দোলন করেছিল।

তরুণ কংগ্রেস কর্মী জওহরলাল সম্পর্কে ১৯২৭ সালে স্কটল্যাণ্ডে ইয়ার্ড যে রিপোর্ট তৈরি করে তাতে জওহরলালকে চিহ্নিত একজন ভারতীয় যিনি বিপ্লবী আন্দোলনের (বামপন্থী) সঙ্গে জড়িত শুধু ভারতেই নয় ইউরোপেও তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে প্রচুর চরমপন্থী ও রাজনৈতিক থাকা মানুষদের সঙ্গে। এছাড়াও জওহরলাল যে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিতদের সমর্থক এবং সন্দেহজনক কয়েকটি সংগঠনের সদস্য যেমন লীগ এগেস্ট ইম্পিরিয়ালিসম—এইসব তথ্য ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে ছিল।

স্বরাজ্য পার্টিতে থাকবার সময় মোতিলাল নেহরুর সঙ্গেও যে বিপ্লবীদের সংযোগ ছিল তার সমর্থনে ও যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২৮ তা, এই সময়ে এমন বহু জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন যারা কংগ্রেসের সদস্য হয়েও বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন। এর মধ্যে কিন্তু তারা কোনও আদর্শগত বিরোধ দেখেননি।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী আরউইন চুক্তি এবং কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের পর গান্ধী কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোকে সুসংবদ্ধ করতে আর্জি জানালেন এবং অহিংসা শব্দটি দ্বর্থহীন ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। ১৯৩৩ সালে ভারত সরকার প্রকাশ করল 'A Note on Terrorism in India'; বাংলাকে এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বাংলায় ১৯০৫ সাল থেকে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রকাশিত হল

আরও একটি খণ্ড। ১৯৩৪ সালে শুরু হওয়ার আগেই মোটামুটিভাবে বিশিষ্ট বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই মারা গিয়েছিলেন আর কাকোরিরা যাবজ্জীবনের সাজা ভোগ করছিলেন। ১৯৩৭ এর পর কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলোর যখন অস্থায়ী প্রাদেশিক সরকার করে ফেলেছে তখন সব রাজনৈতিক বন্দিদের এমনকি বিপ্লবীদেরও জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদান করেন কেউ কেউ গান্ধীবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল।

৫.৯ উপসংহার

বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশক ধরে বিপ্লবী চরমপন্থী রাজনীতি নানা উপায়ে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল। তারা ব্রিটিশ আধিকারিকদের এবং যেসব ভারতীয় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাদের সরাসরি আক্রমণ করতেন। আসলে প্রাক্‌গান্ধী যুগের বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন মুক্ত এক ভারতীয় জাতিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীদের (অথবা মধ্যপন্থীদের) এ ধারণা ছিল না। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতবর্ষে ভাবতেই পারেন না তাই তারা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় যোগদানের আবেদন জানাতেন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীর চাইতেন সমগ্র বিপ্লবের সাহায্যে উপনিবেশিক শাসনকে পরাস্ত করে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করতে। ভারতকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করা এই ধারণাটাই সে সময়ে যথেষ্ট বৈপ্লবিক এবং কল্পনার অতীত। বিপ্লবীপন্থীরা ব্রিটিশ শাসকের মনে ভীতির সঞ্চার করতে সন্ত্রাসের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ আধিকারকিদের হত্যা, সরকারী সম্পত্তির উপর হামলা, সশস্ত্র ডাকাতি—এই সব পন্থা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তাই জন্যেই সরকারি আলাপ আলোচনায় বিপ্লবীদের ব্রিটিশরা সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি অবশ্য জাতীয়তাবাদী আদোলনে তাদের অবদানের মূল্যায়ন করে তাদের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতীতে বিপ্লবীরা জঙ্গি জাতীয়তাবাদী বলেও বর্ণিত হতেন। কিন্তু সন্ত্রাস বা জঙ্গী ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার এখন অর্থে করা হয় সেটা যথেষ্ট অবমাননাকর। তাই উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর বিপ্লবীরা জাতীয়তাবাদী। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাদের অবশ্য না না কারণে অবদান আছে একথা অনস্বীকার্য। বিপ্লবী আন্দোলন কখনও গণআন্দোলন হয়ে ওঠেনি, —তা সীমাবদ্ধ ছিল একটি শ্রেণির মধ্যে।

৫.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. উনিশ শতকের শেষাশেষি ভারতবর্ষে বিপ্লবী চরমপন্থার উদ্ভবের রাজনৈতিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।

২. উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ায় ভারতে রাজনৈতিক চরমপন্থার উদ্ভবের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত আলোচনা করুন।

৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কী কী রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছিল? আপনি কি মনে করেন তাদের সীমাবদ্ধতা উপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে চরমপন্থী মতবাদের উত্থানের জন্য দায়ী?

৪. ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সরাসরি ঘোষণা কি আপনার মতে এই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল?

৫. বাংলার প্রথম বিপ্লবী সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক কার্যসূচি ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৬. বিংশ শতকের গোড়ায় ভারতে এবং ভারতের বাইরে রাজনৈতিক চরমপন্থার উদ্ভব ঘটেছিল তারই পরিণত রূপ কী বিপ্লবী আন্দোলন?

৭. ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গদর পার্টির ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

৮. ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিত গান্ধীর সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্কের বিশ্লেষণ আপনি কীভাবে করবেন?

৯. মার্কসের তত্ত্বের দ্বারা ১৯৩০-এর দশকের বিপ্লবীরা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন? গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনকে আপাত ব্যর্থতার ফলে কি বিপ্লবীরা মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন? আপনি কি এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত?

১০. রুশবিপ্লব কীভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রকৃতিগত ভাবে পরিবর্তন এনেছিল? বিপ্লবী আন্দোলনের পুনরুত্থান প্রসঙ্গে আলোচনার সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করুন।

১১. ভারতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের (Hindustan Socialist Republican Association) ভূমিকা আলোচনা করুন।

১২. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্ক কীভাবে আপনি বিশ্লেষণ করবেন?

১৩. বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে উপনিবেশিক সরকার আইনী ব্যবস্থা, বিচার এবং বিভিন্ন দমনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিপ্লবী কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে কতটা সফল হয়েছিল?

১৪. "উপনিবেশিক ভারতের বিপ্লবী ঘটনাবলীর চরিত্র অভিন্ন ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রকাশ ছিল ভিন্ন"—বিশ্লেষণ করুন।

৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Durba Ghosh. *Gentlemanly Terrorists : Political Violence and the Colonial State,* The University Press, 2017.

Amales Tripathi. *The Expremist Challange : India between 1890 and 1910*, Calcutta : Orient Languages. 1967.

Sabyasachi Bhattacharya, *The Defining Moments in Bengal. 1920-1947,* New Delhi : Oxford University Press. 2014.

John H. Broomfield. *Elite Conflict in a Plural Society : 20th Century Bengal.* Kolkata : Jadvapur University Press. 2018.

Hiren Chakrabarti. *Policital Protest in Bengal : Boycott and Terrorism 1905-18,* Kolkata. Papyarus 1973.

Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908.* New Dehko : People's Publishing House. 1973.

David M. Lausley. *Bengal Terrorism and the Maxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India*. 1905-1942. Calcutta Firma K.L.M. 1975.

Peters Heahs. *The Bomb in Bengal : The Rise or Revolationary Terrorism in India 1900-1910*.

Kama Maclean. *A Revoutionary History of Interwar India : Violence, Image, Voice and Text*, London : Hurst and Co. 2015.

Shukla Sanyal. *Revolutionary Pamphlets, Propaganda and the Political Culture in Bengal*. Delhi : Cambridge University Press. 2014.

Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934 : The Politics or Protest*. New Delhi : Oxford University Press. 1987.

Uma Mukherjee. *Two Great Indian Revolutionaries*: *Rash Behari Bose and Jyotindranath Mukherjee*. Culcatta. Firma K. L. M. 1966.

একক ৬ ❒ উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতায় : নিম্নবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ ভূমিকা

৬.২ নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা

৬.৩ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ

৬.৩.১ সাঁওতাল বিদ্রোহ

৬.৩.২ নীল বিদ্রোহ

৬.৩.৩ পাইকা বিদ্রোহ

৬.৩.৪ চুয়াড় বিদ্রোহ

৬.৩.৫ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ

৬.৩.৬ রংপুর বিদ্রোহ

৬.৩.৭ পাবনা বিদ্রোহ

৬.৪ উপসংহার

৬.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৬.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল নিম্নবর্গের মানুষ কীভাবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল তা অনুধাবন করা। এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে পারবে :

বাংলায় ঔপনিবেশিক কালপর্বে নিম্নবর্গের মানুষ ব্রিটিশ শাসন ও উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিবাদী চেতনার বলে বলীয়ান হয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

সমগ্র বাংলা জুড়ে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সচেতন প্রকাশ ঔপনিবেশিক কালপর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিরোধ আন্দোলন শুধু যে ব্রিটিশ শাসনকে প্রশ্ন করেছিল তাই নয়, এই সময়কালে দেশীয় উচ্চবর্গের যে আধিপত্য সমাজে বহুদিন ধরে ছিল তার বিরুদ্ধেও নিম্নবর্গের আন্দোলন নিরন্তর ভাবে প্রশ্ন করেছে।

এই সময়কালে একাধিক বিদ্রোহ হয়েছে, যেমন আদিবাসী-জনজাতি গোষ্ঠীসমূহের বিদ্রোহ, নীল

বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহ। এই প্রতিটি বিদ্রোহ উচ্চবর্গের আধিপত্যকে প্রশ্ন করেছিল, ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং আত্ম-কর্তৃত্বকে স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। আধুনিক বাংলার ইতিহাসে এই দ্বৈরথ, অর্থাৎ দেশী ও বিদেশি উচ্চবর্গের জনগোষ্ঠীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিরোধের লড়াই, আধুনিক বাংলার ইতিহাসের দীর্ঘ-মেয়াদি গতিসূত্র নির্মাণ করেছিল।

৬.১ ভূমিকা

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়, বাংলায় উপনিবেশিক শাসনের সূচনা করেছিল। কোম্পানির শাসন পর্বে আবার তেমনি দেখা গিয়েছিল বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও। প্রতিবাদ উঠে এসেছিল মূলত নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে থেকে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগের আগে পর্যন্ত বাংলার উচ্চবর্গের মানুষ, বিশেষ করে হিন্দু উচ্চ বর্ণের মানুষ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন গড়ে তোলেননি। বরঞ্চ তারা উপনিবেশিক শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

৬.২ নিম্নবর্গ বা সাবঅলটার্নের সংজ্ঞা

এ পর্যায়ে নিম্নবর্গের মানুষদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে বিশদে জানবার আগে সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গ শব্দটির কী অর্থ তা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমাজের নীচু তলার মানুষদের সাধারণত সাবঅলর্টান বলা হয়। ইতিহাস এই সব প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বরকে বোঝবার এবং তুলে ধরবার প্রয়াস আধুনিক ইতিহাস গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। উত্তর-উপনিবেশিকবাদ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সাবঅলটার্ন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। সাবঅলটার্নের সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। সাবঅলটার্ন তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ বা অন্য কোনও ভাবে প্রান্তিক ও শোষিত বর্গকে সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গ বলা যেতে পারে। এইসব শ্রেণির মানুষদের অবস্থান সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির আওতার বাইরে। আন্তনিও গ্রামশির মতে যে সব আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে তাতে সাবঅর্ল্টবান বা নিম্নবর্গের মানুষরা ব্রাত্য। তাই উপনিবেশিক রাজনীতিতে এ ধরনের মানুষদের না থাকে প্রতিনিধিত্ব না শোনা যায় তাদের কণ্ঠস্বর। সোজা কথায় বলতে গেলে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে সমস্ত প্রান্তিক মানুষই সাবঅর্ল্টান কেন্দ্রীভূক্ত। আর তারাই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

৬.৩ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ

ব্রিটিশ ভারতে উপনিবেশিক শাসনের শোষণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ এসেছিল এইসব। নিম্নবর্গের মানুষদের থেকেই কারণ ব্রিটিশ উপনিবেশিককতা অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছিল। ধ্বংস করেছিল তাদের অধিকার, মর্যাদা এবং ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তিকে। তাই উপনিবেশিক শাসন যাদের ক্ষমতা চ্যুত করেছিল, অধিকার

খর্ব করেছিল, সেইসব দেশীয় রাজন্যবর্গ, শাসক শ্রেণির একাংশ, কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায় সর্বপ্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে।

৬.৩.১ সাঁওতাল বিদ্রোহ

ভারতের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি অন্যতম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এই সাঁওতাল বিদ্রোহ যে কার্ল মার্কস (নোটস্ অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি), রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বহু বিখ্যাত লেখদের লেখায় এই বিদ্রোহের কথা বার বার উঠে এসেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ পরবর্তীতে আদিবাসী বিদ্রোহ এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাঁওতাল প্রতিবাদেই নিহিত ছিল "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার "ধারণা যা পরে প্রাতিষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। ১৭৮০-র দশকে দেখা যায় সাঁওতালদের স্থানীয় জমিদার মহাজন, এবং ব্রিটিশ শাসনকর্তা এক যোগে প্রায় বলতে গেলে একরকম জোর করেই রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের নিচের দিকে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য করেন। এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়। সাঁওতালের ওই অঞ্চলের অধিবাসী "পাহাড়ী" আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের রাজমহল পাহাড়ের গারো গভীর অরণ্যের মধ্যে সরিয়ে দিয়ে তাদের বসবাসের জায়গা অধিকার করে নিজেদের বসতি স্থাপন করেন। তাদের বসতি অঞ্চল দামিন-ই-কো বা সাঁওতালদের এলাকা (সাঁওতাল পরগণা) বলে ঘোষিত হয়।

গোড়ার দিকে স্থানীয় জমিদার, মহাজন, এবং ব্রিটিশ শাসক যারা সাঁওতালদের কাছে ছিলেন ডিকু বা বহিরাগত সাঁওতালদের বসতি স্থাপনে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করেন। পরিশ্রম করে জঙ্গল সাফ করে জমিতে কৃষিকাজ শুরু করার পর তারা উপলব্ধি করেন যে জঙ্গল সাফ করে চাষের উপযুক্ত করে তোলার পর এলাকার জমির উপর তারা তাদের অধিকার হারাচ্ছেন। জমির উপর সরকারি করের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। মহাজনেরা কর্জের উপর সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছেন। এবং ধার শোধ করতে না পারলে তাদের জমি দখল করে নিয়েছেন। জমিদাররাও সুযোগ বুঝে সাঁওতালদের এলাকায় (দামিন-ই-কো) নিজেদের অধিকারে প্রচেষ্টা করেছেন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমিদাররাই মহাজন হতেন)। ফলে সাঁওতালরা বুঝতে পারলেন সে তারা ডিকুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। কৃষিকাজ বা অন্যান্য কোন কারণে সাঁওতালরা চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হতেন এবং যখন ঋণ শোধ করতে পারতেন না তখন মহাজনরা সাঁওতালদের জমি দখল করে নিতেন। আস্তে আস্তে দেখা হল প্রচুর জমি সাঁওতালদের হাতে থেকে মহাজন-জমিদারদের দখলে চলে গেছে। আর এই ব্যাপারে সাঁওতালরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানালে ব্রিটিশ অফিসার এবং পুলিশ সর্বদা সাহুকার, মহাজন ও জমিদারদের পক্ষ নিতেন।

ব্রিটিশদের নতুন অরণ্য আইন বনজ সম্পদের উপর বহুযুগ ধরে চলে আসা সাঁওতালদের অধিকারকে খর্ব করেছিলেন। এতে তারা ভীষণভাবে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এছাড়াও ভাগলপুর ও বর্ধমান শাখায় রেল চলাচলের জন্য লাইনপাতার কাজে তাদের বিনা পারিশ্রামিক শ্রম দান করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এর

ফলে বেগারী প্রথায় সাঁওতালদের আবদ্ধ হয়ে গেল।

১৮৫৫-র জুন মাসে সামান্য একটা চুরির স্থানীয় পুলিশ দায়ে বহু সাঁওতালকে গ্রেফতার করে অকথ্য অত্যাচার করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে সাঁওতালরা থানার ইন্সপেক্টরকে হত্যা করেন। ৩০শে জুন ১৮৫৫ সালে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে তীর ধনুক হাতে প্রায় ৬০০০ সাঁওতাল ভাগিনিদিহ তে জড়ো হন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে। সিধু ও কানু নতুন রাজস্ব নীতি তৈরির এবং তাদের চিরাচরিত মূল্যবোধ নির্ভর বিচার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। ধর্মকে ব্যবহার করে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সিধু কানু সমবেত সাঁওতালদের বলেছিলেন যে তারা সিক বোঙ্গার (সাঁওতাল দেবতা বিশেষ) থেকে স্বপ্ন পেয়েছেন ডিকুদের যুদ্ধে হারিয়ে দামিন-ই-কোতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার।

বিদ্রোহী সাঁওতালরা পুলিশ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ওপর আক্রমণ করেন। মহাজন ও সাহেবদের হত্যা তাদের বাড়িঘর, গুদামগুলি লুট করেন। অল্পকালের মধ্যে পুরো দামিন-ই-কোহ অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আশে-পাশের অঞ্চল ধানবাদ, ভাগলপুর, সিংভুম/বীরভূম এও বিদ্রোহ শুরু হয়। ক্রমে বিদ্রোহ অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পায় ৬০০০ থেকে তা বেড়ে দাঁড়িয়ে ৬০,০০০-এ।

বিদ্রেহের ব্যাপকতা বিবেচনা করে ব্রিটিশ শাসকবর্গ সামরিক আইন জারির আদেশ পায়। দশ ব্যাটলিয়ন সৈন্য নিয়ে মেজর বারো বিদ্রোহ দমনে বিফল হন। আরও অনেক বেশি সংখ্যাকে সেনা নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমনের ভার দেন ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার এবং লেফটেনেন্ট থমসনকে। তারা বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে সফল হন। এই বিদ্রোহে সিধু কানু সহ মোট ১৫,০০০ সাঁওতালের মৃত্যু ঘটে। বহু সাঁওতাল গ্রেফতার হন। এইভবেই সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬.৩.২ নীল বিদ্রোহ

১৭১৭ সাল নাগাদ ব্রিটিশরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ বিশেষ করে নীল চাষ শুরু করে। ১৭৮৮ পর্যন্ত এই নীল চাষের বেশির ভাগটাই ছিল বাংলাতে সীমাবদ্ধ। নীলকর সাহেবরা এ সময় থেকে আবাদী জমির উপর মালিকরা যেতে শুরু করেন। আর তাই তখন থেকেই বাংলায় নীল চাষ আরম্ভ হয়। ক্রমে নীল চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের শোষণের মাত্রা বাড়তে থাকে।

নীলচাষের ক্ষেত্রে দু'টো ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। নিজ ব্যবস্থা ও রায়তি ব্যবস্থা। নিজ ব্যবস্থায় ইউরোপীয় জমির মালিকরা নিজেদের জমিতে মজুর ভাড়া করে নিজের ব্যবস্থাপনায় নীলের চাষ করতেন। আর রায়তি ব্যবস্থা নীলকর সাহেবরা রায়ত বা চাষিদের সঙ্গে নীলকরের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হলেন। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল তারা তাদের মোট জমির অন্ততঃ ২৫ ভাগে নীলের চাষ করবেন আর এই জন্য নীলকররা অগ্রিম ঋণ বা দাদন প্রদান করতেন। অনেক সময় তারা দাদন নিতে বাধ্য করতেন। এর ফলে চাষীরা বাধ্য হতেন নীলচাষ করতে। একটা সময়ে চাষীদের উপর ঋণের বোঝা এত বেড়ে গেল যে তারা ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে উঠলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে তারা ঋণের ফাঁধে আটকা পড়ে তারা সর্বশান্ত হয়ে পড়ছেন। যে পরিমাণে দাদন বা অগ্রিম নিতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে সে পরিমাণে নীল উৎপাদন তাদের পক্ষে সম্ভবপর

হচ্ছে না। ফলে ঋণের অঙ্ক বেড়েই চলেছে। ঋণ শোধ করতে চাষিরা অসমর্থ হয়ে পড়ছেন এবং যথানিয়মে তাদের ঋণের দায়ে জমি বিকিয়ে যাচ্ছে। হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ১৮৫৯-১৮৬০ সালে নীল চাষিরা তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

নীল চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। ১৮৫৯ সালের মার্চ মাস নাগাদ বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল। যখন হাজার হাজার নীল চাষে নিযুক্ত কৃষিচাষীরা নীল উৎপাদন করতে অস্বীকার করলেন। হাতের কছে সে যা হাতিয়ার পেলেন তাই নিয়ে তারা নীলকুঠি আক্রমণ ভারতে শুরু করলেন। ঘটিবাটি নিয়ে মহিলারাও বিদ্রোহে শামিল হলেন। অবশ্যই নীলকরেরা বিদ্রোহ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিলেন। নীল চাষীরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে তারা আর দাদন নেবেন না। নীলকর সাহেবদের লাঠিয়ালদের শত অত্যাচারে তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসবেন না।

নীল বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন নদিয়ার দুই বিশ্বাস ভ্রাতা দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন পাবনার কাদের মোল্লা ও মালদার রফিক মণ্ডল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই বিদ্রোহ অংশগ্রহণ করেন।

সর্বপ্রথম নীলচাষ করতে অস্বীকার করেন বাংলার নদিয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা দুই বিশ্বাস ভ্রাতা। এখান থেকে শুরু 'নীল বিদ্রোহে'র। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে নীলকর সাহেবদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে নীল চাষিদের মুখোমুখি লড়াই যেমন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তেমনি আবার নীল বিদ্রোহের পক্ষে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকটা সমর্থন ও সহানুভূতি থাকাবার কারণে ধর্মঘট পালন, আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ। নীলকরদের সামাজিক বয়কট করার মতো প্রতিবাদের পদ্ধতিও গৃহীত হয়েছিল। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের খবর বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হবার ফলে। নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতির জনমত গড়ে উঠেছিল।

বাধ্যতামূলক নীলচাষের প্রতিবাদ কৃষিজীবীদের আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে অনেক বেশী গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। নীল বিদ্রোহের দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করে। কমিশন নীলকরদের দোষী সাব্যস্ত করে। তাদের বিরুদ্ধে চাষীদের অভিযোগ যথার্থ বলে স্বীকার করে এবং জোর করে চাষীদের নীল চাষ বাধ্য করবার জন্য নীলকরদের নিন্দা করে। কমিশন চাষীদের বর্তমান চুক্তির শর্ত পূরণ করতে নির্দেশ দেয়। নীলচাষের বাধ্যবাধ্যকতার থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে এরপর বাংলায় নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

৬.৩.৩ পাইকা বিদ্রোহ

পাইকা বিদ্রোহ মূলত ঘটেছিল ওড়িশাতে কিন্তু বাংলার বর্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে এর প্রভাব পড়েছিল। পাইকাররা ছিল ওড়িশার গজপতি রাজাদের অধীনে সৈন্য দল। মূলত এরা ছিল কৃষিজীবী। কেবল সময়বিশেষে যুদ্ধবিদ্রোহের সময় বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার বারবার রাজ্যে এরা রাজাদের সামরিক সাহায্য দান করতেন। পাইকারা ছিলেন তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পাহাড়ী, বানুয়া এবং ধেনকিয়া। পাহাড়ীদের অস্ত্র ছিল

ঢাল তলোয়ার, বানুয়ারা দূরদূরান্তের সামরিক অভিযানে অংশ নিতেন। আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করতে জানতেন। ধেনকিয়ারা ছিলেন ধনুর্ধর। তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করতেন। ১৮০৩ সালে ওড়িশা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে খুরদার রাজা রাজ্যচ্যুত হন এবং ওনার অধীনস্থ পাইকাদেরও সামরিক দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়। সে সঙ্গে তাদের চাষের জমি বা তারা রাজার অধীনে সামরিক/শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য অংশ পরম্পরায় ভোগ করে আসছিলেন, সেই থেকে তাদের উৎখাত করা হয়। আয়ের উৎস এবং পদমর্যাদা থেকে পাইকারা বঞ্চিত হয়। এই অবস্থা তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল। খুরদার পাইকা দলকে ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; কোম্পানি পাইকাদের উগ্র প্রকৃতির এবং সংগ্রামী মনোভাব বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। "বিষদাঁত" ভেঙ্গে তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ করতে কোম্পানি উদ্যোগী হয়।

খুরদার রাজার প্রাক্তন সেনানায়ক বকশী জগৎবন্ধুর নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়। জগৎবন্ধুর পৈত্রিক জায়গীর কিল্লা ১৮১৪ সালে কোম্পানি অধিকার করলে তিনি চরম আর্থিক দৈন্যদশায় পড়েন। ১৮১৭-এর মার্চ মাসে বিদ্রোহ শুরু হয়। পাইকরা জগবন্ধুর নেতৃত্বে একজোট হন। পাইকারা বিদ্রোহ অপর অপর একজন নেতা ছিলেন রাজা মুকুন্দ দেব। খুরদার শেষ রাজা। ওড়িশার সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সামন্ত প্রধান ও রাজারা, পাইকারা জমিদার এবং সাধারণ মানুষ সকলেই বিদ্রোহ যোগদান করেন। কারিপুর, মৃচপুর, গোলরা, বলরামপুর, বুনাকেরা এবং রূপাসার জমিদাররা পাইকাদের সমর্থন করেন। বানাপুর এবং খুরদাতে শুরু হয়ে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ওড়িশার অন্যান্য স্থানে যেমন—পুরী, পিপালি, কটক ও কণিকা, কুরাঙ্গ, পাট্টা মুণ্ডাই মতো গ্রামাঞ্চলে। মীর হায়দার আলি ছিলেন একজন অন্যতম মুসলমান বিদ্রোহী নেতা। নানা জায়গায় পাইকাদের সঙ্গে কোম্পানির সশস্ত্র লড়াই হয়েছিল। কটকের লড়াইতে কোম্পানির ফৌজ পাইকাদের পরাস্ত করে। ১৮১৭ সালের মে মাসে শেষ হওয়ার আগেই ওড়িশা রাজ্যে কোম্পানির শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৬.৩.৪ চুয়াড় বিদ্রোহ

১৭৭১ থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে যে সব কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল চুয়াড় বিদ্রোহ তার মধ্যে একটা। এই বিদ্রোহ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চল ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল। কোম্পানির প্রজা নিপীড়নকারী রাজস্ব নীতির ফলে সাধারণ মানুষ পড়েছিলেন চরম আর্থিক সংকটে। আর্থিক কারণে জীবন ধারণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয় চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। চুয়াড় বিদ্রোহকে অনেকে জঙ্গল বিদ্রোহও বলে।

চুয়াড় বিদ্রোহের প্রধান কারণ কোম্পানির বর্ধিতহারে রাজস্ব দাবি। জঙ্গলমহল অবাদী জমির পরিমাণ কম তাই কৃষি উৎপাদনের পরিমাণও কম, ফলে এই অঞ্চলের জমিদারদের বর্ধিত হারে রাজস্ব সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ধলভূমে রাজা এবং ঘাটশিলার জমিদার জগন্নাথ সিংহ বিদ্রোহের সূচনা করেন। হাজার হাজার চুয়াড় এই বিদ্রোহে শামিল হয়েছিলেন। এরপর ১৭৭১ সালে ধাদকার শ্যাম গনজ, কালিয়ালের সুবল সিং এবং দুবরাজ-চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। প্রথম বিদ্রোহ দমনে অসফল

হলেও দ্বিতীয়বারের বিদ্রোহ সহজেই ইংরেজরা দমন করতে সমর্থ হন। ১৭৯৮ সালের বিদ্রোহের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন দুর্জন বা দুর্জল সিংহ। দুর্জন সিংহ ছিলেন রায়পুরের জমিদার। কোম্পানির নতুন রাজস্বনীতি (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) প্রণয়নের পর নির্ধারিত পরিমাণে খাজনা জমা না করতে পারায় তার জমিদারি নিলামে উঠে। নিলাম রুখতে দুর্জন সিংয়ের সমর্থন প্রায় ১৫০০ চুয়ার রায়পুরে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। হিংসা দিয়েই ইংরেজরাও চুয়াড় বিদ্রোহ দমন করেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত শাসকদের অধীনে একদা কর্মরত পাইকারা যারা কর্ম এবং জমি দুই হারিয়েছিলেন। চুয়ার বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম বারাভূমের রাজার ভাই মাধব সিংহ, জুরিয়ার জমিদার রাজা মোহন সিংহ এবং দলমার লচমন সিংহ। চুয়াড় বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সকলেই কোনও না কোনও ভাবে জমি ও কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিক এই জনজাতির বিদ্রোহকে চুয়ার বিদ্রোহ বলতে নারাজ। চুয়াড়—এই অবমাননাকর শব্দটি ওই জনজাতির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকরা প্রয়োগ করতেন। এই বিদ্রোহ তাই চুয়াড় বিদ্রোহ নয় জঙ্গলমহল বিদ্রোহ বলাই সমীচীন।

স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ যে সব জমিদারদের উত্থান হয়েছিল) ইংরেজ শাসক চুয়াড় বিদ্রোহ দমনে সফল হয়। চুয়াড় বিদ্রোহে দু'শোজন বিদ্রোহীর মৃত্যু ঘটে।

৬.৩.৫ সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলমান ফকির (সুফি) ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের (যোগী) সম্মিলিত সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৬০-এ। চার দশক ধরে এই বিদ্রোহ চলতে থাকে। বিদ্রোহের সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে কোম্পানির শাসন, বিশেষ করে ফকির সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রায় প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছিল। তাই তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

বিদ্রোহী ফকিররা ছিলেন মাদারিয়া তারিকা সুফি সম্প্রদায় ভুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বাংলায় এই সুফি সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এদের গুরু ছিলেন শাহ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানা। অন্য দিকে সন্ন্যাসীরা ছিলেন বেদান্তিক যোগী হিন্দু। গিরি ও পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন এরা। এই সন্ন্যাসীরা সর্বদা সশস্ত্র থাকতেন। সুফি ফকিররা আশ্রয় ছিল খানকাগুলোতে আর হিন্দু সন্ন্যাসীরা থাকতেন আখড়াতে। এই দুই সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আচার-আচরণ মিল থাকাতে সহজেই এরা একজোট হয়ে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ফকির সন্ন্যাসীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠক ও নেতার নাম মজনু শাহ। ইনি ছিলেন মাদারিয়া গোষ্ঠীর ফকির। আঠারো শতকের মধ্য ভাগে শাহসুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানার মৃত্যুর পর বিহার অঞ্চলের মাদারিয়ার সুফি সম্প্রদায়ের নেতা হন মজনু শাহ। তাঁর সুফি সহযোগী ছিলেন মুসা শাহ, আলি শাহ। মজনু শাহের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ভবানী পাঠক নামে এক ভোজপুরী ব্রাহ্মণের। ভবানী পাঠক ছিলেন সন্ন্যাসী দলের নেতা। দেবী চৌধুরানী নামে এক ছোটখাটো জমিদারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ভবানী

পাঠকের। ১৭৯০ থেকে ক্রমশ ফকির সন্ন্যাসীদের আন্দোলন স্তিমিত হতে শুরু করে।

৬.৩.৬ রংপুর বিদ্রোহ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৃষকদের শোষণ নিপীড়ণ করে সর্বোচ্চ খাজনা আদায়। কোম্পানি খাজনা আদায়ের ভার একসময়ে ছিল ইজারাদারদের হাতে। হয় একবছর বা পাঁচবছরের জন্য কোম্পানি ইজারাদারদের সাথে চুক্তি করত। নীলামে নির্দিষ্ট জমির থেকে যে যত বেশি পরিমাণে খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন। কোম্পানি সেই ব্যক্তিকে খাজনা আদায়ের জন্য জমির ইজারা নিতেন। ফলে ইজারাদারদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিপুল পরিমাণে খাজনা আদায়ের। চাষবাসের উন্নতি, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি এসব উপেক্ষা করে তারা মনোযোগী ছিল শোষণ নিপীড়ন করে কৃষিক্ষেত্রে থেকে রাজত্ব আদয়ে। যাতে কোম্পানির তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমা দিয়েও নিজের জন্য যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত থাকে।

রাজস্ব আদায় পদ্ধতি নিয়ে এ সময়ে কোম্পানি সরকারের নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে কৃষি অর্থনীতিতে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দারিদ্র্য গ্রাস করেছিল কৃষিনির্ভর গ্রাম বাংলার মানুষকে। অতিরিক্ত করের বোঝায় জর্জরিত মানুষের কর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। জমিদারদের আর্থিক অবস্থা সাঙ্গীন হয়ে উঠেছিল ইজারাদারদের খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়নে। খাজনা আদায়ে জমিদারী হারানোর আশঙ্কাও তাদের ছিল। রংপুর ও দিনাজপুরের ইজারাদার দেবী সিং খাজনা আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর এবং নির্মম। দেবী সিং-এর উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে জমিদার ও কৃষকরা কোম্পানির দরবারে খাজনা মকুবের আর্জি জানান। কোনো সুরহা না হওয়াতে রংপুরের মানুষ বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন।

রংপুর বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৮৩-র ১৮ই জানুয়ারি। কৃষক ও স্থানীয় জমিদাররা রংপুরের কাকিনা, কাজীর হাট এবং তেপা নিজেদের অধীনে নিয়ে আসেন। বিদ্রোহী বাহিনী আদালতে হামলা করে লুটপাট করে এবং কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্ত করে। পুরো পাঁচ সপ্তাহ উপরোক্ত এই সব অঞ্চল বিদ্রৌহদের অধীনে ছিল। সেখানে বিদ্রোহীরা একজন নবাব নিযুক্ত করে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন কেনা সরকার। বিদ্রোহী সরকার কোম্পানিকে কর না দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে। ক্রমে রংপুর থেকে দিনাজপুরের বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পরে। অবশেষে ব্রিটিশরা বিদ্রোহ দমনে সফল হন। বিদ্রোহ অংশগ্রহণকারী বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই বিদ্রোহের ফালে ইজারাদারি ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকার এ ব্যাপারে কিছু সংস্কার সাধন করে। চিরস্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কোম্পানির সরকার।

৬.৩.৭ পাবনা বিদ্রোহ

পাবনায় প্রতিবাদ আন্দোলন ছিল জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহের উৎসস্থল ছিল ইউসুফ শাহী পরগনা যা বর্তমানে বৃহত্তর পাবনার সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। জমিদাররা নিয়মিতভাবে প্রজাদের উপর আইন বহির্ভূত অর্থ সংগ্রহের জন্য অত্যাচার চালাতেন নানা ধরনের অবৈধ খাজনা জমিদাররা আদায়

করতেন প্রজাদের শোষণ করে। উরকাণ্ডী গ্রামের ৪৩ জন বড় রায়তদের বিরুদ্ধে জমিদারদের দায় করা মোকদ্দমা ছিল পাবনা বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ।

রায়তরা বাড়তি খাজনা দিতে অস্বীকার করেন কারণ তারা মনে করেন জমিদারের চাপানো বাড়তি খাজনা আইন বহির্ভূত। তাই নির্ধারিত পরিমাণের খাজনা তারা কেটে জমা করেন।

অন্যদিকে জমিদাররা নথিপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে এক দশক ধরে রায়তরা বর্ধিত হারেই খাজনা দিয়ে আসছেন। ১৮৭৩ এর এপ্রিল মাসে শাহজাদপুর আদালতের রায় সংশোধন করেন এই মর্মে যে জমিদারদের জমা দেওয়া নথিপত্র জাল। রায়তরা এই জয়কে নৈতিক জয়ের আখ্যা দেন। পাবনা রায়তস লিগ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালের মে মাসে। লিগের প্রভাবে ক্রমশ পুরো পাবনা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। লিগের উল্লেখযোগ্য সদস্যরা ছিলেন ঈশান চন্দ্র রায় বা ঈশান রাজা, কড়ি মোল্লা এবং শম্ভু নাথ পাল। তারা নিজেদের অধীনস্থ পরগনাগুলিকে জমিদারের শাসনমুক্ত বলে ঘোষণা করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি তারা "বিদ্রোহী সৈন্যদল" গঠন করেছিলেন জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে। পাবনা আন্দোলন শুরু হয়েছিল আইনি লড়াই দিয়ে, কিন্তু লিগের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকলাপ হিংসাত্মক হয়ে উঠতে থাকে। জনজীবন শান্তি ব্যহত হচ্ছে এই অজুহাতে সরকার হস্তক্ষেপ করে। ১৮৭৩সালের ৪ঠা জুলাই বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে আদেশ দেন। ১৮৭৩-৭৪ নাগাদ পুলিশী তৎপরতায় এবং দুর্ভিক্ষের কারণে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।

৬.৪ উপসংহার

নিম্নবর্গের মানুষরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। উপনিবেশিক শাসন তাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তাই তারা বিদ্রোহের ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি অত্যন্ত নির্দয় নির্মম ভাবে এইসব নিম্নবর্গের মানুষের বিদ্রোহ দমন করেন। বেশির ভাগ বিদ্রোহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের পর গান্ধীর নেতৃত্ব প্রচেষ্টা হয়েছিল নিম্নবর্গের মানুষদের অহিংসার আদর্শে দীক্ষিত করে জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার তাদের অন্তর্ভুক্ত করবার। এতে জাতীয় আন্দোলন একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ পাবে এবং সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরও জোরালো সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শের মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারেনি। নিম্নবর্গের মানুষ তাদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর বজায় রাখতে পেরেছেন।

৬.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. নীল বিদ্রোহের কারণগুলি কী?

২. নিম্নবর্গের মানুষ কেন উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল?

৩. ব্রিটিশ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

৪. পাবনা বিদ্রোহের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. রংপুর বিদ্রোহের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Shekhar Bandyopadhyay. *From Plassey to Partition and After.* New Delhi.

Sumit Sarker. *Modern India. 1885-1947.* New Delhi.

Bipan Chandra and Others. *India's Struggle for Independence.* 1857-1944. New Delhi.

Ishita Banerjee Dube. *A History of Modern India.* Cambridge.

Ranajit Guha (ed.). *Subaltern Studies, vol. 1.* New Delhi.

Narahari Kaviraj. *A Peaseant Uprining in Bengal.* 1783. New Delhi.

নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা,* কলকাতা।

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা।

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম,* কলকাতা।

গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান,* কলকাতা।

পর্যায়-৩

রাজনীতির বিকাশ : অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে

একক ৭ ❒ সাম্প্রদায়িকতাবাদ অথবা “ভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ”?—বিতর্ক

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ ভূমিকা

৭.২ সম্প্রদায় ও জাতি

৭.৩ স্বদেশি আন্দোলন এবং “ভিন্ন ধরনের জাতীয়াতাবাদ” ও তার প্রভাব

৭.৪ মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয়তাবাদ ও তার উদ্ভব

৭.৫ খিলাফৎ আন্দোলন এবং সঙ্কটের সূচনা

৭.৬ কংগ্রেসের দাবি—অভিন্ন জাতীয়তাবাদ ও তার প্রভাব

৭.৭ বেঙ্গল প্যাক্ট

৭.৮ মুসলমান সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধি—হিন্দুদের উদ্বেগ

৭.৯ মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদ

৭.১০ উপসংহার

৭.১১ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৭.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়ের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীর যা শিখবেন :

- ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক চেতনার টানাপোড়েন।
- উপনিবেশিক বাংলায় হিন্দু মুসলমান দু’জনের কাছেই আঞ্চলিক পরিচিতি গড়ে তোলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
- চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাবিত বেঙ্গল প্যাক্টের তাৎপর্য

৭.১ ভূমিকা

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ থেকে ১৯৪৭ সালের বিভাজন—এই দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা এক বিতর্কের মধ্য থেকে বাংলা অর্জন করেছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। কীভাবে একটি কল্পিত সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপরেখায় আবদ্ধ করে জাতি নামে অবহিত করা যায় এবং কী কী পন্থা বা প্রক্রিয়ায় তা সম্ভব হতে পারে এইসব বিষয় ছিল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। কল্পিত কিন্তু যেহেতু এই রাজনৈতিক সম্প্রদায় কোনও একটি সূত্রে

গঠিত ছিল না বরঞ্চ বিধিবতা, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। ভিন্নতা ছিল এই কল্পিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বা জাতির প্রধান গুণ। এক জাতির বহু কণ্ঠস্বর বা বহু জাতীয়তাবাদ ছিল স্বাভাবিক। পশ্চিমি একমাত্রিক জাতীয়তাবাদের ধারণার থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা ছিল আলাদা। গতানুগতিক জাতীয়তাবাদীরা যতই সমালোচনা করুন না কেন কল্পিত যোগসূত্রে বিবিধকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে ওঠা এক জাতি জাতীয়তাবাদকে কোনোভাবেই অজাতীয়তাবাদ বলে খারিজ করা যাবে না। গবেষণায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব ছিল, ঠিক যেমন ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও।

৭.২ সম্প্রদায় ও জাতি

সম্প্রদায় মানেই যে সাম্প্রদায়িক মতবাদ অথবা তা জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী—এই বিবেচনা অনেকের কাছেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আয়েশা জালালের মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় স্বতন্ত্র বা ভিন্নতা-কেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর আলোচনায় ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মবিশ্বাস আর জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্প্রদায়িকতাবাদের দ্বন্দ্ব অতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলোকে কোন মতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। সেমন্তী ঘোষ তাঁর বই *Different Nationalisms : Bengal 1905-1947*-এ দাবি করেছেন আদর্শ পরিস্থিতি তখনই তৈরি সম্ভব যখন সাম্প্রদায়িক সচেতনতা জাতীয়তাবোধের সচেতনাকে ছাপিয়ে যাবে না বা উল্টোদিকে জাতীয়তাবাদী সচেনতাও সম্প্রদায়গত অনুভূতিকে পুরোপুরি গ্রাস করবে না। উপনিবেশিক বাংলায় বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান উভয়েরই কল্পিত জাতি চিত্র রূপায়ণ এই অঞ্চলে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলায় বাস করা ভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যেহেতু ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য ছিল তাই একই অঞ্চলে হলেও তাদের জীবনযাত্রার প্রকাশ ছিল একে অপরের থেকে আলাদা। এর ফলে বাংলায় সমান্তরালভাবে বহুজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বলে সেমন্তী ঘোষ মনে করেন। সংস্কৃতি এবং ভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক একতার মনোভাব—এই বিশেষত্বটাকেই সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে ফেলেছিল অভিন্ন সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ।

কেবল ধর্মের ভিত্তিতে কিন্তু বাংলার মুসলমানদের পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মুসলমান পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং তা এত রকমের অন্তর্বিরোধ পরিপূর্ণ ছিল যে, তার উপর খুব সহজভাবে সাম্প্রদায়িকতা ছাপ লাগানো অসম্ভব। তাই শুধু সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম ভারত ভাগের জন্য দায়ী একথা পুরোপুরি সঠিক নয়। বাঙালি মুসলমানরা কিন্তু অন্যান্য আঞ্চলিক এবং বৃহত্তর জাতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করেনি। দুর্ভাগ্যবশত ইতিহাসের এই দৃষ্টিকোণকে তেমনভাবে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়নি বলে সেমন্তী ঘোষ মনে করেন।

৭.৩ স্বদেশি আন্দোলন এবং "ভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ" ও তার প্রভাব

কার্জনের প্রস্তাবিত বাংলা বিভাজনের প্রতিরোধে ১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়। বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উঠে এসেছিল। তার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একে অপরের হাতে রাখি বাঁধার পরিকল্পনা করেছিলেন তা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছিল। কারণ মেশিনে তৈরি ব্রিটিশ পণ্য ছিল স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্য। অন্যদিকে, দেশে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ছিল বেশি। তাই দেশজ পণ্য বাজারে বিক্রি এবং বাজার থেকে দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দেশীয় পণ্যক্রয় দুটোতেই অসুবিধা দেখা দিল। স্বদেশি যুগের পাটভূমিকায় লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে এই হতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক বয়কটের কর্মসূচিকে ঘিরে আঞ্চলিক উত্তেজক পরিস্থিতি শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্বেই জন্ম দিয়েছিল। এই সময়ের মুসলমান লেখকদের লেখাতেও প্রাধান্য পেয়েছে স্বদেশি আন্দোলনের কারণে স্থানীয় মানুষের সংকট। বাংলা বিভাজিত হবার আগে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে মুসলমান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই স্বদেশি ও বয়কটের রাজনীতিতে সবচেয়ে অসুবিধা পড়েছিল তারা।

এই একই কারণে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এই আন্দোলন সমর্থন করেনি। উল্লেখযোগ্য এই যে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বরিশাল জেলা সম্মেলন এর প্রতিফলন ঘটেছে। সম্মেলনে নমঃশূদ্র প্রতিনিধি একজনও হাজির ছিলেন না। স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলনের বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব কিন্তু উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের উপর তেমন ভাবে পড়েনি। স্বদেশ প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমাজের এই শ্রেণির মানুষ সে সময় শিল্পকলায়, চিত্রে তাদের শিল্পশৈলী প্রকাশ করেছিলেন। ছবিতে তুলে ধরেছিল "জাতি"র প্রতীক রূপ কল্পনা। জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে লিখেছিলেন গান, রচনা করেছিলেন সাহিত্য, কবিতা, যাতে প্রতিফলিত হয়েছিল বঙ্গজননী, স্পষ্ট হয়েছিল বাংলা মাতৃকা। আর এই মাতৃরূপের সঙ্গে জাতির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তার বন্দেমাতরম্ গানে যে মাতৃ বন্দনা করেছিলেন তা অচিরেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে পরিণত হল।

প্রতাপাদিত্যকে স্মরণ করা শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করবার ফলে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা শুরু হলো সেই চর্চায় অমুসলমানরা একাত্মবোধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। দেশকে মাতৃমূর্তির রূপ দিয়ে মূর্তির অর্চনা ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতি বিরোধী তাই মুসলমান ধীরে ধীরে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে শুরু করলেন। ১৯০৭ সালের পর কংগ্রেসের চরমপন্থীর উত্থানে ও কংগ্রেসের বাইরে বিপ্লবীদের উত্থানের ফলে জাতীয়তাবাদে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেল যার ফলে মুসলমানরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন বলে চিহ্নিত করতে লাগলেন।

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের (All India Muslim League) প্রতিষ্ঠাকে ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে ধরা হয়। কিন্তু অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের আগে যে এই একই বছরে

ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল সম্মেলন হয়। আপাতদৃষ্টিতে তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা হলেও আসলে সেই সম্মেলনের বিতর্কের মধ্যে থেকেই মুসলমান মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। ভাষা নিয়ে বিতর্কের মূলে ছিল বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে—বাংলা না উর্দু? বাঙালি মুসলমানরা কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উর্দুকেই বেছে নিয়েছিল।

১৯০৯ এর মর্লে-মিন্টো সংস্কার বিধি (Indian Council Act) বাংলার আইনসভাতে মুসলমানদের বেসরকারি সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করে। জাতীয়তাবাদীরা এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিদেশি শাসন ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গের আদেশ রদ করা হয়। এর ফলে হিন্দুরা স্বস্তি পেলেও মুসলমান অভিজাত শ্রেণি এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকা মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কারণ মফস্বল শহরগুলাতেও বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত পেশাদারি মুসলমান ব্যক্তিদের রোজগারের টান পড়বে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের সুযোগও কমে যাবে এই ভয়ও তারা পেয়েছিল। সৈয়দ আলী চৌধুরী ও ফজলুল হককে নবাব সলিমুল্লাহ খান ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে ভাইসরয়ের কাছে দরবার করতে পাঠিয়েছিলেন নতুন স্বাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার আর্জি নিয়ে। আবেদন ছিল পূর্ব বাংলায় বঞ্চিত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার। কিন্তু বাঙালি মুসলমান নেতা যেমন আব্দুর রসুল ও আব্দুল্লাহ খান সুরাবর্দি অনেকদিন ধরেই চিন্তা করেছিলেন বাংলার মুসলমানদের জন্য একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরি করা যায় কিনা। কারণ লিগের কর্মসূচি ছিল সীমিত। ফলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ হলে বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা কতটা কার্যকরী হবে এই বিষয়ে এইসব নেতাদের সন্দেহ ছিল। নবাব সলিমুল্লাহের মধ্যস্থতায় ১৯১২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ সম্মেলনে এই সংকটের সমাধান হয়। ১৯১৬ সালে লখনউ চুক্তির ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদি একটি সমঝোতা হয়। মুসলিমদের পৃথক নির্বাচন মণ্ডলের দাবিও লখনউ চুক্তিতে মেনে নেওয়া হয়।

৭.৫ খিলাফৎ আন্দোলন : সংকটের সূচনা

গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক অভূতপূর্ব সুযোগ ঘটেছিল। ইসলামি দুনিয়ার সমস্যা সমাধানে গান্ধীর প্রচেষ্টা ছিল সর্বভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা। অবশ্য কিছু আভ্যন্তরীণ কলহ বিশেষত তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে এবং খিলাফৎ ব্যবস্থার পতনের কারণে ১৯২৪ সালের আগেই খিলাফৎ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে বাংলার মুসলমানদের পরিচিতি নির্মাণে খিলাফৎ আন্দোলনের অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসাহী উলেমারা ধর্মীয় প্রতীকের প্রকাশ্য ব্যবহার শুরু করলে তা ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামিক পরিচিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে সফল হয়।

৭.৬ কংগ্রেসের দাবি—অভিন্ন জাতীয়তাবাদ ও তার প্রভাব

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গঠনের যে প্রচেষ্টা খিলাফৎ আন্দোলনের সময় গান্ধীর উদ্যোগ হয়েছিল তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বরঞ্চ বহুকারণের জন্য নাটকীয়ভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, উনিশ শতকের বিশের দশকে কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদের ধারণার পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। ধর্মবিশ্বাস মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার অনৈতিক। জওহরলাল নেহরুর মত তরুণ কংগ্রেস নেতারা জনসমক্ষে তাদের বক্তৃতায় ভারতীয় জাতির ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান তুলে ধরতে লাগলেন। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রচারিত হল যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের চেয়ে বড় জাতি স্বার্থ।

জেফ্রেলট তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন, কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে দুটি বিপরীত মেরুর চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। একটি ভাবধারা প্রাধান্য পেয়েছে সম্মিলিত সংস্কৃতির আঁদারে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী ভাবনা। অপর জাতীয়তাবাদী ভাবনায় হিন্দু জাতিকে প্রাধান্য এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদমন স্পষ্ট। মুশকিল হল প্রথম চিন্তাধারায় বিশ্বাসী কংগ্রেসীরা প্রায়শই দ্বিতীয় চিন্তাধারার ধারকদের কাছে পরাস্ত হতেন। ফলে কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রকাশ পেত দ্বিতীয় চিন্তাধারা। তাই মুসলমানরাও কংগ্রেসীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে ওঠে।

আয়েশা জালাল দেখিয়েছেন যে, এই সময়ে মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো যা সাংস্কৃতিক বিবিধতার সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম। মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ প্রাথমিক ভাবে কিন্তু অখণ্ড ভারতের বিপক্ষে ছিল না। তাদের বিরোধিতা ছিল কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্যে বিরুদ্ধে। মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ খণ্ডিত সার্বভৌমত্বে রাজি ছিল বলে কোনও কোনও চিন্তাবিদ মনে করেন। অনেক মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ছিলেন। বহু ধর্মের মিলনক্ষেত্র ভারতবর্ষ—এই আদর্শ তারা সমর্থন করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধরনের মুসলমান নেতারা কংগ্রেসে কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলেন। কিচলুর মতো নেতারা যারা একসময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমর্থক ছিলেন, তারাও অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়ার পর যখন কংগ্রেস সাংবিধানিক পথ নিলেন তখন সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। স্বরাজ্য দলের সদস্যদের সঙ্গে জিন্নাহর কাজ করতে আপত্তি ছিল। তিনি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন লখনউ চুক্তি দিয়ে পুনরায় আলেচনায় বসতে। কিন্তু এই ভাবনা ফলপ্রস্থ হয়নি।

৭.৭ বেঙ্গল প্যাক্ট

স্বরাজ্য দলের অসামান্য রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে ছিল শক্তিশালী মুসলমান সমর্থন। ১৯২৪ সালে নাগাদ স্বরাজ্য দলের বিপুল প্রভাব ছিল কাউন্সিল এবং কলকাতা কর্পোরেশনে। সামাজিক ব্যবধানের বেড়া লঙ্ঘন করে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলা—এ সবটাই ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের কৃতিত্ব। চিত্তরঞ্জন দাশের আগে বা পরে এমন কোনও বাংলার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না যার প্রতি মুসলমানের

এতটাই আস্থা ছিল। তাঁর মতো মুসলমান জনগণের বিপুল সমর্থনও কোনো রাজনৈতিক নেতা পাননি। তাঁর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাদার হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সমাজের মানুষ—সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে একযোগে মিলিতভাবে রাজনৈতিক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। হিন্দু ভদ্রলোক, গ্রামীণ নেতা, শ্রমিক নেতা, বিপ্লবী এবং বিশেষ করে ব্যবসায়ী মুসলমান এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক কাজে নিয়োজিত মুসলমান ব্যক্তিরা চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

১৯২৩ এর ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর নির্ভর করে একটি ঐতিহাসিক যৌথ অংশীদারি প্রকল্প গঠনের প্রস্তাব রাখেন। সুষ্ঠুভাবে পুরসভার কার্যনির্বাহ ও কর্মের দায়িত্ব পালনের জন্য চিত্তরঞ্জন এই ঐক্যভিত্তিক অংশীদারিতার প্রস্তাবটির উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় বেঙ্গল প্যাক্ট। এতে বলা হয়, বাংলার আইনসভার প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করা হবে জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে। পুর সংগঠনগুলোতে প্রধানত জেলাগুলোতে প্রস্তাবিত অনুপাত ছিল ৬০ : ৪০। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংখ্যা ৬০% এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংখ্যা ৪০%। এছাড়াও ৫৫% সরকারি চাকরি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকবে।

বেঙ্গল প্যাক্টের তীব্র সমালোচনায় মুখর হল হিন্দু বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়রা। পেশাদার নাগরিক মুসলমানরা বেঙ্গল প্যাক্টকে স্বাগত জানালেন। দাশের রাজনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটি আশাবাদী চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তা হল একটি জাতির আদর্শ এবং লক্ষ্য বিবিধতা অস্বীকার করা নয় উল্টে বিবিধতা স্বীকার করে একতা সৃষ্টি। *বন্দেমাতরম্, হিন্দুস্থানী, বেঙ্গলি* এবং অতি অবশ্যই দাশের সংবাদপত্র *ফরওয়ার্ড* এই বেঙ্গল প্যাক্টকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করল সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়ার জন্য। লখনউ চুক্তির অসম শর্ত যখন বাঙালি মুসলমানদের সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত করল তখন বেঙ্গল প্যাক্টের প্রস্তাবিত ঘোষণার প্রতিবাদ হিসেবে বাংলার দুই সম্প্রদায় জনসংখ্যার নিরিখে দুই ভাগে বিভাজিত হয়ে উঠল।

৭.৮ মুসলমান সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি : হিন্দুদের উদ্বেগ

সেমন্তী ঘোষের মতে, বিংশ শতকের তৃতীয় ভাগে হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক আলোচনা/বিতর্কের মধ্যে থেকে যে তথ্য উঠে এসেছিল তা হল হিন্দুদের পিছনে ফেলে মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করে, হিন্দুদের মধ্যে আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়া। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু নিম্নবর্গের হিন্দুরা প্রচুর সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যেতে শুরু করেছে, সেহেতু অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে ওঠার একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরে সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা আত্মশক্তি বৃদ্ধির প্রয়সী হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন যে, এ সময়ে মতিলাল নেহরুর মতো স্বরাজ্য দলের বষীয়ান নেতাও কীভাবে কংগ্রেসে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দু মহাসভার প্রাধান্য বাড়ছিল। তাদের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করবার দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল। ১৯২৬ সালে আশ্চর্যের বিষয় বাংলায়

কংগ্রেস একটিও মুসলিম প্রার্থী দেয়নি। অন্যান্য যেসব অঞ্চলে কংগ্রেস মুসলমান প্রার্থী দিয়েছিল সব জায়গায় মুসলমান প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছিল।

৭.৯ মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদ

কংগ্রেস রাজনীতি থেকে মুসলমানরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তার প্রতিফলন দেখা যায় আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে তাদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যদিও তখনও মুসলমানরা রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের সংগঠিত করে তোলেননি। এমনকি বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষ দিকেও দেখা যায় মুসলমান রাজনীতি, প্রাদেশিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বাংলায় এবং পাঞ্জাবে যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেখানে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো এক, অন্যান্য প্রদেশে যেখানে তারা সংখ্যালঘু ছিল সেখানকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো ভিন্ন।

এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-পজা পার্টি মুসলমান এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুর কৃষকদের মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা প্রসারিত করে তাদের শ্রেণি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই নিয়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৩৭-এর নির্বাচন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমান ভোট প্রচুর পেয়েছিল। অপেক্ষাকৃতভাবে সারা ভারতে মুসলিম লিগের ফল একেবারেই ভালো হয়নি। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রচুর ভোটে জয়লাভ করেছিল যা কংগ্রেসের মধ্যে এমন একটা অহমিকা ভাব সৃষ্টি করেছিল, যে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের এই মনোভাব দেখে মরিয়া হয়ে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলো জিন্নাহ্-র নেতৃত্বে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠা মুসলিম লিগের অধীনে একত্রিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে মুসলিম লিগ প্রকাশ্যে দাবি করে যে, হিন্দু-মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি। সে সময় পাকিস্তান প্রসঙ্গ যদিও ওঠেনি, তবুও সে বক্তব্যে ভবিষ্যতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র এই ভাবনা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মুসলমানরা পৃথক জাতি এই ঘোষণা থেকে মুসলমানদের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—এই দীর্ঘ ইতিহাস তিক্ততায় ভরা।

৭.১০ উপসংহার

কুখ্যাত দুই জাতিতত্ত্বের (দ্বিজাতি তত্ত্ব) প্রবক্তারা ধর্ম ছাড়া আর কোনো পরিচিতিকে জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে মানতে নারাজ ছিলেন। ঠিক তেমনি "এক অভিন্ন জাতি"র প্রবক্তারা এক জাতির বহু কণ্ঠস্বর মানতে অস্বীকার করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবুও বলা যায় যে অন্যান্য পরিচিতি যেমন আঞ্চলিকতার বোধ বা ধর্ম বিশ্বাস সবসময় জাতীয়াতাবদের বিকাশের পরিপন্থী হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ তা জাতীয়তাবাদের অভিজ্ঞতাকে আরও স্পষ্ট রূপ নিতে সময় সময় তারা সহযোগিতা করে।

- গবেষণায় উঠে এসেছে ভারতে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাতেও বহুত্ববাদী রাজনৈতিক চিন্তার অস্তিত্ব ছিল।

- উপনিবেশিক শাসনাধীনে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই যে 'কল্পিত জাতি' (Benediet Anderson কথিত 'Imagined Community') ভাবনা গড়ে উঠেছিল তাতে বাংলার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- স্বদেশিযুগে সুলভ মূল্যের বিলাতিপণ্য বয়কটের জন্য গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের যে বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল সে কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে লিখেছিলেন।
- বাংলায় মুসলমানদের চেতনা নির্মাণে খিলাফৎ আন্দোলনের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
- কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী চিন্তা নিয়ে বাঙালি মুসলমানরা প্রশ্ন তুলেছিলেন।
- চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টির সমর্থনে ছিল মুসলমানরা। চিত্তরঞ্জন দাশ "বেঙ্গল প্যাক্ট"-এর রূপকার ছিলেন।
- বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল বাংলায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার একটি সাহসী পদক্ষেপ।

৭.১১ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের "কল্পিত জাতি" ভাবনায় বাংলা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

২. স্বদেশি আন্দোলনে সমাজের নিচুতলার মানুষরা কেন বয়কট নীতির বিরোধিতা করেছিল?

৩. অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ কী কী উপায়ে আঞ্চলিক মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কণ্ঠরোধ করেছিল?

৪. বাংলার মুসলমানদের পরিচিতি নির্মাণে খিলাফৎ আন্দোলনের কী অবদান ছিল?

৫. কংগ্রেসের 'অভিন্ন জাতীয়তাবাদ' কি ন্যায়সঙ্গত ছিল? কারণ সহ উত্তর লিখুন।

৬. রক্ষণশীল হিন্দুরা কেন মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন?

৭. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ কেন মুসলমান সমর্থন পায়নি?

৭.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed,Kamruddin—*Bengali Madhyabilter Atmbikas.* Dhaka : Naoroj Kitabislan. 1975

Bandyapadhyay, Shekhar—*From Plassey to Parition and After*. Delhi. Orient Language Pub. Ltd. 2004. (Bangali translation available)

Ghsosh. Semanti—*Different Nationalisms : Bengal, 1905-1947.* New Delhi. OUP-2017.

Jaffrelot. Christophe—*The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990* London : Hurst and Company

Jalal. Ayesha—*The Sole Spolesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan*. Cambridge. Cambridge University Press.

Pandey. Gyanendra—*The Ascendency of the Congress in Uttar Pradesh. 192-34 : The Imperfact Mobilisatim*. Delhi. OUP. 1978.

Pandey, Gyanendra—*'The Indian Nation in 1942'. in The Indian Nation in 1942*. ed. ed. G. Pandey. Cancutta : K. P. Bagchi and Co.

Rashid, Muhammad Abdur—Mussalmander Arthankat O Tar Protikar, Calcutta 1936.

Shil. Kedarrath—*Swaraj-Sadhanay Narasunder Samaj*. Sirajgang. 1925.

Siddiqi, AbuBakar—*Khilafat Andolan Paddhati*. Banisal. 1921.

Sobhan, Abdus—*Hindu Mussalman*. Dhaka. 1909.

Sripantha—"Ekhoao Shoaajai Challigh-er Garjan : In Saat Dasak : Samabal O Auandabagar. Calcutta : Ananda Published 1992.

Tagore. Rabindranath—*Bangala Sabda-tattwa* Calcutta : Visva. Bharati : 1984

—'Bhashar Katha'. Bangla Sabda-tattwa Calcutta :Visva Bharati. 1984

—Rabindra Rachanabali, Sulabh Sawgskaran, 18 volumes, Calcutta. Visva Bharati. 1986

—Samajchinta, ed. by Satyendranath Ray. Calcuta : Cambridge Pvt. Ltd., 1984.

Thakur.Kshiticharan—Tomara ar Amra, Calcutta : Kuntalim Press. 1919.

Umar, Badruddin—*Banga-bhanga O Samprodayik Rajait*. Calcutta : Clirayata Publishing. 1987.

একক ৮ ❒ শ্রেণি সচেতনতা : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণির ‘শ্রেণি’ সচেতনতা

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ ভূমিকা

৮.২ বাংলার শ্রমিক শ্রেণির চরিত্র

৮.২.১ জবার বা সরদারদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

৮.৩ বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ : বিভিন্ন পর্যায়

৮.৩.১ প্রাথমিক পর্যায়

৮.৩.২ স্বদেশি আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় (১৯০৫-১৯১৮)

৮.৩.৩ পর্যায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : অসহযোগ আন্দোলন ও তারপর

৮.৩.৪ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯২২-১৯৩৫

৮.৩.৫ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯৩৫-১৯৩৯

৮.৩.৬ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯৪০-১৯৪৫

৮.৩.৭ অন্তিম পর্যায় : শ্রমিক আন্দোলন ১৯৪৫-৪৭

৮.৪ উপসংহার

৮.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৮.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবেন সেগুলো যথাক্রমে :

- উপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ চরিত্র
- বাংলায় শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণি চেতনার গঠনের বিভিন্ন পর্যায়
- শ্রমিক আন্দোলনের দাবি এবং সমস্যা
- জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলাকালীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ

৮.১ ভূমিকা

ভারতে ধীরে ধীরে শিল্পায়নের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে দুটি নতুন শ্রেণির উত্থান ঘটে। পুঁজিপতি ও শিল্প শ্রমিক। ভারত তথা বাংলার শ্রমিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ইউরোপের থেকে স্বতন্ত্র। বাংলার এই বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রমিকেদের মধ্যে শ্রেণি সচেতনতার পূর্ণ বিকাশে এক সফল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে বাংলার শ্রমিক আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে।

৮.২ বাংলার শ্রমিক শ্রেণির চরিত্র

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যেহেতু গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ভরণ পোষণ ও কর্মসংস্থান করতে অসমর্থ ছিল তাই দরিদ্র গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়েছিল জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে। রণজিৎ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, জুট মিলে কর্মরত শ্রমিকদের বেশিরভাগই ছিল কাজ হারানো গ্রামীণ কারিগর, শ্রমিক এবং কৃষক—যারা গ্রামে কাজের সুযোগ না থাকায় জুট মিলে কাজ করতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে আবার কারও কারও চাষের জমিও ছিল। অবশ্য অর্জন দ্য হান মনে করেন, গ্রামের সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতায় যে গ্রামের মানুষকে গ্রামের বাইরে ঠেলে বার করেছে তা নয়। শুধু ধাক্কা তত্ত্ব দিয়ে দ্য হান এই অভিবাসনের ব্যাখ্যা করতে নারাজ, বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে। নাগরিক জীবন এবং শিল্পে কর্মসংস্থানের আকর্ষণও শ্রমিক অভিবাসনের একটি অন্যতম কারণ ছিল। রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকর নজরে এনেছেন যে, যদিও শ্রমিকরা শহরে বসবাস শুরু করেছিলেন তারা কিন্তু গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগ ছিন্ন করে ফেলেননি। ধান কাটার সময়ে তো বটেই এছাড়াও তারা পারিবারিক উৎসবেও যোগ দিতে গ্রামে যেতেন। শহরাঞ্চলের শিল্প শ্রমিক হয়েও তাদের গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকার ফলে তাদের মধ্যে কৃষক সত্তার অস্তিত্বও রয়ে গেল। কৃষক-শ্রমিক দ্বৈত-সত্তার সংমিশ্রণে যে বাহক হয়ে উঠল বাংলায় শ্রমিক তা কিন্তু তার শ্রেণি চেতনার বিকাশের পথে বাধা হয়ে উঠল।

শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সমাজে জাতিভেদ প্রথার উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। গ্রামীণ সমাজের এই প্রথা শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল শহরে, শিল্পাঞ্চলে। উঁচু জাতের মানুষের জন্য নিচু জাতের মানুষের থেকে উঁচু পদ ও উচ্চহারে বেতন ধার্য হত। শমিতা সেনের গবেষণামূলক কাজে উঠে এসেছে বাংলার জুট মিল শ্রমিকদের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের দিক। কিছু বিশেষ ধরনের কাজেই শুধু মহিলারা নিয়োজিত হতেন কারণ কর্তৃপক্ষ মনে করতেন স্ত্রী এবং মায়ের দায়িত্ব পালন মহিলাদের প্রধান কর্তব্য। তাই তাদের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কথা মাথায় রেখে তাদের পুরুষদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হত।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দাঙ্গা বেঁধেছিল হিন্দু শ্রমিকদের সঙ্গে মুসলমান শ্রমিকদের। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল শ্রেণি সচেনতায় নয়, সাম্প্রদায়িক চেতনায় ছিল শ্রমিক দলের মুখ্য চালিকা শক্তি। দীপেশ চক্রবর্তী মনে করেন, শ্রেণি সচেতনতার অনুপস্থিতি প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বল্প

সংখ্যার ট্রেড ইউনিয়ন এই পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য। শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বা ক্ষমতা বৃদ্ধির লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নামক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগঠনের কোনও গুরুত্ব সেভাবে ছিল না।

৮.২.১ জবার অথবা সরদারদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

শ্রমিকদের কর্মপ্রাপ্তি হত সরদার বা জবারদের মাধ্যমে। অর্থাৎ কাজ পাওয়া যেত মধ্যবর্তী একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে। বাংলার শ্রমিক চরিত্র বুঝতে গেলে এই বিশেষত্বটি বোঝা জরুরি। ইউরোপ শ্রমিক নিযুক্তি কারুর মাধ্যমে হত না। শ্রমিক বাজারে শ্রমিক তার যোগ্যতা অনুসারে সরাসরি কাজে বহাল হতেন। যারা কাজ পাইয়ে দিতেন সেই জবারদের পূর্ব ভারতে বলা হত সরদার। মরিসের মতে, সরদাররা শুধু শ্রমিকদের নিযুক্তই করতেন না, ফ্যাক্টরি শ্রমিকরা যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ করেন সেই বিষয়েও দৃষ্টি রাখতেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশ্য দেখা গেছে যে, কাজ পাওয়ার জন্য শ্রমিকরা সরদারদের উপর নির্ভরশীল হলেও সরদারদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত লাগলে তারা সরদারের বিরোধিতা করতেও দ্বিধা করতেন না। যেমন—১৯১৯-২০ সালের জুট মিলের ঘটনায় দেখা গিয়েছিল। আবার এমন উদাহরণও আছে এ যেখানে সরদাররা মালিকদের বদলে শ্রমিক পক্ষ অবলম্বন করেছেন। ১৯২৯ এবং ১৯৩৭-এর জুট মিল শ্রমিক শ্রেণির বিক্ষোভ সরদাররা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৮.৩ বাংলায় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের বিকাশ, বিভিন্ন পর্যায়

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণি সচেতনতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ইত্যাদির বিকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়। এই পর্যায়গুলোর আলোচনা নিচে করা হল।

৮.৩.১ প্রাথমিক পর্যায়

১৯০০-এর আগে বাংলায় শ্রমিক শ্রেণির সচেতনতা ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। ফলে শ্রমিক বিক্ষোভের চরিত্র ছিল অসংঘবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত। এ পর্যায়ে বেশিরভাগ সময়ই যন্ত্রপাতি, ভাঙ্গচুর করা, অফিসারদেরকে আক্রমণ করা, একটা মিল ছেড়ে অন্য মিলে গিয়ে চাকরি নেওয়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই শ্রমিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করত।

উনিশ শতকের শেষের দিকে কয়েকজন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তি মিল শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা করেন। বরাহনগরে জুট মিলের শ্রমিকদের হিতার্থে যারা এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এইসব সমাজকল্যাণকারীদের কিন্তু কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও ১৮৮৫-তে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেও যতদিন তাতে মধ্যপন্থীদের প্রাধান্য ছিল ততদিনে শ্রমিক কল্যাণের বা শ্রমিক শ্রেণির উন্নতি সাধনের কোনো চেষ্টা হয়নি।

৮.৩.২ স্বদেশি আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় : ১৯০৫-১৯১৮

১৯০৫-এ স্বদেশি আন্দোলন চলাকলীন জাতীয়তাবাদীরা চেষ্টা করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে নিজেদের

সংযুক্ত করতে। কিন্তু সে সময় কেবলমাত্র কয়েকটি জুটমিল, ছাপাখানা ও রেলের শ্রমিকদের মধ্যে খানিকটা সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। প্রচুর অবাঙালি শ্রমিক বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে এ সময়ে বাংলায় চলে আসতে শুরু করেন। এরা কোনও শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেননি। বাঙালি প্রতিবাদী শ্রমিকরা ধর্মঘটে শামিল হতেন বটে কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমর্থনে তাদের দাবিদাওয়া পূরণ হয়ে যেত ফলে তারা আর রাজনৈতিক আন্দোলন না চালিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতেন। কোনও স্থায়ী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সে সময় গড়ে ওঠেনি। স্বদেশি আন্দোলন সমাপ্ত হলে শ্রমিক আন্দোলনেরও হঠাৎ করে পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলার বাইরে বোম্বের কাপড়ের মিলগুলোর ধর্মঘট ছিল অনেক বেশি সংঘটিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলাকালীন ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতি শ্রমিক আন্দোলনকে অবদমিত করে রেখেছিল।

৮.৩.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : অসহযোগ আন্দোলন ও তারপর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্যান্য সকল ভারতবাসীদের মতই শ্রমিক শ্রেণিও আর্থিক দুর্দশায় জর্জরিত হয়েছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে। অন্যান্যদের মতো শ্রমিকদেরও প্রতিবাদী আন্দোলন যোগদান করার সুযোগ ছিল না। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রচুর শ্রমিক কাজ হারিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে তাদের আর্থিক অনিশ্চয়তা শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল।

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীর আবির্ভাব সমাজের সকল স্তরের মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছিল মূল ধারার কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় যোগদান করতে। শুরুর দিকে শ্রমিকরাও গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৯-এর খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন অন্য একটি মাত্রা যোগ করেছিল। বাংলার জুট মিল ছাড়িয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে গেল বিহার-বাংলার কয়লাখনির মজুরদের এবং আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে।

বাংলা আর বোম্বে প্রেসিডেন্সির শ্রমিকরা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শ্রমিকদের থেকে অনেক সচেতন ছিলেন। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটনা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়ার পর শ্রমিক আন্দোলনেও স্থিমিত হতে শুরু করে।

৮.৩.৪ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯২২-১৯৩৫

১৯২০-র মাঝামাঝি সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন হওয়ার পর থেকে সমাজতন্ত্রী বিশেষ করে মার্কসবাদী মতাদর্শ ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, যা শ্রমিক শ্রেণিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। নতুন সৃষ্টি হওয়া বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিক কল্যাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে, শ্রমিকের অধিকার লাভ এবং দাবি পূরণে তারা সহায়তা করে। গান্ধীবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার পর শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায় আন্দোলনের চরিত্রে বিপ্লবী ভাব সৃষ্টি হয়। শ্রমিক আন্দোলনে উন্নত মানের জীবনযাত্রা, বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় বেঁটে দেওয়া/কম করার দাবি

উঠে আসে। এই সময়কালে বেশ কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৯২৭ সালে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৯২৯ সালে লিলুয়ায় পূর্ব ভারতের রেলওয়ে কর্মীদের ধর্মঘট হয়। বাংলায় জুটমিল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালে জামশেদপুর টাটা ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন ইত্যাদি।

কিন্তু ১৯২৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর বড় আঘাত নেমে আসে যখন বামপন্থী নেতারা মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) মধ্যপন্থী নেতারা কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাবে খুব বেশি প্রভাবিত এই অপবাদে AITUC থেকে বেরিয়ে এসে একদল স্থাপন করেন ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, যার পরে নাম হয় ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ১৯৩১-র জুলাই মাসে কমিউনিস্টরাও AITUC ছেড়ে বেরিয়ে এসে রেড ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতাদের মধ্যে এই বিভেদ-বিভাজন শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল।

ফলে বাংলার কমিউনিস্টরা যারা ১৯২৮ সাল থেকে কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে সরে এসেচিলেন তারা আবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরে এলেন এবং AITUC ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোতে যোগদান করলেন। ১৯৩৪ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা অত্যন্ত গোপনে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

কংগ্রেস ছাড়াও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট লিগ, ফরওয়ার্ড ব্লক, ওয়ারর্কাস লিগ, বলশেভিক পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলোও কংগ্রেস সংগঠনের ভেতর এবং বাইরে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা করেছিল। এর ফলে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে সমস্যা তৈরি করল তা হল শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন প্রধানত অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারল না। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলার জুটমিলগুলো এক ঐতিহাসিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। জামশেদপুরে ১৯৩৮ আর বার্নপুরে ১৯৪৯ সালে ইস্পাত কারখানার কর্মীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল আর এই বছরের শেষদিক নাগাদ শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির জোরদার দাবি তুললেন। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ ছিল যে কোনও পরিস্থিতিতেই যেন যুদ্ধের সময় উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। তাই সেই নির্দেশ মতো তড়িঘড়ি করে কারখানা প্রশাসনের তরফ থেকে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরই মধ্যে Great Economic Depression বা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত দেশের মতোই ১৯৩০ সালে ভারতেও দেখা যায়। বিপুল সংখ্যক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়। যাদের কাজ ছিল তাদেরও অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেতন হ্রাসের কারণে শ্রমিকদের প্রতিবাদের ক্ষমতাও ছিল না। একদিকে তাদের নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন। প্রতিবাদ জানালে মালিকপক্ষ ওই ছুতোয় কাজ থেকে বরখাস্ত করবে এই ভীতি শ্রমিকদের অসহায় করে রেখেছিল।

৮.৩.৫ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯৩৫-১৯৩৯

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে আর্থিক মন্দার প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল। অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরাও উন্নত জীবন যাত্রার মান এবং বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলে ধরল। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এতদিনে পরিবর্তন ঘটেছে। পরিস্থিতি শ্রমিকদের অনুকূলে হয়েছে। ১৯৩৫-এ পাশ হওয়া গভর্নমেন্টে অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ভিত্তিতে ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর যে সব প্রাদেশিক সভা গঠিত হল সেখানেই প্রথম শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হল। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টি এবার শ্রমিক শ্রেণির দিকে আকৃষ্ট হল। শ্রমিক স্বার্থ উন্নয়নে তাদের আগ্রহ দেখা দিল।

১৯২২ সালের পর শ্রমিকদের প্রতি কংগ্রেসের মনোযোগও কমে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে বামপন্থী নেতাদের উত্থান এবং কংগ্রেসের ভিতরেই সদস্যদের একাংশের চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে কংগ্রেস দল আবার শ্রমিক স্বার্থের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। কংগ্রেসের ইস্তাহারে শ্রমিক শ্রেণির উন্নয়ন এবং শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়কে স্থান দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের জন্য উপ-সমিতি গঠন করা হল।

এরই মধ্যে কমিন্টার্ন বা কমিউনিস্ট পার্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রস্তাব দিল যে, উপনিবেশিগুলোতে যেসব কমিউনিস্ট দল আছে তারা আপাতত জাতীয় দলগুলোর সঙ্গে একযোগে নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকুক।

৮.৩.৬ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯৪০-১৯৪৫

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল অস্বাভাবিক। সরকারে পক্ষ থেকে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য পারিশ্রামিক বৃদ্ধি করা হয়েছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু এ পদক্ষেপগুলো কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তা সত্ত্বেও ১৯৪০-৪১ সালে সেভাবে কোনও প্রান্তিক মানুষের আন্দোলন ঘটেনি।

সারা ভারত জুড়ে ১৯৪১ সালে মাত্র ৩৫৯টি শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল। বাংলাতেও সাধারণ ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু মাঝেমধ্যেই কিছু অস্থায়ী স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটেছিল। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কেবলমাত্র পূর্ব ভারতের জামশেদপুরেই শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন সীমিত ছিল। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সমালোচকদের চোখে এই সময়ের সাধারণ ধর্মঘটগুলো ঘটেছিল। এই ধর্মঘটগুলি 'কিছু দিনের জন্য ফ্যাক্টরী বন্ধ' ধাঁচের। এইসব কারখানার মালিকরা বেশিরভাগই ছিলেন ভারতীয়।

৮.৩.৭ অন্তিম পর্যায় : শ্রমিক আন্দোলন ১৯৪৫-৪৭

স্বাধীনতা লাভের দু'বছর আগে থেকে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ব্রিটিশ শাসকদেরও দমননীতি চূড়ান্ত নির্মমরূপ ধারণ করেছিল। শ্রমিক শ্রেণিকে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত

কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করেছিল। যথেচ্ছভাবে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করা হয়েছিল। কোনও সতর্কীকরণ ছাড়াই তাদের উপর গুলি চালানো হয়েছিল। এর ফলে শ্রমিকরাও মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিগুণ উদ্দীপনার সঙ্গে তারাও রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯৪৭-র ১০ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত ট্রাম শ্রমিকরা ১০০ দিনের ধর্মঘট করেছিলেন। এই ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্দরকর্মীরাও একটা দীর্ঘ সময় ধরে (৫ই ফেব্রুয়ারি-৩রা মে, ১৯৪৭) ধর্মঘট চালিয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোতে, জুট আর কাপড়ের শিল্পগুলোতে এ সময় ধর্মঘট হয়েছিল। দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের চা বাগানের শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে যে ধর্মঘট করেছিলেন তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক।

৮.৪ উপসংহার

শ্রমিক আন্দোলন যে উপনিবেশিক সরকারের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল তা বলাই বাহুল্য। যদিও শেষ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিপতি মালিকদের বিরুদ্ধে তেমন কোনও সংগঠিত শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। এর কারণ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণি-সংহতি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক চেতনার অভাব শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

দীপেশ চক্রবর্তীর মতে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি চেতনার অভাব লক্ষণীয় ভাবে ছিল। এর কারণ প্রাক্-পুঁজিবাদী বিভিন্ন ধরণের চেতনা তাদের প্রভাবিত করত।

৮.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাংলার শ্রমিক শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণি চেতনা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল?

২. সরদারদের ভূমিকা কতটা শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল?

৩. শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের বর্ণনা লিখুন।

৪. স্বদেশি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে কী ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল?

৫. খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২০) কীভাবে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল?

৬. বাংলায় ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

৭. আপনি কি মনে করেন যে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময় ছিল বাংলার শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণি চেতনা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়?

৮. কীভাবে ১৯৪৫-১৯৪৯ এই সময়কালে বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল?

৮.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Chakraborty. D. 1989. *Rethinling Working class History : Bengal. 1890-1940.* Princeton. Prienceton University Press.

Chandravaekar, Rajnarayan. 1994. *The Origins of Industrial Capitalism in India : Business Strategies and Labouring Classes in Bombay. 1900-1940.* Cambridge. Cambridge University Press.

Dasgupta, Ranajit. 1994. *Labour and Working Classes in Eastern India. Studies in Colonial History.* Calcutta. K. P. Bagchi and Co.

De Haan. Arjan. 1995. Migration in Eastern India : A Segmented Labour rarket *The Indian Economic and Social History Review* 31(1) : 51-93

Morris D. 1965. *The Emergence of an Industrieal Labour Force in India : A stduy of the Bomaby Cotton Mills, 1857-1947.* Berkley and Los Angels; University of Colifornia Press.

Sen, Sawita. 1993. 'Motherhood and Mothercraft : Gender and Nationalism in Bengali', *Gender and History 5(2)* : 231-243.

একক ৯ ❐ শ্রেণি চেতনা গঠন : কৃষক সভা ও কৃষক আন্দোলন

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ ভূমিকা

৯.২ ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ : প্রথম পর্ব

৯.২.১ রংপুর, সন্ন্যাসী-ফকির, পাগলপন্থী বিদ্রোহ

৯.২.২ তিতুমীরের ওয়াহাবি বিদ্রোহ

৯.২.৩ ফরাইজি বিদ্রোহ

৯.২.৪ কোল বিদ্রোহ

৯.২.৫ সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-৫৬)

৯.২.৬ কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ : প্রাথমিক পর্যায়

৯.৩ কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষকদের রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ : পরবর্তী পর্যায়

৯.৩.১ নীল বিদ্রোহ

৯.৩.২ মুণ্ডা উলগুলান

৯.৪ কিষাণ সভা আন্দোলন

৯.৫ কৃষক প্রজা পার্টি

৯.৬ তেভাগা আন্দোলন

৯.৭ উপসংহার

৯.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৯.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত হবেন সেগুলো হল :

- উপনিবেশিক শাসনকালে বারবার বহু কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।
- কোম্পানির আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত রাজস্ব সংগ্রাহকর ইজারাদাররা কৃষকদের উপর নিপীড়নের সাজা বাড়িয়ে দেন। এই কারণে কৃষক আন্দোলন দেখা দেয়।
- প্রাথমিক পর্যায় যে সব কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল সেগুলোতে কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল।

- পরবর্তী পর্যায়ের কৃষক আন্দোলনেও তাদের উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করে উপনিবেশিক নীতিসমূহ, আইন এবং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন ঘটেছিল।
- কিষাণ সভাগুলো কৃষকদের মধ্যে চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৯.১ ভূমিকা

যদিও প্রথম যুগে নাগরিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি গ্রামীণ সমাজের প্রতিক্রিয়া কিন্তু ছিল ঠিক তার বিপরীত। ব্রিটিশ শাসনের শোষণকারী রূপ গ্রামীণ সমাজের চোখে ধরা পড়েছিল। গ্রামীণ সমাজের কাছে ব্রিটিশশাসন দেখা দিয়েছিল গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির কার্যের পরিপন্থী হয়ে।

মোগল আমলে কৃষক বিদ্রোহ ঘটলেও উপনিবেশিক শাসনের প্রথম যুগে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৯.২ ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ : প্রথম পর্ব

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে উপনিবেশিক সরকার রাজস্ব ব্যবস্থাকে যেভাবে সংশোধন করে তার ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ চরিত্র এক বিরাট পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে মোগল আমলের বহু শাসক, জমিদার তাদের কর্মচারীদের রাজ্যচ্যুত বা পদচ্যুত করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অযোধ্যার নবাব, সেখানকার জমিদাররা, বেনারসের রাজা চৈত সিং প্রমুখ। এইসব শাসকরা ১৭৭৮ সাল থেকে ১৭৭৯ সাল পর্যন্ত তাদের রাজ্য এবং মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই ধরনের বিদ্রোহকে ক্যাথলিন গগ বর্ণনা করেছেন "পুনরুদ্ধারমূলক" বিদ্রোহ বলে। দক্ষিণ ভারতে স্থানীয় শাসকরা যাদের পলিগার বলা হত তারাও মাদ্রাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। স্থানীয় জমিদারদের নেতৃত্বে সংঘটিত এইসব বিদ্রোহের পিছনে থাকত কৃষক সমর্থন। কৃষকরা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদারদের উৎপীড়নে উত্যক্ত হয়ে অথবা তাদের দাবি পূরণ না হলে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সামিল হতেন।

৯.২.১ রংপুর-সন্ন্যাসী-ফকির-পাগলপন্থী বিদ্রোহ

১৭৮৩ সালে রংপুরের কৃষক সম্প্রদায় খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। হিন্দু-মুসলমান একজোট হয়ে স্থানীয় বাজার এবং শস্য গুদাম, দোকান ইত্যাদি আক্রমণ করেন। উত্তরবঙ্গ ও বিহার অঞ্চলের ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত যে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ হয়েছিল, তা কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে উল্লিখিত হলেও তাতে ধর্ম একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় টিপু শাহের অধীনে পাগলপন্থীর ধর্মের ভিত্তিতে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন তাতে অংশ নিয়েছিল গারো পাহাড়ের হিন্দু উপজাতিরা, হাদিরা,

হাজং জাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা এবং ওই অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ কৃষিজীবীরা, এরা প্রত্যেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

৯.২.২ তিতুমীরের ওয়াহাবি আন্দোলন

১৮৩০ এর দশকে ওয়াহাবি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিতুমীর দরিদ্র নিপীড়িত মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে বাংলার উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বিদ্রোহের সূচনা করেন। কোম্পানিকে অগ্রাহ্য করে তিতুমীরের সমর্থকরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে খাজনা আদায় শুরু করেন। নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমীর বাঁশের এক কেল্লা নির্মাণ করেন। সেখানে তার সমর্থকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কোম্পানির শাসকরা এতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ সেনাবহিনী নারকেলবেড়িয়া আক্রমণ করে। এই লড়াইতে তিতুমীরে মৃত্যু (১৮৩২) ঘটে।

৯.২.৩ ফরাজি আন্দোলন

এই সময়েই পূর্ব বাংলায় ফরাজি আন্দোলন ঘটে। হাজী শরীয়াতুল্লাহর নেতৃত্বে কৃষক সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তবে এই আন্দোলন মূলত গড়ে উঠেছিল ধর্মের ভিত্তিতে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে শরীয়তুল্লাহর মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র দুদু মিঞা এই আন্দোলনের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। আন্দোলনকারীরা বিশ্বাস করতেন যে, জমির মালিক আল্লাহ। তাই জমির খাজনা দেওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী এবং সেই জন্যই খাজনা দেওয়াটা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করার শামিল। এই আদর্শের উপরে ফরাজি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তিতুমীর এবং দুদু মিঞার আন্দোলনের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন অত্যাচারীর নীলকর সাহেবরা।

৯.২.৪ কোল বিদ্রোহ

বিহারের ছোটনাগপুর, সিংভুম অঞ্চলে এবং উড়িষ্যায় ১৮৩২ সালে কোল উপজাতি মানুষ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ আইন অনুসারে, ছোটনাগপুরের রাজা তাঁর অধীনস্থ জমির ইজারা দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী ও মহাজনদের। যারা স্থানীয় বাসিন্দা নন, তারা স্থানীয় আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করেন। এর ফলে কোল সম্প্রদায়ের মানুষ শাসক এবং তাদের প্রতিনিধিদের আক্রমণ করেন এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলকে তাদের অধীনে নিয়ে আসেন।

৯.২.৫ সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-৫৬)

সাঁওতাল হুল বা বিদ্রোহ এই সময়ের আদিবাসী আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন। পূর্ব ভারতের নানা অঞ্চলে সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতেন। সেসব অঞ্চল থেকে তাদের তাড়িয়ে এনে রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই অঞ্চলকে সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করে তার নাম দেন দামিন-ই-কোহ। সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত নন এমন সব জমিদার, মহাজন যাদের সাঁওতালরা বলতেন বহিরাগত বা দিকু তাদের জমি লিজ দিতে থাকেন। সাঁওতালরা

দামিন-ই-কোহতে দিকুদের প্রবেশকে অনধিকার প্রবেশ বলে মনে করেন এবং তাদের জমি ক্রমশই এই বহিরাগতদের অধীনে চলে যাওয়ায় তাদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা অবশেষে তাদের শোষণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেন।

৯.২.৬ কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ : প্রাথমিক পর্যায়

উপরোক্ত যেসব বিদ্রোহের আলোচনা করা হল সেসব বিদ্রোহ কোম্পানির সরকার অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে দমন করেছিল। যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী আনুমানিক প্রায় ২০ হাজার সাঁওতালকে কোম্পানির সৈন্যবাহিনী হত্যা করে। যদিও ডি. এন. ধানগারের মতে, উপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকের কৃষক এবং আদিবাসী বিদ্রোহ ছিল "প্রাক্-রাজনৈতিক"। রণজিৎ গুহ (১৯৯৪) কিন্তু এইসব বিদ্রোহের মধ্যে নানাভাবে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পেয়েছেন। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যারা তাদের শোষণ করছে এবং সঠিক বিচার থেকে তাদের বঞ্চিত করছে—তাদের সম্পর্কে তারা যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল জমিদারদের বাড়ি, গুদাম, দোকান, মহাজন, ব্যবসায়ীরা এবং ব্রিটিশরা। বিদ্রোহীরা রীতিমতো মিটিং-এ বিদ্রোহের কর্মসূচি, কীভাবে তা কার্যকরী করা হবে, বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেই তবে বিদ্রোহের ঘোষণা করতেন। বিক্ষোভ প্রকাশের একমাত্র পন্থা তারা জানতেন সাবেকি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ। তাদের মধ্যে থেকেই উঠে আসতেন তাদের নেতা। এইসব গ্রামীণ সমাজে ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ধর্মই এক সূত্রে বিদ্রোহীদের বেঁধে রাখত। বিদ্রোহীদের বিশ্বাস ছিল যে তাদের নেতারা দৈবশক্তির অধিকারী এবং শোষণকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের নৈতিক কর্তব্য।

৯.৩ কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ : পরবর্তী পর্যায়

পরবর্তী সময়ে কৃষক আন্দোলন নতুন কয়েকটি বিশেষত্ব যোগ হয়েছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৪) তাঁর লেখায় বলেছেন কৃষকরা ঔপনিবেশিক নীতি, আইন, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে অত্যন্ত সচেতন ছিল তার প্রকাশ কিন্তু এই সময়ে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কৃষকরা সম্প্রদায় নির্বিশেষে ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলোর যেমন—আদালত ইত্যাদির সুবিধার নিতে শুরু করেছিল। এগুলো তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার জানানোর মাধ্যম, ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষক আন্দোলনে শিক্ষিত শ্রেণির মানুষদের জড়িয়ে পড়া ছিল এই আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য। ভদ্রলোক সম্প্রদায় এ সময় হয়ে উঠলেন কৃষক এবং দেশের মানুষের মুখপাত্র।

৯.৩.১ নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০)

১৮৫৯-৬০ এই সময়কালে আর একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহ হল বাংলার নীল বিদ্রোহ। নীল চাষ করবার জন্য চাষিরা অগ্রিম বা দাদন নিতে অস্বীকার করেন এবং প্রতিবাদ জানাতে নীলকর সাহেবদের দালালদের

সামাজিকভাবে বয়কট করতে শুরু করেন। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে চাষীদের সমর্থন করেছিলেন স্থানীয় জমিদার এবং গ্রাম প্রধানরা। তাদের ক্ষোভের কারণ ছিল পুরুষানুক্রমে তারা যে ক্ষমতা ভোগ করে আসছিলেন নীলকরদের অত্যাচারে সে ক্ষমতা তারা হারাতে বসেছিলেন। যখন জেলার শাসনকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করার চেষ্টা করতে থাকেন তখন চাষীরা তাদের ভোগ দখলের অধিকার আইনটি বুঝে নিতে আদালতের দ্বারস্থ হন। (রেন্ট অ্যাক্ট X, ১৮৫৯)। দীনবন্ধু মিত্রের বাংলা নাটক *নীলদর্পণ* সাহেবদের অত্যাচারের একটা ঐতিহাসিক দলিল। সম্ভবত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকটিতে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। রেভারেণ্ড জেমস লঙ্ নামে একজন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশ করেন যেটি লন্ডনের রাজনৈতিক মহলেও পৌঁছে যায়। এর ফলে প্রকাশক লঙ্-এর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ লঙ্-এর জামিনের ১০০০ টাকা তৎক্ষণাৎ আদালতে জমা দেওয়ার ফলে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়নি। সোমপ্রকাশ পত্রিকা এবং হরিশচন্দ্র মুখার্জি সম্পাদিত *দি হিন্দু প্যাট্রিয়ট* কাগজ অতঃপর নীল চাষীদের দুর্দশার কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরে চাষীদের পক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও নীল চাষীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। নীল চাষীদের বিদ্রোহে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জড়িয়ে পড়া নিঃসন্দেহে কলকাতায় নীলকর এবং নীল চাষের পক্ষে যারা ছিলেন তাদের সবার উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। এছাড়াও আরও অন্যান্য কারণের ফলে ১৮৬৩ সালের আগেই বাংলায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়।

পাবনা জেলার অবস্থিত “এগ্রোরিয়ান লিগ” কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। যখনই জমিদার জমির অধিকার থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করতেন কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হতেন। বেশিরভাগ প্রতিবাদ ছিল অহিংসা। এগ্রেরিয়ান লিগের সাহায্যে চাষিরা সুবিচারের আশায় জমিদারদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতেন। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার বিভিন্ন জেলার যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজশাহী ইত্যাদিতে। যেখানে যেখানে কৃষকদের জমির উপর অধিকার হারাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হত, জমিদাররা খাজনার হার বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন, আবওয়াব বসানোর চেষ্টা করতেন সেই সব জায়গায় চাষিরা জমিদারদের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা করতেন। পরিস্থিতির চাপে সরকার ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট (প্রজাস্বত্ব আইন) পাশ করতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে বাংলার সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ছিল বেশ অদ্ভুত। হিন্দু পেট্রিয়টের মতো যেসব সংবাদপত্রিকাগুলো চাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল তারা কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে চাষীদের উপর দেশের জমিদারদের অত্যাচারের কথা লেখার থেকে নিজেদের বিরত রাখল।

৯.৩.২ মুণ্ডা উলগুলান (১৮৯৯-১৯০০)

মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময় যেমন বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তেমনি জনজাতি বিদ্রোহও ঘটেছিল। ১৮৯৯-১৯০০ এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনজাতি বিদ্রোহ ছিল মুণ্ডা বিদ্রোহ বা উলগুলান।

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল বসবাস করা মুণ্ডারা বীরসা মুণ্ডার মতো একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বময়ী মানুষের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। বিরসা মুণ্ডার প্রতিশ্রুতি ছিল মুণ্ডা অঞ্চল থেকে বহিরাগতদের বিশেষত জমিদার, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারি, ব্রিটিশ কর্মচারীদের বহিষ্কার। তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত প্রতিষ্ঠান আছে যেমন থানা, গির্জা, ধ্বংস করা শুরু করে। মুণ্ডাদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে বীরসা রাজ্য ও বীরসা ধর্মের প্রতিষ্ঠান।

৯.৪ কিষাণ সভা আন্দোলন

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভার (BPKS) প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সভার উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের জমি দখলের প্রচেষ্টার বিরোধিতা ও সেই সঙ্গে কৃষকদের জমির উপর অধিকার রক্ষা করা। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের জমিদারদের বিরুদ্ধে একত্রিত করে আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল স্বামী সহজানন্দের উদ্দেশ্যে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা জমিদার-কৃষক সংঘাতের প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কিষাণ সভার গোড়ার দিকের প্রচেষ্টা ছিল এই দুই যুযুধান শ্রেণির মধ্যে শান্তি স্থাপনা যাতে এর ফলে বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘাতের প্রভাবে দুর্বল না হয়ে পড়ে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত উৎকল কিষাণ সভা দাবি করেছিল জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি, যা সে সময় ছিল চরম বৈপ্লবিক এক দাবি। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে BPKS-এও সমাজতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও সে সময়ে BPKS-এর তরফ থেকে তোলা দাবিগুলোর মধ্যে একটি চরমপন্থী ভাবেরও প্রকাশ ছিল।

এরপর ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লখনউতে সর্বভারতীয় কিষাণ সভা (AIKS) গঠিত হয়। স্বামী সহজানন্দ হন তার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। আগস্ট মাসে প্রকাশিত কিষাণ ইস্তাহারের প্রস্তাবগুলো সে সময়ের প্রেক্ষিতে বেশ সাহসী ছিল। প্রস্তাবগুলি হল—জমিদারির বিলুপ্তি, কৃষিক্ষেত্রে থেকে আয়ের উপর আয়কর, ভোগস্বত্ব, দখলিস্বত্বের অধিকার, ঋণের হার কম করা। সর্বভারতীয় কিষাণ সভার আন্দোলন ক্রমে বাংলায় এসে পৌঁছায়। বাংলায় প্রাদেশিক কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির কয়েকজন সদস্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৫-এ যখন কমিন্টার্ন থেকে বামপন্থী দলগুলোর প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করার নির্দেশ আসে তখন অনেক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভায় যোগদান করেন। কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই কৃষি ব্যবস্থার সংস্কারের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩৭-র নির্বাচনের পর যখন আটটা প্রদেশ কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠা হয় তখন গ্রামের মানুষ খুবই আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিষাণ সভার অধীনে ১৯৩৮-৩৯ সালে বিহারের কৃষকরা সমস্ত জমির (স্থায়ী ভোগস্বত্রে পরিবর্তে যে জমিতে স্বল্পমেয়াদি ভোগস্বত্ব প্রদান করা হয়) পুনর্ধিকারের দাবিতে সব গ্রামীণ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে জঙ্গি আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা জমিদারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে রত হলে প্রাদেশিক

কিষাণ সভার নেতৃত্বে এই আন্দোলন গুরুত্ব হারায়। উড়িষ্যাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রক্ষণশীল নেতৃত্ব বিতর্কিত ভোগস্বত্ব নিয়ে জমিদারদের প্রস্তাবিত সংশোধনী মেনে নেয়। এতে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেতা ও জনগণের এক অংশের মধ্যে তীব্র হতাশার সৃষ্টি হয়।

৯.৫ কৃষক-প্রজা পার্টি

১৯৩০ এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৪০-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই স্বল্প সময়কালের মধ্যে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি একটি ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই পার্টির জন্ম হয়েছিল নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির মধ্য থেকে। ১৯৩৬ সালে ঢাকায় ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ফজলুল হক নিজে ছিলেন গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্ব স্থানীয়। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করবার সম্ভাবনা সম্পর্কে ফজলুল হকের কোনো দ্বিধা ছিল না এবং তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে আগামী নির্বাচনে জনসাধারণের কাছে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হবে।

কৃষক-প্রজা পার্টির বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি, প্রজাদের জমির মালিক বলে ঘোষণা, খাজনার হার কম করা, ঋণজালে আবদ্ধ চাষীকে মহাজনের বশ্যতা থেকে মুক্ত করা, কৃষকদের সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, কচুরিপানা যাতে নদী বহতাকে আটকাতে না পারে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা। ফজলুল হক কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার দরুণ প্রচুর সংখ্যায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও কৃষক প্রজাপার্টির সমর্থক হয়ে উঠলেন।

যদিও মাত্র এক বছর আগে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাহলেও ১৯৩৭ এর নির্বাচনে সর্বমোট আসন লাভের ক্ষেত্রের এই পার্টি অন্যান্য সব রাজনৈতিক পার্টিকে পিছেনে ফেলে তৃতীয় স্থান অধিকারী হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় ক্ষমতায় লাভের পর থেকেই পার্টির অবক্ষয় শুরু। মুসলিম লিগ, অন্যান্য কয়েকটি ছোটখাটো রাজনৈতিক দল ও স্বাধীনভাবে নির্বাচনে জয়ী সমর্থনে কৃষক-প্রজা পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে ফজলুল হক পার্টির অস্তিত্ব বজায় রাখতে জড়িয়ে পড়েন ক্ষমতার রাজনীতির খেলায়। তাঁর ক্যাবিনেটে ১১ জন মন্ত্রীর মধ্যে কেবল দু'জনই ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য। দু'জনের মধ্যে তিনি একজন। ১৯৪৩ সালে হক মন্ত্রিসভার যখন পতন ঘটে তখন কৃষক প্রজা পার্টি প্রায় অস্তিত্ববিহীন। কিন্তু মুসলিম লিগ তখন একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টি।

৯.৬ তেভাগা আন্দোলন

স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্কালে বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য কৃষক বিপ্লব ঘটে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রাদেশিক কিষাণ সভার কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ঘটা এই আন্দোলন যা তেভাগা আন্দোলন নামে খ্যাত ছিল। এটি ছিল মূলত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশকে বাস্তবায়িত করবার প্রচেষ্টায় কৃষকদের একটি গণ-আন্দোলন। বর্গাদার বা

ভাগচাষীরা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ফসলের অর্ধেক অধিকারের বদলে এক-তৃতীয়াংশ দাবি করেছিলেন। উত্তর-বাংলা, মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগনায় এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। "নিজ খামারে ধান তোলো।" এই স্লোগান তুলে ১৯৪৬-র নভেম্বর মাসে প্রথামত জোতদারদের খামারে ধান জমা না করে, কৃষকরা নিজেদের খামারে ধান তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই আন্দোলনে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করেনি। জোতদার এবং পুলিশের যৌথ শক্তি প্রয়োগ ও হিংসাত্মক আক্রমণ এই আন্দোলন ভেঙ্গে দিতে সমর্থ হয়। সুমিত সরকারের মতে, যদিও এ সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল তবুও অনেক মুসলমান কৃষক তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

৯.৭ উপসংহার

- যদিও কৃষক আন্দোলন মুঘল ভারতে অনেকবার ঘটেছে তবুও একথা বলাই বাহুল্য যে, ব্রিটিশ উপবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর কৃষক আন্দোলনের সংখ্যা ও মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- উপনিবেশিক যুগে প্রথম যুগে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ হল যথাক্রমে—রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮০), পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ, তিতুমীরের অধীনে ওয়াহাবি বিদ্রোহ, ১৮৩০ এর দশকে ফরাইজি বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ (১৮৩২) এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)
- রণজিৎ গুহ বলেছেন যে এই গোড়ার দিকের বিদ্রোহগুলোতে কিন্তু কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার যথেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।
- পরবর্তীতে উপনিবেশিক নীতি, আইন, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির বিষয়েও কৃষকরা বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ সময়ে কৃষক আন্দোলন মধ্যত্তিদের সমর্থন পেয়েছিল।
- ১৮৫৯-৬০-এ সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নীল বিদ্রোহ।
- বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ১৮৯৯-১৯০০ তে ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডা উপজাতির উলগুলান আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ।
- বিশ শতকের ত্রিশের দশকে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী পূর্ব ভারতে কিষাণ সভাগুলো পুনর্গঠন করেন।
- বিশ শতকের ত্রিশ দশকে শেষার্দ্ধে এবং চল্লিশ দশকের প্রথমার্ধে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি বাংলার রাজনীতিতে একটি ক্ষমতাশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।
- ১৯৪৬-এর বাংলার তেভাগা আন্দোলনে আগামী বা বর্গাদাররা অর্ধেকের বদলে এক-তৃতীয়াংশ শস্যের ভাগ দাবি করে আন্দোলন শুরু করেন।

৯.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহদের কি 'পুনরুদ্ধারমূলক বিদ্রোহ' বলা যায়?

২. উপনিবেশিক আমলের প্রথম যুগের কৃষক বিদ্রোহগুলো ধর্মের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

৩. সন্ন্যাসী-ফকির ও রংপুর বিদ্রোহের কী গুরুত্ব ছিল?

৪. দুদু মিঞা এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন বর্ণনা লিখুন।

৫. সাঁওতাল হুলের কারণ ও তাৎপর্য লিখুন।

৬. 'আপনি কি মনে করেন উপনিবেশিক শাসনকালের গোড়ার দিকের বিদ্রোহগুলোর চরিত্র ছিল "প্রাক-রাজনৈতিক"?

৭. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৮৫৭-র মহা বিদ্রোহের পর কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রে কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

৮. বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রেণি কীভাবে ১৮৫৯-৬০ এর নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন?

৯. মুণ্ডা উলগুলান কেন সংঘটিত হয়েছিল?

১০. বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী কীভাবে পূর্ব ভারতের কিষাণ সভাগুলোকে পুনর্গঠন করেন?

১১. বিংশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে প্রজা কৃষক পার্টির উত্থানের তাৎপর্য লিখুন।

১২. ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে কৃষক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ-এ বিষয়টির উপর আলোচনা করুন।

৭.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandyopadhyay. Sekhar. *From Plassey to Partition Delhi.* Orient Language. Put Ltd. 2004.

Dhangare. D. N. *Peasant Movements in India : 1920-1950.* Delhi.

Gough. Kathleen. 'Indian Peasant Uprising : *In Peassants Struggels in India,* ed., A. R.Desai. 85-128. Bombay : Oxfor University Press. 1979.

Guha Ranagit. *Subaltern studies : Writings on South Asian Hisroty an society*, vol. 1. Delhi : Oxford University Press. 1982.

Guha Ranajit. *Elementary Aspects of Peasant Insurgengy in Colonial India*. Delhi : Oxford University Press. 1994.

Sarkar, Sumit. *Modern Inia. 1885-1947*. New Delhi : Macmilan. 1983.

একক ১০ ❒ 'জাতি' প্রশ্ন ও প্রান্তিক অথবা অনগ্রসর জাতি/শ্রেণি : বিকল্প দৃষ্টিকোণ

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভূমিকা

১০.২ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দলিত প্রতিবাদ

১০.৩ উচ্চতর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের সন্ধানে

১০.৪ ১৯৪৭-এ বাংলা বিভাজন ও জাতি প্রশ্ন

১০.৫ উপসংহার

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১০.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর শিক্ষার্থীরা এই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হবেন :

- উপনিবেশিক বাংলায় জাতি রাজনীতির গুরুত্ব
- হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিচু জাতের মানুষদের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ প্রতিবাদ ও আন্দোলন
- প্রান্তিক বা অনগ্রসর শ্রেণি গঠিত সমিতি এবং বাংলার সমাজ ও রাজনীতির বিষয়ে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় এই সমিতিগুলোর ভূমিকা
- ১৯৪৭ সালের বিভাজন ও প্রান্তিক/অনগ্রসর শ্রেণিগুলোর উপর তার প্রভাব

১০.১ ভূমিকা

এমন অনেক গবেষক রয়েছেন যারা মনে করেন বাংলার রাজনীতিতে জাতের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। কিন্তু চ্যাটার্জি (১৯৯৭), চন্দ্র ও নিয়েলসনের মতো আরও অনেক গবেষকরা মনে করেন গ্রামীণ বাংলার প্রাত্যহিক জীবনে এবং জনচেতনায়, বাংলার সমাজে ও রাজনীতিতে জাত বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০১২) মতে, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে "নিচু" জাতের রাজনীতির প্রভাব ঠেকাতে "ভদ্রলোকে'রা তাকে দমন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষরাই এই কল্পকাহিনী বা মিথ তৈরি করেছেন যে, বাংলায় জাত তেমন গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান নয়।

১০.২ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দলিত প্রতিবাদ : প্রাথমিক পর্যায়

বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রিস্টান মিশনারিরা দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সরকারের তরফ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় এমন কিছু বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোলার যেখানে নিচু জাতের মানুষরা পড়বার সুযোগ পাবে। এই ব্যবস্থার ফলে দলিতদের মধ্যে যারা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারলেন তারা হয়ে উঠলেন দলিতদের মধ্যে অভিজাত। এরকম দলিত অভিজাত গোষ্ঠীরা নিজ নিজ মতাদর্শ সৃষ্টি করে শোষণকারী জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সামিল হলেন। বাংলার নমঃশূদ্ররা এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ।

গোড়ার দিকে প্রতিবাদ প্রকাশের ধরণ ছিল অভিনব। যেমন ১৮৭২ সালে নমঃশূদ্ররা, পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কায়স্থদের বিরুদ্ধে। কোনও নমঃশূদ্রের অন্তিম সংস্কারের সময় কায়স্থরা উপস্থিত থাকতে অস্বীকার করলে, পূর্ব বাংলার চারটি জেলায় নমঃশূদ্ররা ছ'মাস ধরে চাষের কাজ বন্ধ রাখে। নমঃশূদ্রদের একটা অংশ মতুয়ারা—হিন্দু জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মতুয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন সামাজিক সাম্যে এবং সরলভাবে ভক্তির প্রকাশে।

বাংলার অচ্ছুত হাড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন একটি কাল্পনিক স্তরবিন্যাসে বিশ্বাস করেন যেখানে তাদের স্থান সর্বোচ্চ আর ব্রাহ্মণদের স্থান সর্বনিম্ন। যদিও এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল স্বল্পমেয়াদি, তাহলেও এই প্রতিবাদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ভেতর দিয়েই দলিতরা নিজেদের মধ্যে একতা গড়ে তোলে এবং অন্যান্য অসম, শোষণকারী বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তারা প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৪)

১০.৩ উচ্চতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের সন্ধানে

উপনিবেশিক বাংলায় নিচুতলার বংশপরম্পরায় শোষিত হয়ে আসা জাতের মানুষরা হিন্দু সামাজিক কাঠামোয় উচ্চবর্ণের মর্যাদা দাবি করে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কাছে নিজের জন্য উন্নত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা দাবি করেন। যার সাহায্যে তারা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা নিজের অবস্থানের উন্নতি করতে সক্ষম হবেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১০) তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন যে, স্বদেশি আন্দোলনে নিম্নবর্ণের মানুষরা শুধু যে যোগদান করেননি তা নয়, উল্টে তারা এ আন্দোলনের বিরোধিতাও করেছিলেন। নিপীড়িত শোষিত বর্গের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মণীন্দ্র মণ্ডল বঙ্গীয় জনসংঘ (BJS) প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২২)। মুসলিম লিগের পথে এই প্রতিষ্ঠান আন্দোলন শুরু করবে এমন ঘোষণাও করা হয়। বঙ্গীয় জনসংঘ খুব বেশিদিন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তবে ১৯২৬ সাল থেকে তার জায়গা নিয়েছিল অল বেঙ্গল ডিপ্রেসড ক্লাসেস এসোসিয়েশন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর

দাবি। যদিও অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা এম. সি. রাজা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এই সংগঠনের বাংলার শাখা কিন্তু তাদের পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর দাবিতে অনড় থেকে বি. আর. আম্বেদকরের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৩)। মণীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতে, কংগ্রেসি এবং হিন্দু মহাসভার নেতা ডি. এন. ভট্টাচার্যও রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দর সমমর্যাদার যোগ্য। কারণ সারা জীবন তিনি "অচ্ছুৎ" বলে সমাজের ব্রাত্যজনদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। জাতিভেদ প্রথার সংস্কারের জন্য কাজ করেছিলেন।

১৯৩০ এর সময় থেকে জাত সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠল, যখন হিন্দু পরিচয়ে পরিচিত হতে নিম্নবর্ণের মানুষরা উচ্চবর্ণের সমমর্যাদার দাবি তুললেন। একদিকে তারা হিন্দু সমাজের কাছে উচ্চবর্ণের মর্যাদা লাভের দাবি জানিয়েছিলেন আবার অন্যদিকে তারা সরকারের কাছে পশ্চাৎপদ শ্রেণির তকমা দাবি করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে উপনিবেশিক সরকার অবস্থার সুযোগ নিয়ে দলিতদের সমর্থনের পক্ষ নিল। ভদ্রলোক সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই অবস্থানে অখুশি হল। কারণ দলিতদের উত্থান তাদের নিজেদের অবস্থানকে সংকটের মধ্যে ফেলবে এই আশঙ্কায় তাদের ভিতর গভীর হয়ে উঠল। নেতাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন মতবাদের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে শেষ পর্যন্ত দলিত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল। স্বাধীনতার আগে দলিতরা হয় হিন্দু মহাসভা অথবা কংগ্রেসের দলভুক্ত হয়ে গেলেন।

১০.৪ ১৯৪৭-এ বাংলা বিভাজন এবং জাতি সমস্যা

১৯৪৭ এর বিভাজন ছিল আসলে "জাত প্রশ্নের জাতীয়তাবাদী সমাধান"—এই মন্তব্য করেছেন দ্বৈপায়ন সেন (২০১২)। আম্বেদকর স্থাপিত অল ইন্ডিয়া প্রভিন্সিয়াল সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশনের (AISCF) শাখা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন (BPSCF) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৩ সালে। এই শাখার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চাৎপদ-দুর্বল শ্রেণির উন্নতি সাধনে নিয়োজিত যে কোনও ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। যদিও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং চরমপন্থীদের প্রতি সন্ধিহান ছিলেন, তার সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন দলিত এবং মুসলমানদের স্বার্থ অভিন্ন। তিনি মনে করতেন এই "অপর" যেহেতু ছিল ভদ্রলোকদের শঙ্কার কারণ তাই তারা দেশভাগের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেশভাগের পরিবর্তে চেয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলা। কংগ্রেসের শরৎ বসু এবং কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে তিনিও অবিভক্ত বাংলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন পশ্চাৎপদ তফসিলি শ্রেণি/সম্প্রদায় থেকে বেঙ্গল কাউন্সিলে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলা যেন আম্বেদকরকে সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত করে এ বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিলেন।

যাই হোক, এ সময় ব্রিটিশ সরকার যেহেতু ভারত ছেড়ে যাওয়ার মনস্থ করে ফেলেছিল তাই তফসিলি জাতির সমর্থনে তার আর প্রয়োজন ছিল না। এমনকি ক্ষমতার হস্তান্তর নিয়ে আলোচনায় ব্রিটিশ সরকার ডিপ্রেসড ক্লাসেস এ্যাসোসিয়েশনকে আমন্ত্রণ জানায়নি। ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ ডাইরেক্ট

অ্যাকশন ডে ঘোষণার পর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল তার ফলে পশ্চাৎপদ শ্রেণি ক্রমশ হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের দিকে সরে আসতে থাকে। সে কারণেই পশ্চিমবাংলায় তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অঞ্চলের দাবি পূরণ হয়নি। দেশভাগের সময় এবং পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। অনেক দলিত সংগঠন মনে করে দেশভাগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, যা দলিত কণ্ঠস্বরকে বহুদিনের জন্য চাপা দিয়ে রেখেছিল। ১৯৪৭-র আগে পর্যন্ত দলিত জনসংখ্যার বেশিরভাগটাই ছিল পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা। দেশভাগে তাই আসলে পশ্চিমবাংলার ভদ্রলোকদের স্বার্থই সুরক্ষিত হয়েছে।

১০.৫ উপসংহার

পূর্ব ভারতের দলিতদের প্রতিবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার একটা কারণ নেতৃত্বের মধ্যে বিভাজন এবং উচ্চবর্ণের দ্বারা প্রভাবিত কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার রাজনীতিতে দলিত রাজনীতি অন্তর্ভুক্তি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মৈত্রী বন্ধনে সংযুক্ত হবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে। ১৯৪৭ এ বাংলা বিভাজনের ফলে দলিতরা উদ্বাস্তুতে পরিণত হন, যা পরবর্তীতে তাদের দুর্দশার কারণ হয়। বাংলায় কমিউনিস্ট শাসনকালে রাজনীতিতে জাতের প্রাধান্য খানিকটা হ্রাস পায় কারণ বাম মতাদর্শে জাত নয়, "শ্রেণি"-ই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জাতপ্রথা ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসেবে অনাদিকাল থেকে চলে আসছে ফলে তাকে পুরোপুরি নির্মূল করা মুশকিল। তাই এই জাত সংক্রান্ত সমস্যা আবার নতুন করে উঠে আসছে বাংলার রাজনীতিতে উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. আপনি কি মনে করেন উপনিবেশিক বাঙ্গলায় জাতের প্রাসঙ্গিকতা ছিল না?

২. গোড়ার দিকে হিন্দু জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দলিত প্রতিবাদের ধরণ কেমন ছিল?

৩. বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাংলার পশ্চাদ্পদ জাতির সমিতিগুলো কীভাবে তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে?

৪. পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষে উন্নতি সাধনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। এ কাজে কি উনি সফল হয়েছিলেন?

৫. ১৯৪৭ এর দেশভাগ বাংলার দলিতদের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

১০.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandyopadhyay, Sarbani (2012) 'Caste and Politics in Bengali' in *Economic and Political Weekly,* December 15, 2012. Vol. 47. No. 50. 71-73

Bandyopadhyay Sekhar (2004) *From Plassey to Partition and After*. Delhi Orient Language Pvt. Ltd. (Bengali Translation available).

Bandyopadhyay Sekhar (1990) *Caste, Politics and Raj : Bengal 1872-1937*. Calcutta : K. P. Baghi.

Bandyopadhyay Sekhar (2011) *Caste, Prolast and Identity in colonial Bengal* : *The Namasudras of Bengal 1872-1947*. New Delhi : Oxford University Press.

Biswas Upendranath (2003) 'Jogendranath O Ambedkar' in *Chaturtha Durniya*, January. 9-30.

Chandra. Uay and Kenneth Bo Nielson (2012), The Importance of Caste in Bengal. *Economic and Political Weekly*. 47(44) : 59-61.

Chatterjee, Partha (1947) *The Present History or West Bengal : Essays in Political Criticism*. New Delhi : Oxford University Prerss.

Mandal. Jagadish (2003). '*Mahapran Jogendranath. Vol. I and II*', Chaturtha Duniya. Kolkata.

Mandal, Manidranath (1992). Bangiya Jana Sangha, Medinipur.

Sen, Dwaipan (2012). 'No Matter Mow Jogandranath Had to Be Defeated : The Scheduled Casts Ferderation in and the Making of Partition in Bengal. 1945-47'. in *Indian Economic and Social History Review,* 49(3), 321-63.

একক ১১ ❒ নারী আন্দোলন ও লিঙ্গ প্রশ্ন : সাম্য ও মুক্তির লড়াই

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ ভূমিকা

১১.২ নারী প্রশ্ন : পশ্চিমী সমালোচনা : ভারতীয় প্রতিক্রিয়া

১১.৩ গতানুগতিক ছকে বাঁধা ভারতীয় নারী

১১.৪ জাতীয়তাবাদ ও নারী প্রশ্ন

১১.৫ উপসংহার

১১.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলো শিখবেন সেগুলো হল :

- "ভারতীয়দের সুসভ্য করে তোলার পশ্চিমি অভিযানে" নারী প্রশ্ন কতটা ন্যায্য ছিল?
- ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কল্পনায় গৌরবজ্জ্বল অতীতে ভারতীয় নারী—সমাজ সম্মানের এবং শ্রদ্ধার স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
- উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী পুরুষ অভিজাতদের একটি বোঝাপড়া বা ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়।
- শুচিতা এবং লোক চক্ষুর বাইরে গৃহবন্দি দশা কেবল উচ্চবর্ণের নারীদের জন্যই কাম্য ছিল না। সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণের মধ্যেও এই রীতি অনুসরণের চেষ্টা ছিল।

১১.১ ভূমিকা

সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জাতির বহু কণ্ঠস্বরের একটি ছিল নারীর। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর যোগদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল নারীদের কণ্ঠস্বর। তাহলেও যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হল সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর শিক্ষা ও নারী জাতির উন্নয়নকে ঘিরে যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছিল সেই "নারী প্রশ্ন" যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল ততটা গুরুত্ব কিন্তু পায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর

দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার চিত্রটা ব্রিটিশ শাসকরা ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় পুরুষদের "সুসভ্য" করে গড়ে তোলার অজুহাতে হিসেবে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টান্তের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। সমাজে নারীদের উন্নতিকল্পে যেসব সংস্থা তৈরি হয়েছিল বা স্ত্রী শিক্ষার যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীদের সুগৃহিণী এবং সুমাতা হিসাবে তৈরি করা।

১১.২ নারী প্রশ্ন : পশ্চিমি সমালোচনা : ভারতীয় প্রতিক্রিয়া

জেমস মিল ও অন্যান্য পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকদের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত আলোচনায় উঠে এসেছে ভারতের লিঙ্গ বৈষম্যের প্রসঙ্গ। তারা মনে করেন ভারতীয় সমাজে প্রথম যুগ থেকেই লিঙ্গবৈষম্য ছিল। সমাজে নারীর অবস্থান সামাজিক অগ্রগতির নির্দেশক। ভারতীয় সমাজে নারী পদদলিত তাই পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ অসভ্য এবং বর্বর। ভারতীয় 'সভ্যতার সমালোচনা' ছিল ভারত নিয়ে পশ্চিমেদের আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। পশ্চিমের দৃষ্টিতে উপনিবেশিত সমাজ ছিল 'মেয়েলি', তুলনায় উপনিবেশিক শাসনকর্তারা ছিল 'পুরুষালী'। দুর্বল মেয়েলি সমাজ স্বাভাবিক কারণেই শক্তিশালী পুরুষালী শাসকের অধীনস্থ হবে এটাই তো ন্যায্য। ভারতীয় সমাজে নারী অবদমিত বলে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি স্তর বিন্যাসের কাঠামোতে ভারতের স্থান নির্ধারণ করেছিল একেবারে তলায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ তুলে ধরেন কল্পিত অতীত ভারতের স্বর্ণযুগের চিত্র। যেখানে তাঁদের মতে, নারী শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠাতা ছিলেন। সমাজের যেসব নিয়ম-নীতি নারীর নিগৃহের কারণ ছিল তারা যেসব নিয়ম-নীতি সংশোধনের দাবি তোলেন। এর ফলে নারী ভ্রূণ হত্যা এবং সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক প্রথা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। বিধবার পুনর্বিবাহ আইনি স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত সংশোধন হয়েছিল হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদন সাপেক্ষে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নারীর উন্নতি ও মুক্তি ছিল ঊনবিংশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক এবং সংশোধন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। অথচ নারীর অংশগ্রহণ কিন্তু এই দুটোর কোনওটাতেই ছিল না। উল্টো দিকে দেখা যায় নারীর বহির্জগতে পা রাখার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি শর্ত রাখা হয়েছে। যেমন—অন্তঃপুরের বাইরে নারীর, হিন্দু এবং মুসলিম তা যে সম্প্রদায়ের হন না কেন বেরোনো তখনই অনুমোদিত হবে যখন তিনি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হয়ে বেরোবেন। বহির্জগতে তার ব্যবহার হতে হবে আদর্শ ভারতীয় নারীর জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

'নারী প্রশ্ন'কে ঘিরে আলোচনা এবং বিতর্কের পরিসর ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে পরিবর্তিত হয় ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার আন্দোলনে ও বিতর্কে। উপনিবেশিত পুরুষরা দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠেন স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায়। জেরল্ডাইন ফোর্বস তার লেখায় দেখিয়েছেন এই বিষয়ে তিনটি পুরুষদল কিভাবে অগ্রণী

ভূমিকা নিয়েছিল। এরা ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী, ভারতীয় পুরুষ সমাজ সংস্কার এবং শিক্ষিত ভারতীয় মহিলা। বাংলা রাধাকান্ত দেবের মত অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এসেছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটিরও এই বিষয়ে অবদান ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো ব্রাহ্ম নেতারা স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রণী হয়েছিলেন। বাঙালি শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

১১.৩ গতানুগতিক ছকে বাঁধা ভারতীয় নারী নির্মাণ

গতানুগতিক ছকে ফেলে ভারতীয় নারী নির্মাণ প্রচেষ্টায় উপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী পুরুষ অভিজাতদের মধ্যে বিরাট একটা ঐক্যমত ছিল। ভিক্টোরিয়া ইংল্যাণ্ডে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল গৃহের অভ্যন্তর। মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্য জীবনযাত্রাই পছন্দ ছিল ব্রিটিশদের। আর তাই ভারতেও হিন্দু ও ইসলামিক পারিবারিক আইন, যা ভারতীয় মহিলাদের বাইরের জগতে পা রাখার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের অন্দরমহলে বন্দি করে রেখেছিল—সেই অবস্থাকে তারা বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন।

এটা অবশ্য ধরে নেওয়া হয় যে, গ্রামের নিম্নবর্গের মহিলারা এবং শহরের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক মহিলারা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই স্বাধীন ছিলেন। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি উচ্চবর্ণের নিয়ম-কানুন নকল করতে প্রবৃত্ত হয়। মহিলাদের পর্দানসীন অন্তঃপুরিকা হয়ে থাকা, চারিত্রিক শুচিতা বজায় রাখা ইত্যাদি বাংলার নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ফলে কৃষক পরিবারের মহিলারা যারা আগে মাঠে কৃষিকাজে যোগ দিতেন তাদের কাজ করবার অনুমতি রইল না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। ধান ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ আগে মহিলারা করতেন। কিন্তু এ কাজে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হতে মহিলাদের পরিবর্তে এ কাজের দায়িত্ব পেলেন পুরুষরা, যারা মেশিন চালাতে দক্ষ। তনিকা সরকার দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতকের অন্তিম পর্বে ও বিংশ শতকের প্রথম পর্বে কৃষক আন্দোলন মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে। কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সাধারণভাবে ধরেই নেওয়া হত যে তারা পুরুষ শ্রমিকদের থেকে কম দক্ষ। তাই তারা ছাঁটাই হতেন বেশি এবং বেতন পেতেন কম। মহিলাদের লোকসংস্কৃতি, লোকগান, লোকনৃত্য, নাটক ইত্যাদিকে তুচ্ছ ও নিম্নমানের বলে বাতিলের তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি এবং আনন্দের পরিসর সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল।

১১.৪ জাতীয়তাবাদ ও নারী প্রশ্ন

পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কীভাবে নারী প্রশ্নের মোকাবিলা করেছিল। জাতীয়তাবাদীরা ক্ষেত্র বিভাজন করেছিল—বহির্জগত ও অন্তঃপুর। বহির্জগত নির্দেশিত হয়েছিল পুরুষদের ক্ষেত্র হিসেবে, অপরদিকে অন্তঃপুর ছিল নারীদের নিজস্ব ক্ষেত্র। বহির্জগত ছিল

ভারতীয় পুরুষদের সঙ্গে উপনিবেশিক রাষ্ট্রে টানাপোড়েন সংঘটিত করবার ক্ষেত্র। অন্তঃপুরের নারীরা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশচাত্য সংস্কৃতির দ্বারা অকলুষিত।

গোড়ার দিকের বাংলার জাতীয়তাবাদীদের কাছে দেশ ছিল মাতৃভূমি। দেশমাতৃকা তাদের কাছে শক্তিরূপিণী, অসুর দলিনী, দুষ্টের সংহারকারিণী। *আনন্দমঠ* (১৮৮২) উপ্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃবন্দনায় বন্দেমাতরম্ গানটি রচনা করেন। এই গান জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বদেশ প্রেম জাগরিত করবার জন্য স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে অরবিন্দ ঘোষ দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে আরাধনা করেছিলেন। কংগ্রেস নেতারাও জাতি গঠনে মাতৃমূর্তি আরোপ করেছিলন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীর আবেদন সাড়া দিয়েছিলেন ভারতের নারী শক্তি। যার ফলে সুদৃঢ় হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। গান্ধীবাদী আন্দোলনের শুরু দিকে অর্থাৎ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। সাধারণত তারা স্বদেশি এবং বয়কটের প্রচারে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় যখন বেশিরভাগই পুরুষ নেতা জেলবন্দি হয়েছিলেন তখন মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলায় কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিকল্পনা ছিল মেদিনীপুর জেলার থানা দখল। ব্রিটিশদের জেলা ছাড়া করে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম উদ্যোগ; ১৪৪ ধারা জারি তাই মিছিল বন্ধ করবার নির্দেশ দেয় পুলিশ। মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশি নিষেধ অমান্য করে এগিয়ে যেতে পুলিশগুলি চালায় তার ওপর।

১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের একাংশ যোগদান করেন। তারা গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার কাজে অংশ নেন। ১৯৪১-এ সর্বভারতীয় ছাত্র পরিষদের (AISF) মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। গান্ধী মতের বিরুদ্ধে গিয়ে সুচেতা কৃপালিনী এবং অরুণা আসফ আলি বিপ্লববাদী কার্যাবলীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বাংলার বামপন্থী মহিলা নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। ১৯৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় আত্মরক্ষা সমিতি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৬-এ তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সমর্থনে বাংলার মহিলারা নারী বাহিনী নামে একটি বিগ্রেড গঠন করেন। পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অনেক মহিলার মৃত্যু ঘটে। একই সময়ে মহিলা বাহিনী ছোটো ছোটো বৈপ্লবিক দল গড়ে হায়দ্রাবাদে নিজামের সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধেও সম্মুখ সমরে শামিল হন। আশ্চর্যের বিষয় হল কমিউনিস্ট পার্টিতেও কিন্তু মহিলাদের ভূমিকা ছিল গৌণ। কিছু গবেষক মন্তব্য করেছেন যে, কমিউনিস্টদের মধ্যেও অনেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে বেনিয়ম ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনেছিলেন। একমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ঝাঁসির রানী মহিলা বাহিনীকে পুরুষ সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবার সুযোগ দেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম লিগ উদ্যোগী হয়েছিল মুসলমান মহিলাদের রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসতে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৪৭ এর ভারত ভাগ আবার মহিলাদের পিতৃতন্ত্রের অধীনতায় ঠেলে দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের নারীর সম্ভ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা আস্ফালনের ক্ষেত্র। কোন সম্প্রদায়ের পুরুষ দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের নারী বেশি সংখ্যায় নির্যাতিত হয়েছিল তার ভিত্তিতেই জয় পরাজয় নির্ধারণ হত। পরিসংখ্যান বলছে, বহু সংখ্যক অপহৃত এবং ধর্ষিত মেয়েরা না সরকার না সমাজের থেকে কোনও সুরক্ষা পেয়েছিল। পশ্চিম ভারতে দেশভাগের কথা উঠে এসেছে ঋতু মেনন, কমলা ভাসিন, ঊর্বশী বুটালিয়ার গবেষণায়। যেখানে তারা বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে মহিলারা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। ঠিক তেমনি যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত বাংলার ভাগের উপর গবেষণা গ্রন্থ 'দ্য ট্রমা অ্যান্ড দ্য ট্রায়াম্ফ'-এ উঠে এসেছে বাংলার মেয়েদের দুর্দশার কাহিনী *(The Trauma and the Triumph,* 2003, Bhatkal & Sen, Kolkata)।

১১.৫ উপসংহার

সব দিকে বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, কংগ্রেসের আন্দোলনে যেসব মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। গান্ধীবাদী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণে পুরুষদের সম্মতি ছিল এই কারণে যে—গৃহে যে ভূমিকা মহিলারা পালন করে থাকেন সেই একই ভূমিকা তারা বহির্জগতে বিস্তৃত ক্ষেত্রে পালন করবেন। তাতে তারা ভারতীয় নারীর আদর্শ রূপ থেকে বিচ্যুত হবেন না। কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে তারাও ঐতিহ্যের পরম্পরা ভেঙে নতুন ভূমিকা গ্রহণে সফল হননি। নারীর অধিকার বিষয়টি তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ—

পশ্চিমি পর্যবেক্ষকদের চোখে সভ্যতা দৌড়ে ভারতবর্ষ অনেকটা পিছিয়ে ছিল।

পশ্চিমি পর্যবেক্ষকদের সমালোচনা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ভারতের অতীতে এক স্বর্ণযুগের কল্পনা করেছিলেন যেখানে মহিলাদের অবস্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানজনক।

ধারাবাহিক গতানুগতিকতায় ভারতীয় নারীত্ব নির্মাণে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে অভিজাত জাতীয়তাবাদী পুরুষতন্ত্রের বেশ ভালো বোঝাপড়া ছিল।

উচ্চবর্ণের মহিলাদের মধ্যে যেমন শুচিতা রক্ষার এবং পর্দানসীন হয়ে অন্তঃপুরে লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ করবার দায় ছিল, তেমনি জাতে ওঠবার তাগিদে নিম্নবর্ণের মহিলাদের উপরও এই দায় বর্তে ছিল।

জাতীয়তাবাদীদের দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করার প্রবণতা ছিল। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু নেতৃত্বপদে থেকে গিয়েছিল পুরুষরাই।

১১.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের আলোচনা এবং বিতর্ক কীভাবে প্রথম থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল?

২. পশ্চিমের গবেষকদের সমালোচনায় ভারতীয় পুরুষতন্ত্রের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

৩. পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ভারতীয় পুরুষদের প্রতিক্রিয়া কি মহিলাদের সাহায্য করেছিল? এ বিষয়ে আপনার মত কী?

৪. গান্ধীবাদী আন্দোলন প্রচুর সংখ্যক মহিলাদের যোগদানের কারণ কী?

৫. জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মসূচী কী দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মহিলাদের সাহায্য করেছিল?

৬. উপনিবেশিক শাসনকালে কম্যুনিস্টরা কীভাবে "নারী প্রশ্নে"র মোকাবিলা করেছিলেন?

১১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Chatterjee, Partha. 1984. *Gandhi and Critique of Civil Society. in Subaltern Studies : Writings on South Asian History and Society,* vol. 3, ed. Ranjit Guha. Delhi : Oxford University Press.

Lebra Joyce C. 1986. *The Rani of Jhansi : A Study in Female Heroism in India*. Honolulu University or Hawai Press.

Butalia, Gruashi. 1998. *Side of Silence : Voices from Partition.* Delhi : Penguin Books India.

Menon. Ritu and Bhasin Kawala. 1998. *The Untouchables : Subordination, Povertiy and the State in Modern India.* Cambridge. Cambridge University Press.

Miacall. Gail. 1981. Introducion : 'The Extended Family as a metaphor and the expausion or women's realm'. in *The Extended Family Women and Political Participation in India and Pakistan*, ed. Gail Minault. Delhi. Chauabya Publications.

Sen, Sawiata. 1993. 'Motherhood and Mothercraft : Gender and Nationalism in Bengal'. *Gender and History* 5(2) : 23-43.

Bagchi. Jasodhara and Dasgupta Subhoranjan (eds) 2003. *The Trauma and the Triumph*. Kolkata Bhattal and Sen.

পর্যায়-৪

উপনিবেশিক শাসনের অবসান

একক ১২ ❐ সঠিক দিশার সন্ধানে : সংকটে সমাজ; যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ ভূমিকা

১২.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১২.৩ ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা

১২.৪ কংগ্রেসের ভূমিকা

১২.৫ ১৯৪৩ বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ

১২.৬ ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ : উপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব

১২.৭ মহামারি

১২.৮ বস্ত্রের আকাল ১৯৪৪-৪৫

১২.৯ পতিতাবৃত্তি

১২.১০ শিক্ষা ব্যবস্থার পতন

১২.১১ উপসংহার

১২.১২ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১২.১৩ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা পূর্বভারত বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসের যে দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবেন সেগুলো হল :

- উপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনীতির অবস্থা ও সংকট
- সামাজিক কাঠামোয় এই সংকটের প্রভাব
- বাংলার সমাজের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব
- উপনিবেশিক শাসনের শেষ ভাগে বাংলার সমাজ জীবনে ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের প্রভাব, ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি

১২.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উপনিবেশিক শাসনকালের শেষের দিকে বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। উপনিবেশিক সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তাদের কাছে সরবরাহ করা। এর ফলে বাংলায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। বাজারে চালের যোগানের পরিমাণ এমন সাংঘাতিক পরিমাণে হ্রাস পায় যে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। এই দুর্ভিক্ষ ঘটে উপনিবেশিক নীতির ফলে, কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নয়। তাই এই দুর্ভিক্ষকে মানুষের তৈরি মনুষ্যজাতির এক সংকট বলা হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ব্রিটিশ শাসকদের যুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে সুযোগ নেওয়ার নীতির রীতিমত বিরোধী ছিল।

এদিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) ১৯৪২ সালে এক রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যখন জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে বসে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাছে রাতারাতি তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বদলে রূপান্তরিত হয় "জনগণের" যুদ্ধে। সি.পি.আই সিদ্ধান্ত নেয় বৃহত্তর স্বার্থে অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে পার্টি ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করবে। এই এককে উপনিবেশিক যুগের প্রায় শেষের দিকে বাংলার ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে অবশ্যই প্রাধান্য পাবে এই সময়ে সৃষ্টি হওয়া মানবিক সংকট।

১২.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ২৫ বছরের মধ্যেই ইউরোপের শুরু হল আর এক বিধ্বংসী যুদ্ধ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের নৃশংসতা, বর্বরতা এবং ধ্বংসের পরিমাণ ছাড়িয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা, বর্বরতা ও ধ্বংসের পরিমাণকে। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্য বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। সাধারণ জনগণের উপর আক্রমণ, গণহত্যা, জনজীবনকে ধ্বংস করা হয়ে দাঁড়াল দুই যুযুধান পক্ষের গৃহীত রণনীতি। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করতেই ব্রিটেন এবং ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ওই বছরের ৩রা সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন যে, এই ইউরোপীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩রা সেপ্টেম্বর আরও একটা ঘোষণা শোনা গেল। ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনোরকম কোনও আলোচনা ছাড়াই ব্রিটিশ ভাইসরয় ভারতকে যুদ্ধে সংযুক্ত করলেন। ১১ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তড়িঘড়ি করে ভাইসরয়কে প্রয়োজনে সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আইনকে সংশোধন করে। একই সঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকেও প্রয়োজনে অগ্রাহ্য করে চলবার ক্ষমতাও ভাইসরয়কে দেওয়া হল। ৩রা সেপ্টেম্বর গৃহীত হল ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অর্ডিন্যান্স। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান এবং নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের মতামত অগ্রাহ্য করে আদেশনামা বা ফরমান জারি

করবার ক্ষমতা লাভ করল। এরই ভিত্তিতে ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবার জন্য সরকারের তরফে যেসব প্রক্রিয়া চালু হতে চলেছিল, সেগুলোকে বন্ধ করবার নির্দেশ জারি করলেন ভাইসরয়। ভারতের জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। তারা এই যুদ্ধের এবং ব্রিটিশ সরকারের একতরফা সিদ্ধান্ত, যার ফলে ভারত এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয় উঠলেন। বিপানচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, সে সময়ে কংগ্রেস কিন্তু সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এর ফলে পরবর্তীতে ভারত জড়িয়ে পড়তে চলেছে বিশ্ব জুড়ে চলতে থাকা ফ্যাসিজম বনাম স্বাধীনতা, সমাজবাদ এবং গণতন্ত্রের লড়াই-এ। ১৯৩৬-র লখনউ কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু বিশ্ব সংকট এবং যে সংকটে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ফ্যাসিবাদের আক্রমণের ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব ছিল সমবেদনাপূর্ণ। কংগ্রেস আগ্রহ প্রকাশ করেছিল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সংগ্রামে সাহায্য করবার জন্য।

তবে ভারত যুদ্ধে যোগদান করবার পূর্বে কংগ্রেস দাবি জানিয়েছিল স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার অথবা ভারতীয়দের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী শাসন ক্ষমতার প্রদান করবার। ব্রিটিশ সরকার যে কেবলমাত্র এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় তাই নয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এবং রাজন্যবর্গকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে শুরু করে। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস তার সমস্ত সদস্যদের মন্ত্রীপদ থেকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। ১৯৪০-এর অক্টোবর মাসে গান্ধী সীমিত আকারে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে গান্ধী এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলোকে ব্যাখ্যা করেন এইভাবে :

"যে কোন ব্রিটিশের মতোই কংগ্রেসও চায় নাৎসিবাদের বিজয়কে প্রতিহত করতে। তবে কংগ্রেসের নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা এতটাও বেশি নয় যে, সে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে আগ্রহী। যেহেতু আপনি এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া মিলে ঘোষণা করেছেন যে, সমগ্র ভারতবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধ সমর্থন এবং যুদ্ধে সাহায্য করতে আগ্রহী, তাই এটা বলা অত্যন্ত জরুরী যে বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীর এই যুদ্ধে কোনো আগ্রহ নেই। তাদের কাছে নাৎসিবাদী এবং স্বৈরাচারী ভারত শাসনকারীর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।"

বিনোবা ভাবে প্রথম ব্যক্তি যিনি এই প্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসক ১৯৪১ সালের মে মাসের মধ্যে ২৫ হাজার সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করেন। এরই মধ্যে ১৯৪১ সালে বিশ্বরাজনীতিতে দুটো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। জুন মাসে হিটলারের জার্মানি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে এবং ডিসেম্বর মাসে জাপানিরা পার্ল হারবার আক্রমণ করাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। জেনারেল ম্যাক আর্থারকে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সর্বোচ্চ সেনানায়ক নিযুক্ত করা হয় এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিপতি হিসেবে ক্ষমতায় আসীন করা হয়। তার প্রধান কার্যালয় হয় দিল্লি। এই অবস্থায় জাপান আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে ক্রমশ ফিলিপিনস্, ইন্দো চায়না, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং বার্মা নিজের অধিকারে নিয়ে আসে। ১৯৪২ সালে যখন জাপানিরা রেঙ্গুন জয় করে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে দাঁড়ায় একেবারে ভারতবর্ষের দোরগোড়ায়।

১২.৩ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সি.পি.আই) অবস্থান ছিল গোড়া থেকেই যুদ্ধ বিরোধী। যুদ্ধের বিরুদ্ধে পার্টি সাধারণ মানুষকেও সাবধান করে দিয়েছিল আগে থেকেই। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টির তরফ থেকে যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণা প্রকাশ হবার আগেই। কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান প্রকাশ পাচ্ছিল ন্যাশনাল ফ্রন্টে প্রকাশিত নানা লেখা ও ইস্তাহারের মাধ্যমে এবং কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে। ১৯৩৯-এর অক্টোবরে সিপিআই-এর পলিটব্যুরো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকরে "স্টেটমেন্ট অফ দ্য পলিটব্যুরো : সিপিআই পলিসি অ্যান্ড টাস্কস ইন দ্য পিরিয়ড অফ ওয়ার" এই নামে। এই সিদ্ধান্তটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসের "কমিউনিস্ট"-এ (ভলিউম-২, সংখ্যা-১)। তখন পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট ছিল বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান পত্রিকা। এই লেখায় স্পষ্ট করে দাবি করা হয়েছিল যে, "ইউরোপে চলা এই বিশ্বযুদ্ধ কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই নয়, এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদের কারণে ঘটা মহাযুদ্ধের উত্তরসূরী"। "না এক পাই, না এক ভাই" এই স্লোগান দিয়ে সিপিআই সারা ভারতবর্ষ-ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল।

যুদ্ধ এক নতুন দিকে মোড় নিল যখন ১৯৪১ সালের জুন মাসের হিটলারের জার্মানি আক্রমণ করল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেসময় ছিল কমিউনিস্ট দুনিয়ার নেতা, বিশ্বের কমিউনিস্ট নীতির প্রধান নির্ধারক। জার্মানি কর্তৃক সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার ফলে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের এতদিনকার অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল। যুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতির পরিবর্তন ঘটে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মরক্ষার খাতিরে ফ্রান্স, ব্রিটেন ইত্যাদি পুঁজিপতি এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধল। ভারতের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন সেপ্টেম্বর মাসে। যাদে বলা হল, উপনিবেশিক শাসনাধীন হলেও ভারতীয় কমিউনিস্টরা এ নিয়ে এ সময়ে সমস্যা সৃষ্টি না করে অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে তারা সমর্থন করবেন, অন্তত যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একযোগে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে।

বিদেশ থেকে যদিও নির্দেশাবলী এল যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, তৎ সত্ত্বেও সিপিআই-এর ভিতর এই নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা যেমন এস. এ. ডাঙ্গে, মুজাফফর আহমেদ, বি. টি. রনদিভে যারা ১৯৪০-৪১ এ গ্রেফতার হয়ে আটক হয়েছিলেন আজমীর-মেরওয়ারাতে দেওলা ক্যাম্পে, তাদের সঙ্গে সেই সময়কার বিশৃঙ্খল এবং বেআইনি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া পার্টির নেতা পি. সি. যোশীর দ্বন্দ্ব শুরু হল। দেওলি তত্ত্ব অনুযায়ী স্টালিনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হল যে, স্টালিন কখনও এই যুদ্ধকে সরকারের স্বার্থে যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেননি। তার কাছে এ যুদ্ধ সাধারণ মানুষর যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। "অতএব এই যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ এবং আমেরিকার জনগণের যুদ্ধ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। তাই এ যুদ্ধ আমাদেরও যুদ্ধ, আমরা তাই এ যুদ্ধে সামিল হব।"

বেআইনি বলে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা তাদের মতামতে বললেন যে, একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরদার যুদ্ধ দ্বারাই আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যথার্থভাবে সাহায্য করা হবে। নভেম্বর পর্যন্ত পার্টির অন্দরে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং তর্কবিতর্ক চলতে থাকল। অবশেষে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে পলিটব্যুরো আনুষ্ঠানিকভাবে "সাধারণ মানুষের যুদ্ধ" এই তত্ত্বকে গ্রহণ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সিপিআই-র কার্যক্রম সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে তাহলে এটাই বোঝা যায় যে, প্রথম থেকেই সিপিআই বিনা বাধায়, তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষিতে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধে পরিবর্তিত" হয়ে যাওয়াটা মেনে নেয়নি।

১২.৪ কংগ্রেসের ভূমিকা

ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটি গান্ধীকে অগ্রাহ্য করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। যাতে বলা হয়, কংগ্রেস ব্রিটিশদের যুদ্ধে সহায়তা করবে, যদি তারা যুদ্ধের পর ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়। যেহেতু যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে এগোচ্ছিল তাই ব্রিটিশ নাছোড়বান্দা ছিল—যে করেই হোক ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন আদায় করতে হবে। তাই লর্ড লিনলিথগো একটা প্রস্তাব রাখলেন যে, যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সংবিধান তৈরির জন্য একটা সভা গঠিত হবে। তাঁর এর সঙ্গে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের এই আশ্বাসও দিলেন যে, জাতীয় জীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কখনই তাদের স্বার্থহানি করা হবে না। ১৯৪২ এর মার্চ মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন। তার সঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভার সদস্যদের, হরিজনদের প্রতিনিধিদের, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবর্গের উদারপন্থীদের আলোচনা হয়। আলোচনার উপর ভিত্তি করে ৩০ মার্চ, ১৯৪২ সালে কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন তা ভারতীয় নেতৃবর্গ মানতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেসের স্বাধীন ভারতের দাবি ব্রিটিশ খারিজ করে দেয় ফলে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয়। মুসলিম লীগের আপত্তির কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে ভারত ভাগের তত্ত্বকে মেনে নেয়নি। এছাড়া ক্রিপস শিখদের বলেছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ভর করবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের বোঝাপড়া হবে তার ভিত্তিতে।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ভারতের সর্বস্তরের মানুষের মধ্য এক ধরনের হতাশা সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী এক নতুন রাজনৈতিক অভিযান "সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ" শুরু করলেন। এই রাজনৈতিক আন্দোলনটি কিন্তু জনপ্রিয় হয়ে উঠে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন নামে। ১৪ই জুলাই, ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভা ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ চেয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একই বছরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি এই প্রস্তাব অধিগ্রহণ করেও তার মতামত প্রকাশ করে বলে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয়দের জন্য তো বটেই, বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করে একটি সফল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও। ভারতের ব্রিটিশ শাসন ক্রমাগত ভারতকে দুর্বল করে তুলেছে এবং তাকে ধীরে ধীরে আত্মরক্ষায় অযোগ্য করে তুলেছে। এর ফলে বিশ্বে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ভারতের ভূমিকা গুরুত্ব হারাচ্ছে।

পরদিন ভোরবেলায়, এইসব কারণের জন্য গান্ধী এবং কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। কংগ্রেস সংগঠনকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হয়। নেতৃত্বহীন জনগণ আন্দোলনে সামিল হন। যেমনভাবে ইচ্ছে তেমনভাবেই তারা প্রতিবাদ ও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কোথাও মানুষ ধর্মঘট ডাকে, কোথাও বা জনসভা। ব্রিটিশ শাসনের যে কোনও চিহ্নকে তারা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রকাশ পেয়েছিল বিদেশি শাসক ও শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং সেই সঙ্গে সুগভীর স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতা লাভের জন্যে সংগ্রামে আপোষহীন যোগদান ও তার জন্য স্বার্থত্যাগের অভিপ্রায়। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ভারতবাসীর এই মনোভাব ব্যক্ত হওয়ার ব্রিটিশ শাসক এই বার্তা পেল যে, ভারতবাসীর স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা লাভের সুদৃঢ় অভিপ্রায়কে অগ্রাহ্য করে তাদের পক্ষে ভারত শাসন করা অসম্ভব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট এক আর্থিক সংকট। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে দেখা দিয়েছিল মন্দা, যার ফলে ঘটেছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। অথচ কমেছিল বেতনের হার। ১৯৪০-এ তাই পরপর ঘটেছিল ধর্মঘট। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গৃহীত প্রস্তাব একইসঙ্গে খারিজ করেছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের প্রতি কোনওরকমের কোনও সমর্থনকে। এই সময় জামিদারি প্রথা বিলুপ্তির দাবি এবং জমিতে কৃষকের অধিকারের দাবি নিয়ে কিষাণ সভাগুলো শুরু করেছিল প্রতিবাদী আন্দোলন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিহারে বকস্থ (Bakasht) ও বাংলায় হাত-তোলা ও আঁধিয়ার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষগুলোই শুধু নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা, বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষজনেরাও।

১২.৫ ১৯৪৩ সালে বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ

বিপানচন্দ্রর মতে, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির প্রধান ফলাফল ছিল ভারতের এবং ভারতীয়দের তীব্র দারিদ্র্য। ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ যেহেতু ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রধান নীতি তাই সেটাই ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণ, দেশীয় শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নতির ব্যর্থতা, উচ্চহারের কর ব্যবস্থা, ভারতীয় ধন সম্পদের নিষ্কাশন, কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, জমির মালিক, রাজন্যবর্গের সদস্য, সুদখোর মহাজন, বণিক এবং সর্বোপরি দরিদ্র কৃষকদের প্রতি শোষণ ধীরে ধীরে ভারতের জনগণকে চরম দারিদ্রসীমার নিচে নামিয়ে আনছিল যে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার কোন উপায় ছিল না। এই চরম অর্থনৈতিক অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল ১৯৪৩ সালে যখন বাংলার মানুষকে আর একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হল। দুর্ভিক্ষের মতো সংকট বাঙালি এর আগে খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন ঘটেছে বিপর্যয় তেমনি ঘটেছে মৃত্যু। সে সময় স্বাভাবিক মৃত্যুহার ছিল প্রতিবছরে প্রায় ৭ লক্ষ এর মতো, সেখানে ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ছাপিয়ে গিয়েছিল ৩৫ লক্ষে। ৩০ লক্ষ পরিবার ঘরবাড়ি হারিয়ে পথে বসেছিল। ১১ লক্ষ পরিবার হয়েছিল সর্বস্বান্ত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল এই দুর্ভিক্ষের প্রভাব কিন্তু সকল শ্রেণির মানুষের উপর যা বাংলার সব জেলার উপর এক ভাবে পড়েনি।

১২.৬ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ : উপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তার এক ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণায় ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষের সম্পর্কে লিখেছেন—"এরপর এল ১৯৪৩। সমগ্র বাংলা, বিশেষ করে কলকাতার ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষের ঘন কালো মেঘ। আমার পক্ষে আর ঘরে থাকা সম্ভব হল না, বেরিয়ে পড়লাম পথে। একদিকে এসপ্ল্যানেড, কালীঘাট, লেক মার্কেটের মোড় আর অন্যদিকে শিয়ালদহ আর শ্যামবাজারের মোড়—যে দিকে তাকাই সে একই দৃশ্য চোখে পড়ে। শয়ে শয়ে কঙ্কালসার শরীর ভাতের ফ্যান ভিক্ষা চাইছে। মনুষ্যত্বের কি চরম অবমাননা! ডাস্টবিনে পড়ে থাকা খাবারের পচা উচ্ছিষ্টকে খাবে তাই নিয়ে মানুষে জন্তুতে লড়াই, কুকুরে মানুষের লড়াই। পোকামাকড়ের মতো লোক মরেছে। একদিন রাস্তায় পাওয়া গেল একটি মায়ের মৃতদেহ। ক্ষুধার্ত শিশু, খাওয়ার অশায় কাঁদতে কাঁদতে মায়ের স্তন বৃন্ত ধরে টানছে।"

এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মহিলা এবং শিশু। মনুষ্য সমাজের উপর এই ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ চিরকালের জন্য রেখে গিয়েছে সুগভীর এবং সুদীর্ঘ এক ক্ষতচিহ্ন। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার এক সাংবাদিক ১৯৪৩ এর অক্টোবরের ১১ তারিখে চাঁদপুর থেকে একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ পাঠান। অষ্ট-মহামায়াতে (থানা ফরিদগঞ্জ) রান্না খাবার বিতরণ করবার যে কেন্দ্রটি বেঙ্গল রিলিফ কমিটির তত্ত্বাবধানে খোলা হয়, তাতে ক্ষুধায় কাতর শিশু কোলে এক মা খেতে বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই মায়ের কোলে শিশুটির মৃত্যু ঘটে, মা কিন্তু খাওয়া না ছেড়ে উঠে যায়নি। খাওয়া শেষ করে তবেই মৃত শিশু কোলে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বক্তব্যের একটি অংশ এখানে সংযোজিত করা যেতে পারে। শ্রীমতি পণ্ডিত বিধ্বস্থ মেদিনীপুরের কিছু জায়গায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছিলেন, এক মৃত মহিলার এক হাতে ছেঁড়া কিছু কাপড়ের টুকরো এবং অন্য হতে একটি মাটির পাত্র—এই ছিল তার পার্থিব জগতের সম্পদ। তাই আঁকড়ে ধরে তিনি পড়ে আছেন। তবে এসব ঘটনায় ফিকে হয়ে যায়,যদি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ফলে যা বাস্তবে ঘটেছিল সেসবের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ যার বিধ্বংসী প্রভাবে বাংলা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যাতে বাংলার এক বিপুল অংশের মানুষের মৃত্যু ঘটে তা আসলে কৃত্রিম ভাবে মানুষের তৈরি করা এক দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের কৃত্রিম অভাবকে স্থায়ী করা হয়েছিল মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য। ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন এর ফলে। লাখে লাখে পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছিল। কৃষকদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ হারিয়েছিলেন কৃষিকাজ থেকে ভবিষ্যতের উপার্জন করার সুযোগ।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পৌঁছল এশিয়ায়। জাপানি সৈন্য ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। মিত্রশক্তি আসাম ও বাংলায় ঘাঁটি গড়ল। এদিকে জাপানিরা রেঙ্গুন জয় করবার পর বর্মা থেকে উৎখাত হয়ে বিরাট সংখ্যায় উদ্বাস্তুরা ঢুকতে শুরু করল বাংলায়। এই জনসংখ্যার বাড়তি চাপের ফলে অর্থনৈতিক এবং খাদ্য সংকট চরম রূপ ধারণ করল। Scrohed-earth নীতি (অর্থাৎ

যাতায়াতের পথে উপলব্ধ সমস্ত সুযোগ-সুবিধাকে ইচ্ছে করে নষ্ট করে দেওয়া। যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে) অধিগ্রহণ এবং খাদ্যশস্যের অবাধ রপ্তানি নীতি নাকচ করে ব্রিটিশ শাসক অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। এছাড়াও মূলত খাদ্যশস্য সরবরাহ করবার জন্য ব্যবহৃত নৌকা এবং সৈন্যদলকে খাওয়াবার জন্য বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ চাল কিনে সরকার দুর্ভিক্ষের সংকটকে চরমে পৌঁছে দেয়। সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সে খাদ্যশস্য হোক অথবা প্রাণদায়ী জরুরী ওষুধই হোক সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ অটুট রাখার প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষর জীবনধারনের ন্যূনতম চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে চলার নীতি গ্রহণ করে। লেখক গোপালচন্দ্র হালদারের লেখনীতে সে অবস্থার বিবরণী পাওয়া যায়—

"রাতারাতি বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গেল। সংবাদপত্র চিঠি টেলিগ্রাফ মারফত খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বরিশালে চাল বাড়ন্ত অথচ মাত্র কয়েকদিন আগেই ত্রিপুরা থেকে চাল এসেছিল আর এখন চাল উধাও। পাবনায় চাল বাড়ন্ত। সারা বাংলা জুড়েই একই কথা মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চাল বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেল। কোথাও তার এতটুকুও কণা পর্যন্ত পড়ে নেই।"

সংকটের মোকাবিলায় প্রশাসন নিজেকে চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রমাণ করল। এছাড়াও দুর্ভিক্ষের জন্য আর অন্য সব কারণ যেগুলো দায়ী ছিল সেগুলো হল—সরকারের কোনও নির্দিষ্ট খাদ্যনীতি না মানা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ নীতি, চাল সংগ্রহ করবার প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যবস্থা, কালোবাজারি এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফার লক্ষ্য, সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা না আনা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক দলগুলার দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি জাপানি আগ্রাসনের মোকাবিলায় গৃহীত সরকারের "Denial Policy"—এইসব কারণের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিশেষ করে খাদ্যশস্যের চূড়ান্ত স্বল্পতা দেখা গেল। জোগান কম হবার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটল এবং অবশেষে ঘটল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা অবশ্যই মানুষর ভ্রান্ত এবং শোষণ নীতির ফল।

স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে অনুসন্ধান কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে, সরকার আগে থেকেই আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। ১৫০ কোটির মুনাফা করতে সরকার খুব সচেতন ভাবেই ৩৫ লাখ মানুষ মারার পরিকল্পনা করেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে দুর্ভিক্ষের সময়ও ভারত বিদেশ চাল রপ্তানি করেছে। যদিও ভারত সরকারে খাদ্য দপ্তরের সদস্য এন. আর. সরকার তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, ১৯৪৩-এর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে একটি কণা পর্যন্ত রপ্তানি করা যায়নি। অথচ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৪১-৪২-এ ৫৫ হাজার টন চাল ভারত রপ্তানি করেছে যার পরিমাণ পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ এ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন, যার মধ্যে বাংলায় উৎপাদিত চালের পরিমাণ ছিল ৬০%। এর থেকে বোঝা যায় যে সরকার নিজেই নিজের আইন ভঙ্গ করেছিল, নিজেই নিজের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। ভারত সরকারের খাদ্য-দপ্তরের সেক্রেটারি আর. এইচ. হ্যাচিং ২ আগস্ট ১৯৪৪, অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান গোপাল গান্ধীকে যে টেলিগ্রামটি পাঠান

তাতে স্বীকার করেন যে, ইতালি এবং মধ্যপ্রাচ্যে যে সেনাবাহিনী অবস্থান করেছিল তাদের জন্য দুর্ভিক্ষের সময়ও খাদ্যশস্য পাঠান হয়েছে। ১৯৪৩-এ তার পরিমাণ ছিল ১,০১,৩৪০ টন এবং ১৯৪৪-এ সে পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫৯,১৩৩ টন।

বিদেশের মাটিতে যুদ্ধরত সেনাদের জন্য ভারত সরকার যে কেবল খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছে তাই নয়, তার আরও একটি দুর্নীতি হল পাঞ্জাব থেকে গম কিনে তা বাংলায় অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করে এক কোটি টাকার মুনাফা করেছে। এছাড়াও ভারত সরকারের ডিরেক্টর অফ মিউনিশনস প্রোডাক্টশনস ই. উড তার বয়ানে বলেছেন যে, বাংলায় প্রাদেশিক সরকারও দুর্নীতি করেছ। ভারত সরকারের থেকে খাদ্যশস্য কিনে মানুষের কাছে তা অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করে ৭৫ হাজার টাকা প্রতি মাসে মুনাফা লুটেছে। এ সময়ে কলকাতা কর্পোরেশন কলকাতায় রেশন ব্যবস্থা চালু করবার জন্য যে ন্যায্য আবেদন করেছিল বাংলার সরকার তা অগ্রাহ্য করেছে।

এল. জি. পিনেল বাংলা সরকারের স্পেশাল অফিসারের থেকে আরও আশ্চর্যজনক খবর শোনা গেল—আগামী বছরের চাষের পরিমাণ বাড়ানো জন্য এক ব্যবসায়ী চাষীদের টাকা ধার দিয়েছিলেন অথচ উনি ভালো করেই জানতেন সরকারের নেতিবাচক নীতি বা Denial Policy-র জন্য উৎপাদিত শস্য বাজারে সরবরাহ করা অসম্ভব ব্যাপার। এটা জেনেও তিনি বিদেশ থেকে আনা টাকা ওই নিরর্থক প্রকল্প লগ্নী করেছিলেন। Mcenes এর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী মুসলিম লীগের সদস্য এইচ এস সুরাবর্দি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইস্পাহানিকে একচ্ছত্র অধিকার দিয়েছিলেন চাল কেনবার। ইস্পাহানি বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন নামে চাল কিনে বাংলা সরকারের কাছে অত্যন্ত উচ্চমূল্যে বিক্রি করেছিলেন।

বাংলা রাজনৈতিক শাসক দল কেবল নয়, দুর্নীতিতে বিরোধীদলও পিছিয়ে ছিল না। হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সদস্যরা ইস্পাহানের কালোবাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কিন্তু সেই একই অপরাধ যখন রণদাপ্রসাদ সাহা বা এইচ দত্ত করেছিলেন তখন কিন্তু প্রতিবাদ জানাননি। Mcenes-এর বক্তব্য রণদাপ্রসাদ সাহা যেসব অঞ্চল ব্রিটিশ ডিনায়াল নীতি অনুসারে সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছিল, সেসব অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল কেনেন কিন্তু তার কোনও সঠিক হিসাব তিনি দিতে পারেননি। যদিও বলা হয় রাজনীতি ছিল ভারতের ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ এর এই সময়ের মধ্য যেসব কালোবাজারীরা প্রভূত পরিমাণে মুনাফা লুটল এবং যে জন্য ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হল তাদের কি জাত, কি ধর্ম তারা কোন সম্প্রদায়ের লোক? সেখানে তো হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ছিল না। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দুর্বল মানুষের দুর্দশার কারণ হয়েছিল।

এফ. ই. সি-র সদস্য নানাবতীর বয়ান থেকে জানা যয় যে, "বাংলাকে দেওয়া ২,০২,০০০ টান খাদ্যশস্যের মধ্যে ১,৪০০০০ টন কলকাতার জন্য রেখে বাকি মাত্র ৬২,০০০ টন বিভিন্ন জেলাগুলোতে বন্টন করা হয়। যদিও সে সময় জাপানি সেনার ভয়ে দলে দলে লোক কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু

করেছিল। এ বিষয়ে এল. জি. পিনেল মন্তব্য করেছেন যে, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কলকাতায় বোমাতঙ্ক খাদ্য সংকটের সমস্যার সমাধান এনে দিল। বাংলার সরকার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তত্ত্বাবধানে একটি ফুড স্টাফ স্কিম অর্থাৎ সরকারি এবং বেসরকারি কর্মচারীদের খাদ্য পরিবেশন ও জরুরী পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। অসংখ্য গুদামে বহুল পরিমাণে চাল সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। এইসব গুদামে সংরক্ষিত চাল থেকে গড়ে প্রায় ১,২০,২২৭ টন মণ চাল সরবরাহ করা হত বিভিন্ন কলকারখানা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। মন্ত্রী পি. এন. ব্যানার্জি কমিশনের সামনে বলেন যে, "ডিনায়েল অঞ্চলগুলো থেকে ৪,৭৬,০০০ টন চাল সংগৃহীত করা হয়েছিল তার মধ্যে থেকে মাত্র ৮৬,৮৪৮ টন চাল পূর্ববঙ্গে বিলি করবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ৫২,৭১৬ টন চাল বন্টন করা হয়েছিল বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে। বাকি ৩,৩৬,৪৩৬ টন চালের থেকেও ৬২,৭১৬ টন রপ্তানি করা হয়েছিল সিলোনে। তারপরে যা উদ্বৃত্ত ছিল তা বন্টন করা হয়েছিল কলকাতা ও তার আশেপাশের শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা ও সৈন্যদের মধ্যে। এর মানে যেটা দাঁড়ায় যে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ ছিল। যা কেবল কলকাতা এবং কলকাতার আশে পাশের শিল্পাঞ্চলের যেখানে প্রায় ৫০% মতো যুদ্ধের প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন হত সেসব অঞ্চলের লোকেদের খাওয়ার যোগান দিতে ব্যবহার করা হত। সেজন্যই শহর কলকাতায় একটি মানুষও না খেতে পেয়ে প্রাণ হারাতে হয়নি। নানাবতীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর মধ্যে ফুটে উঠেছে চিরকালীন শহুরে ও গ্রামীণ স্বার্থের সংঘাতের চিত্র। অসংগঠিত গ্রাম্য মানুষের দুর্ভিক্ষের কবলে পড়াটা ছিল সরকারি নীতির দ্বারা অনুমোদিত। কিন্তু কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত আর শিল্পে নিয়োজিত উৎপাদনের জন্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সরকারি নীতি দুর্ভিক্ষে কবলে পড়তে দেয়নি।

যুক্তি ছিল যে, গ্রামের মানুষ অনাহারে অভ্যস্ত কিন্তু শহরে খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হলে প্রতিবাদ বা আন্দোলনের একটা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। বলাই বাহুল্য যে কলকাতার কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁয় দুর্ভিক্ষের সময়ও কোনো খাদ্যের অভাব বা ঘাটতি টের পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক হীল তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য বিপুল পরিমাণে চাল মজুত করা ছিল তাতে পচন ধরে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছিল। যখন কলকাতার রাস্তায় না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে গ্রাম থেকে আসা হাজারো মানুষ।

আবার আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের থেকে কলকাতাকে রক্ষা করবার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বাংলা সরকারের বিশেষ আধিকারিক এল. জি. পিনেল এ বিষয়ে কমিশনের সামনে স্বীকার করেন যে জাপানি আগ্রাসন ঠেকাতে কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। সেক্ষেত্রে জাপানিরা, যে কেন ভারতবর্ষে আক্রমণ করল না তা ওর কাছে বোধগম্য নয়। এইরকম একটা সংকটের সময় সরকারের পক্ষ থেকে যেসব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সামান্য। অথচ ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন লন্ডন শহরে যখন বোমা পড়েছে তখনও কিন্তু সেখানে অনাহারে কারুর মৃত্যুর কথা শোনা যায়নি। অথচ বাংলা সরাসরি তো যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না তাতেও বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং এ নিয়ে কোন প্রতিবাদও হয়নি।

দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের কাছে ১৯৪৩ সালের কলকাতার মৃত্যুহারের গতিপ্রকৃতিতে ধরা পড়েছে ভিন্নতা। প্রথমদিকে বেশি সংখ্যক পুরুষের মৃত্যু ঘটলেও পরের দিকে মহিলাদের মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। নথিপত্রের হিসাব মতে দেখা যাচ্ছে যে মৃত্যুহার সবচাইতে বেশি এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের। তারপর ৫ বছর থেকে ১০ বছরের শিশুদের এবং ৬০ বছরের উপরে যাদের বয়স সেই সব মানুষের। মৃত্যুহারের হিসাব থেকে যে তথ্য উঠে আসছে তা হল শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধদের মৃত্যুহার সবচাইতে বেশি কারণ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের মধ্যে এরাই বেশি সংখ্যায় কলকাতা শহরে ত্রাণ ও খাদ্যের সন্ধানে এসেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যাভাব সুরক্ষিত অন্তপুরে থাকা বাঙালি মহিলাদের টেনে এনেছিল বাইরের দুনিয়ায়। মহিলা সংগঠনগুলো যেমন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, এআইডব্লিউস, পিআরসি, এই সময় এগিয়ে এসেছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষজনের সাহায্যে; আইসিএস অশোক মিত্রের লেখায় সে সময়ের চিত্র ধরা আছে—"ছেঁড়া কাপড়ে শিশু কোলে মহিলারা এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে এক হাতা ফ্যান ভিক্ষা চেয়ে, কলকাতায় দুর্ভিক্ষের সময় এ ছিল নিত্যকার ব্যাপার। তবুও আমি একজন স্বামী এবং বাবা হিসেবে এ দৃশ্য দেখে ভেতরে কেঁপে উঠেছিলাম।"

এরকম একটা ভয়াবহ অবস্থা সরকারের ভূমিকা ছিল সীমিত। এই কারণে উপনিবেশিক সরকারকে কঠোর সমালোচনা ও নিন্দার মুখেও পড়তে হয়েছে। খাদ্য বিতরণের জন্য সরকার সরাসরি ২৬৭৮টি রান্না করা খাদ্যসরবরাহ কেন্দ্র চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিল এছাড়াও আরও ১০৭৯টি রান্না করা খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র চালানোর জন্য অনুদান দিয়েছিল (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৩)। ডিসেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জের এসডিও সংবাদ মাধ্যমকে অভিযোগ জানান যে ৯ লাখ মানুষের মধ্যে ৭ লাখ মানুষ ত্রাণের অপেক্ষায় থাকলেও সরকারি ত্রাণ এসেছে ১৫ হাজার মানুষের জন্য। দুর্ভিক্ষের পরও যেসব মানুষ বেঁচে ছিলেন তারা সব কিছু ঘরবাড়ি, জমি, জীবিকা হারিয়ে পরিণত হয়েছিল ভবঘুরে এবং ভিখারিতে।

দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত ১৫ মহকুমার রিপোর্টের থেকে জানা গেছে যে, প্রতিটি মহকুমায় গড় অন্তত ৭ শতাংশ পরিবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলার গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। বহু গ্রামীণ পরিবার হয়েছিল ছিন্নমূল এবং ছন্নছাড়া।

১২.৭ মহামারি

দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল মহামারি বাংলায় দুর্ভিক্ষের পরপরই এল নানা রোগ ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত এবং কলেরা। বাংলায় মড়ক শুরু হল। আর এই মড়কে বা মহামারিতে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যাকে। এ প্রসঙ্গে বাংলার প্রাক্তন সহকারী সার্জেন্ট (দুর্ভিক্ষ ত্রাণ) জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে. এস. ফিচ-এর রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন চরম অনাহারে

থাকা মানুষগুলির অবস্থার উপর। অনাহারের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর। বিভিন্ন দুর্ভিক্ষের সময় জরুরী নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো ওযুধপত্রেও আকাল দেখা দিয়েছিল। সরকার যেমন দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করেছে এই মহামারির ক্ষেত্রেও নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। মহামারি এমন একটা সংকটের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে, চিকিৎসা জগতের সঙ্গে জড়িত যেসব সংস্থাগুলো ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত অর্থাৎ Medical Relief Organization—সেইসব সংস্থাগুলো একত্রিত হয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অধীনে বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, দু'কোটি লোক সে সময় মহামারিতে আক্রান্ত হয়। বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটি ১৩ লাখ রোগীর চিকিৎসা করে এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসার জন্য ৫৫টি দল পাঠায়। এছাড়াও বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটির নির্দেশে অন্যান্য ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকেও ১৫০টি চিকিৎসা শিবির চালু করা হয়। ২০ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪ পর্যন্ত চিকিৎসকদের অধীনে সরকার মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ে পরিষেবা দেওয়া হয়। বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটির সঙ্গে এ সময়ে একযোগে কাজ করেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, পিপলস রিলিফ কমিটি সহ আরও অন্যান্য অনেক সংগঠন।

এইসব সংগঠনগুলো প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি অসুখ নির্ধারণের জন্য টিকাকরণের ব্যবস্থা এইসব কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়াও প্রয়োজনে পীড়িতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তারা পালন করত। প্রসঙ্গত আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল যে, চিকিৎসা ক্ষেত্রের এত রকমের অপ্রতুলতা থাকার শর্তেও চট্টগ্রামে অনাথ শিশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালটি অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়, দুঃখের বিষয় এই ধরনের হাসপাতাল পূর্ব ভারতে এই একটিই ছিল।

১২.৮ বস্ত্রের আকাল (১৯৪৪-৪৫)

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব আর মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে এ সময়ে ঘটেছিল এমন একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি যা সত্যিই দেশের ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি। বস্ত্রের আকাল এমনই একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। চিরকাল এই ভারতীয় সমাজে অন্যান্য কারিগরদের সঙ্গে তুলনায় তাঁতিদের অবস্থা খানিকটা উন্নত ছিল। বাংলায় তাঁতির সংখ্যা সেসময় ছিল আনুমানিক প্রায় ২ লাখ আর তাদের পরিবার-পরিজন ইত্যাদি নিয়ে তাঁতি গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ লাখ। বাংলার বস্ত্রের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে এইসব তাঁতি পরিবারের সদস্যদের উৎপাদিত বস্ত্র। কিন্তু পরিবারগুলির অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এই কারণে দুর্ভিক্ষের পরপর তাঁত শিল্পের উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাঁত শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। যেহেতু তাঁতিরা দুর্ভিক্ষের জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল তাই ১৯৪৪-৪৫ সালে দেখা দিয়েছিল বস্ত্রের ঘাটতি। এই প্রেক্ষাপটে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল। কালোবাজারিদের হাতে পড়ে নিরুপায় সাধারণ তাঁতিরা প্রায় তাদের চুক্তিভুক্ত শ্রমিকে পরিণত হল।

বাংলার তাঁত শিল্প প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। সুতোর অভাবে জেলায় জেলায় হাজার হাজার তাঁত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রইল। এদিকে বাংলার সুতোর যোগান কম হয়ে যাওয়ায় আবার বহু কাপড়ের মিল বন্ধ হয়ে গেল। বোম্বের উঁচু মহলে খোঁজ নিয়ে অবশ্য জানা গেল যে তাঁতিদের পরিস্থিতি সংকটময় হলেও এ ধরনের বস্ত্রের আকাল হবার কোন কারণই ছিল না। তাছাড়া কাপড়ের যোগান যথেষ্টই ছিল।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যেমন ছিল মানুষের দ্বারা সৃষ্টি তেমনি বস্ত্রের আকালের জন্য দায়ী ছিল কিছু সংখ্যক মানুষ। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন খাদ্যশস্য, ওষুধ, কেরোসিন বাজার থেকে উধাও হয়েছিল ঠিক তেমনি বস্ত্র উৎপাদনের যাবতীয় সরঞ্জামও খোলা বাজারে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, যদিও কালোবাজারে এইসবই পাওয়া যেত। উৎপাদনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সুতো, সুতোর রং ইত্যাদি তাঁতিদের তাই কিনতে হত কালোবাজার থেকে। এই সময়ে কালোবাজার অর্থনীতি বাংলায় জাঁকিয়ে বসেছিল। কালোবাজার দমন করবার অক্ষমতা এবং সরকারি দুর্নীতি এই দুইয়ের সংযোগে বস্ত্রের সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। সংকট থেকে তা পরিণত হয়েছিল আকালে, কেবল উচ্চপদস্থ প্রশাসনিকদের, কালোবাজারিদের এবং মজুতদারদের আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে।

তাই ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের পর পরই বাংলার জনসাধারণ আরও এক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল। এই বিপর্যয়েও সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছিল মহিলাদের ওপর। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ ভোগ করেছিল মেয়েরা। পরনের কাপড় না থাকায় বাড়ির বাইরে তারা কাজকর্মে বেরোতে পারত না। ফলে তাদের উপার্জনের সুযোগ রইল না। তাদের আর্থিক দিক থেকে কাজকর্মে বেরোতে পারত না। ফলে তাদের উপার্জনের সুযোগ রইল না। তাদের আর্থিক দিক থেকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হল। এছাড়াও খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে যে বেশ কিছু খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল কাপড়ের অভাবে মহিলারা সেখানেও গিয়েও খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতেন না। ফলে অনেক মহিলাকেই অনেক সময় অনাহারে দিন কাটাতে হত। খাদ্য বিতরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেসময় কিন্তু বস্ত্র বিতরণের সেরকম কোনোও উদ্যোগই ছিল না। বস্ত্রের অভাবে প্রচুর সংখ্যক পরিবারকে পরনের কাপড় জোগাড় করবার আশায় গ্রাম থেকে শহরমুখী করে তুলেছিল। চট্টগ্রামের মহিলারা নিজেদের দেহের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করেছেন এ তথ্য আছে। দুর্ভিক্ষ আর মড়কের সময় সরকার যেমন নির্বাক দর্শক হয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। এই বস্ত্র আকালের সময়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১২.৯ দেহ ব্যবসা

দুর্ভিক্ষের পর যথারীতি নতুন করে আবার চাষবাসের কাজ শুরু হল। ধীরে ধীরে কলকাতা শহরের জৌলুস আবার ফিরে আসতে শুরু করল। কিন্তু ততদিনে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে শুরু হয়েছে সামাজিক অবক্ষয় এবং নৈতিকতার পতন। বাংলার দুর্ভিক্ষের উপর লেখায় তারক দাস যে পরিসংখ্যান দেখিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া স্বামীর সংখ্যা যেখানে ১৯.৮৫%, সেখানে ৫০.৪২% হল স্বামী

পরিত্যাগিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা। যৌথ রান্নাঘর ও বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পর অসহায় মহিলাদের আর অন্য কোথাও খাওয়ার জায়গা রইল না। অপুষ্টিতে তারা ভগ্নস্বাস্থ্য ফলে সন্তান ধারণের ক্ষমতাও তাদের হ্রাস পেয়েইছিল। এই অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে যখন জন্মের হার তীব্রভাবে কমে গিয়েছিল। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রচুর মহিলা বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ডাঃ সৌরেন বসু একটি বক্তৃতায় বলেন—"১৯৪৪ সালের পর পতিতার সংখ্যা ১৯৩৮ সালে যা ছিল তা থেকে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।"

১২.১০ শিক্ষা ব্যবস্থার পতন

মোটামুটি ভাবে দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে থেকেই বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরতলী এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। প্রচুর সংখ্যায় স্কুল শিক্ষক স্বল্প আয়ের জন্য নিজেদের বৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হন। বস্ত্রের আকালের জন্য উপযুক্ত পোশাকের অভাবে অনেক শিক্ষক বিদ্যালয় আসতেও অসমর্থ হন। দুঃখের বিষয় দেশপ্রেমী নেতারা বিদেশি শাসনাধীন থেকেও প্রায় ১৫০ বছরের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে ধীরে ধীরে বাংলায় উচ্চমানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন ফলে সারাদেশের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। কিন্তু তিন বছর ধরে চলতে থাকা নানা সংকট বাংলায় এই উচ্চমানের শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল। ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, সে সময় গ্রামাঞ্চলের ২৫ হাজার শিক্ষক একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। দুর্নীতির বাতাবরণে নানা দুর্দশা, খাদ্যের অনটনে প্রায় ভিক্ষুকের জীবনযাপন করে অসহায় নতুন এক প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল শিক্ষার অভাবে। সে প্রজন্মের মানুষ হয়ে উঠেছিল নীতিজ্ঞানহীন, মূল্যবোধহীন, বর্বর প্রকৃতির।

দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্র সংকটের ফলে বাংলার আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছিল। শস্য সুফলা বাংলা পরিণত হয়েছিল এক শ্মশানে ভূমিতে। যেখানে দাঁড়িয়ে কৃষক বুঝতে পেরেছিল তাদের দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে বর্গাদারী ব্যবস্থা। সর্বস্বান্ত প্রায় ভিখারিতে পরিণত হওয়া লাখ লাখ কৃষক তাই এরপর নিজেদের বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বর্গাদার ব্যবস্থা রদ করতে। তিন বছরের অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল থেকেই সারা বাংলায় শুরু হয়ে যায় কৃষক আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন ছিল এ সময়ের সবচেয়ে ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন। কৃষকরা দাবি করেছিল ফসলের অর্ধেক নয়, কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্য জমির মালিকের, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ পাবে বর্গাদার।

১২.১১ উপসংহার

উপনিবেশিক শাসনের শেষের ক'বছর বিশেষ করে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময় বাংলার পক্ষে ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং দুর্বিষহ। অতিশয় দুঃখ দুর্দশার কাল। বাংলায় উপনিবেশিক শাসনকালের সূচনাই হয়েছিল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ দিয়ে, আশচর্যজনকভাবে উপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তিও ঘটল ১৯৪৩ সালের আরও এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা এবং গভীরতা এখনও পর্যন্ত

ঐতিহাসিকরা সঠিকভাবে নিরূপণ করে উঠতে পারেননি। একটি সার্বিক সমীক্ষায় কেবল যে সাধারণ তথ্য গুলি উঠে এসেছে সেগুলো হল—যথাক্রমে দুর্ভিক্ষের কালে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার মান ভীষণভাবে নেমে গিয়েছিল। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছিল। চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও ছিল সংকটকালে উপনিবেশিক সরকারের নির্লিপ্ততা এবং অস্বাভাবিক হারে মানুষের মৃত্যু। প্রচুর মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছিলেন—সসম্মানের বাঁচার অধিকার হারিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বাংলার জনসাধারণের এক ক্ষুদ্র অংশ দুর্ভিক্ষের আকালের সুযোগ নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং দুর্দশার বিনিময়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন। এরা ছিলেন হয় শস্য ব্যবসায়ী, মজুতদার অথবা কালোবাজারি। চিরকালের সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা, চির পরিচিত বাংলার সমৃদ্ধি চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দুর্ভিক্ষের কারণে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উত্তর স্বাধীনতা যুগেও কিন্তু বাংলা বিপর্যয় কাটিয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

১২.১২ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

৩. ১৯৪৩ এর বাংলার দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরি—এই মন্তব্যের সঙ্গে আপনি কি সহমত?

৪. ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সরকারের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

১২.১৩ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bipan Chandra : *History of Modern India.*

Sumit Sarkar : *Modern India*

Shekhar Bandopadhyay : *From Plassey to Partition and After.*

একক ১৩ ❐ উপনিবেশিক শাসনকালে শেষভাগে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ভূমিকা

১৩.২ সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৩.৩ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বাংলা

১৩.৪ সাম্প্রদায়িকতাবাদ : দু'টি সম্প্রদায় ও নির্বাচন

১৩.৫ ক্যাবিনেট মিশন

১৩.৬ ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বা সরাসরি আন্দোলন দিবস)

১৩.৭ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

১৩.৮ উপসংহার

১৩.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৩.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের ইতিহাসের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া :

- উপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত করানো।
- বিশেষ করে তখনকার রাজনীতিতে যে তিনটি প্রধান উপাদান আঙ্গিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ছিল সেই তিনটি উপাদান—ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতীয়তবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

১৩.১ ভূমিকা

উপনিবেশিক শাসনকালের শেষভাগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সে সময়ে তিনটি প্রধান উপাদান যথাক্রমে ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের সহযোগে তৈরি হওয়া পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হওয়া ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই ছিল ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ। হিন্দু প্রধান প্রতিষ্ঠান মনে করে মুসলমান সমাজের অনেকেই কংগ্রেসের যোগ দিতে অস্বীকৃত হন। এর ফলে ক্রমশই হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। যদিও গান্ধীবাদী আন্দোলনের সদস্যরা, উদারপন্থী হিন্দু এবং মুসলমান কংগ্রেসী নেতারা, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভাবে সি.আর.দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বোস নিজেরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈরিতা কমানোর ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উপনিবেশিক সরকারও যথেষ্ট সচেতনভাবে আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য "বিভাজন ও শাসন" এই নীতি অনুসরণ করে তার প্রয়োগে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও তিক্ততা আরও বেশি করে বাড়িয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল। আর তাই দিনে দিনে বাংলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমগ্র বাংলায় হিন্দু আধিক্য থাকলেও বাংলার পূর্ব অঞ্চল ছিল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। সে অঞ্চলে মুসলমানরা ছিলেন সাংখ্যগরিষ্ঠ।

বলাইবাহুল্য, যে উপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে উভয় সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবোধ জোরদার হতে শুরু হয়েছিল। আর এই অবস্থার সুযোগ সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছিল উপনিবেশিক শাসক। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রথমে দেখা দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সর্বশেষ দেশ ভাগ।

১৩.২ সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সাম্প্রদায়িতা শব্দের অর্থে প্রকাশ পায়, যে কোনও ধর্ম যা নিজেকে টিকিয়ে রাখতে আশ্রয় নেয় জাতি, সংকীর্ণতার, ধর্মীয় উন্মাদনার ও অযৌক্তিক গোঁড়ামির। উদার জাতীয়তাবাদ, যুক্তিবাদ, স্বচ্ছ চিন্তা ধারার ঠিক বিপরীতে অবস্থান করে সাম্প্রদায়িকতাবাদ। এর মূল লক্ষ্য ধর্মীয় উন্মাদনা উসকে দেওয়া। যাতে কেবলমাত্র যে সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার প্রচারক সেই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং অন্য বাকি সমস্ত সম্প্রদায়কে শত্রুরূপে বিবেচনা করা। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে, ভারতবর্ষে ঘটেছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-হিংসাত্মক ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

সম্ভবত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের উপর যতটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, ততটা প্রভাব ফেলেছিল বাঙালি হিন্দুদের উপর। বাংলা বিভাজন পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদারদের কাছে জমিজমা, সম্পত্তি এবং ক্ষমতা হারানোর শঙ্কা হয়ে দেখা দিয়েছিল। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে উন্মুক্ত করেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা, আর্থিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনা।

বাংলা ভাগ হলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তদের চাকরির সুযোগ-বাজার বাড়বে এমনটাই বুঝিয়েছিলেন বাংলাভাগের কর্তারা। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন মুসলমানদের বড় অংশ। স্বদেশি আন্দোলন যখন তুঙ্গে, যখন স্বদেশপ্রেমের গানের মাধ্যমে

আবার অবিভক্ত বাংলার প্রার্থনা করছেন দেশবাসী, তখনই ময়মনসিংহ এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক বিভেদ আরও বাড়াতে সাহায্য করেছিল ব্রিটিশ প্রণীত ১৯০৯ সালের আইনসভার সংশোধনী। হিন্দুদের আলাদা নির্বাচক মণ্ডলী এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচক মণ্ডলী—১৯০৯-এর এই সংশোধনী হিন্দু-মুসলমানের ফারাকটা আরও বেশি গভীরভাবে তুলেছিল। এছাড়া ১৯০৬ সালে ঢাকায় উচ্চশ্রেণির মুসলমান ব্যক্তিদের একটি সভায় মুসলিম লিগের যে সূচনা হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে।

এরপর যদিও ১৯১৬ সালে লখনউ চুক্তির সৌজন্যে সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের খানিকটা উন্নতি ঘটেছিল। তবে সে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টিকে ছিল ১৯২০-র মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময় ঘটেছিল এ. কে. ফজলুল হকের উত্থান, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর অন্য একটি ধারার সূচনা বার্তা এনে দিয়েছিল। ধীরগতিতে হলেও ক্রমান্বয়ে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিল এবং রাজনীতির আঙ্গিনায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এরপর ১৯২০-এর দশকে আবার বেশ কিছু সময়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে একটা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার ভিত ছিল দুর্বল তাই সে ঐক্যেও অচিরেই ফাটল ধরেছিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় শুরু হয়ে গিয়েছিল দাঙ্গা, পূর্ব বাংলারও কয়েকটি অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল সে দাঙ্গার আগুন। দাঙ্গার কারণটা কিন্তু ছিল খুবই নগণ্য। স্বচ্ছল হিন্দু জমিদার ও দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব বা অসাম্য ছিল দাঙ্গার একটি প্রধান কারণ। হিন্দু জমিদারদের প্রতি মুসলমান চাষীর ক্ষোভ ছিল খুবই স্বাভাবিক। সেই ক্ষোভ ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। যদিও বর্তমান কালের গবেষণা বলছে যে ১৯২০-এর সময় থেকেই অবস্থা পাল্টাতে শুরু করে। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের শিক্ষার ও কর্মের সুযোগ অসম্প্রীতির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন। সরকারি চাকরির সুযোগ ছিল সীমিত। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ এর চিত্তরঞ্জনে দাশের মৃত্যুর পর সেই সম্ভাবনা নির্মূল হয়ে গেল। এ সময়ে অনেকে মুসলমান সদস্য কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ১৯২৮ সালের বেঙ্গল টেনেন্সি এ্যাক্টের সংশোধনী প্রস্তাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে একে অপরের থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এ কথা সকলেরই জানা যে, বাংলায় অধিকাংশ জমিদারি ছিলেন হিন্দু আর বেশিরভাগ কৃষক ছিলেন মুসলমান। ১৯২৮ সালে যখন আইনসভায় বেঙ্গল টেনেন্সি এ্যাক্টের সংশোধনী প্রস্তাব আসে তখন সব হিন্দু কংগ্রেসপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদারপক্ষকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, তখনই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে তোলার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল সেটুকুও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলমান সদস্যদের সমর্থন ছিল দরিদ্র কৃষক প্রজাদের পক্ষে। আর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল

অবশ্যই জমিদারদের সুবিধার্থেই। এ ঘটনার পর থেকে মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন এবং কংগ্রেসের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ১৯২৯ সালে বাংলার আইনসভার ১৮ সদস্যের মিলিত উদ্যোগে অল বেঙ্গল টেনেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সূচনা হয়, যা পরবর্তীতে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ১৯৩১ সালে এই পার্টি সরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন আইনসভা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিভিন্ন বোর্ডের কার্যকলাপ সক্রিয় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এদিকে ১৯২৮ সালের শেষ দিকে লখনউ চুক্তির ফলে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল তা ভেঙ্গে যায় মতিলাল নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস অধিবেশনে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাতে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে তৎপর হিন্দু সদস্যরা বাংলায় এবং পাঞ্জাবের আইনসভায় মুসলমান সদস্যদের ৩৩ শতাংশ আসনের সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করে। এতে জিন্না ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলমান ঐক্যের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ১৪ দফা কর্মসূচির প্রস্তাব রাখে, যা আবার কংগ্রেস নাকচ করে দেয়।

যদিও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন, তবুও মুসলমান সমাজের একটি অংশের মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। তাই মুসলমান সমাজেও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত উদ্ভব ঘটেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গড়ে ওঠা আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায় সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক বৈরীতার মধ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেড়ে ওঠার গুরুত্ব বুঝেই চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে বেঙ্গল স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করা হোক। দুঃখের বিষয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রস্তাবের মৃত্যু ঘটেছিল। আর ১৯২৫ এর পর বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, যে দেশভাগের আগে বাংলায় উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের নানা বড় ছোট বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ ছিল যা লিওনার্ড গর্ডেনের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। উর্দুভাষী মুসলমানরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে দেখতেন সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমান জনসংখ্যা ও সেই মতো তাদের সীমিত অবস্থানের প্রেক্ষিতে। যেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের দাবি ছিল কেবলমাত্র স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলীর। বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান কংগ্রেস কর্মী ছিলেন অথবা কংগ্রেস রাজনীতির সমর্থক ছিলেন তারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন। যদিও তারা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলেন তবুও এ কথা বলা যেতেই পারে যে, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা দৃঢ় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ জোটের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। ব্রিটিশ শাসক কিন্তু লিগের স্বাধীন নির্বাচন পরিষদের (Independent Election Council) দাবি মেনে নেয়, ব্রিটিশের এই রাজনৈতিক চাল কিন্তু কার্যত হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদকে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।

১৩.৩ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বাংলা

কংগ্রেসের মতে, যেহেতু পাঞ্জাব আর বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই এই দুই প্রদেশ আসন সংরক্ষণ অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু মুসলিম লিগের মতে, তাহলেও সংরক্ষণের প্রয়োজন। ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করেছিল, যার কার্যকারিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে। এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ওই বছরেই নির্বাচনের দিন স্থির করা হয়। তবে ভোটাধিকার দেওয়া হয় সীমিত সংখ্যক কিছু মানুষকে এক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা, নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ভোটদাতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবি মেনে নেওয়া হয়। এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায় ভোটদানের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২৫০টা আসনের মধ্যে ১১৯টা আসন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

বাংলায় যে কটি রাজনৈতিক দল ১৯৩৭ এর নির্বাচনের লড়াইতে শামিল হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং কৃষক-প্রজা পার্টি। মৌলানা আক্রম খানের নেতৃত্বে যেসব মুসলমান ব্যক্তিরা কংগ্রেস ছেড়ে ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন তারাই ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির মূলে। তাদের সঙ্গে ক্রমে যোগ দেন আবদুর রহিম ও এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে আইনসভার বেশ কিছু মুসলমান সদস্য। হক ১৯৩৫-৩৬ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে অতঃপর পার্টিকে দৃঢ়ভাবে সংঘটিত করবার কাজ শুরু হয়ে যায়। এপ্রিল মাসে (১৯৩৭) ঢাকা অধিবেশনে কৃষক-প্রজা পার্টির ইস্তাহার 'কৃষক-প্রজার ১৪ দফা' প্রকাশিত হয়। যে ১৪টি দাবি কৃষক-প্রজা পার্টি পেশ করেছিল সেগুলো হল যথাক্রমে :

১। ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদার প্রথা বিলোপ।

২। জমির খাজনা হ্রাস।

৩। জমিদারের নজরানা এবং সালামির অধিকার বিলোপ।

৪। কৃষকের বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি ঋণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। কৃষকের বাকি পড়া আগের সমস্ত ঋণ ও সুদ মকুব।

৬। সহজে ঋণ দান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন।

৭। কৃষি ঋণ বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য বোর্ড গঠন।

৮। বাংলার মজে যাওয়া এবং মজে যেতে শুরু করেছে এমন সমস্ত নদীকে পুনর্জীবিত করে তোলা।

৯। সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

১০। সকলের জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা।

১১। বাংলায় সর্বত্রভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।

১২। প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যয় সংকোচন।

১৩। মন্ত্রীদের ১০০০ টাকা বেতন ধার্য।

১৪। সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তিদান

নির্বাচনের এই ইস্তাহারের লক্ষ্য ছিল মূলত কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং জমিদারদের স্বার্থের বিরোধিতা করা। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ইস্তাহার কিন্তু কৃষক শ্রেণির মধ্যে যে বিভিন্ন স্তর বিভাজন আছে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করবার কোনো চেষ্টা করেনি বা সে মর্মে কোনো প্রকার কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

১৯৩৭ নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থীরা সবকটি সাধারণ আসন জয়লাভ করেন। কিন্তু তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মাত্র ৩ থেকে ৪ জন কংগ্রেস প্রার্থী জয় লাভ করেন। অধিকাংশ সংরক্ষিত আসনে জয়ী হন অ-কংগ্রেসী প্রার্থীরা। তবে মহিলাদের জন্য দুটি সংরক্ষিত আসনেই কংগ্রেস মহিলা প্রার্থীরা জয়লাভ করেন।

নির্বাচনের পর বাংলায় নবনির্মিত আইনসভায় হিন্দু সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৬ এবং মুসলমান সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৩। নির্বাচনে কিন্তু কংগ্রেসের কোনও মুসলমান প্রার্থী ছিল না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে কংগ্রেস এসেম্বলিতে ৫৪টি আসন জিতেছিল এই বৃহত্তম দল। শ্রীলতা চ্যাটার্জি তার বই *Congress Politics in Bengal, 1919-1939*-এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শহরাঞ্চলে মুসলমান ভোটের ওপর মুসলিম লিগের প্রাধান্য দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে কৃষক পূজা পার্টির আধিপত্য ছিল লক্ষণীয় মুসলিম লিগ পেয়েছিল ৩৯টি আসন এবং কৃষক প্রজা পার্টি ৪০টি। যেহেতু কংগ্রেস কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে বাংলায় সরকার গঠনে নারাজ ছিল তাই এই অবস্থায় কৃষক-প্রজা পার্টি মুসলিম লিগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে জোট সরকার গঠিত করতে বাধ্য হয়। সমগ্র বাংলা শাসনের পক্ষে মুসলিম লিগের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। পার্টির মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে হক যোগদান করেন মুসলিম লিগে। ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হকই কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা আসলে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। সেক্ষেত্রে বাংলার মতো একটি প্রদেশে বিশেষ করে সেখানকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা মাথায় রেখে বলা যায় যে, সেখানকার সরকারে মুসলিম লিগের আধিপত্য এমন একটা বার্তা দিয়েছিল যে তা পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রচার ও প্রসারকে উৎসাহিত করেছিল। যদিও বাংলায় মুসলমানরা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তবুও এ কথা অনস্বীকার্য সমাজে সবদিক থেকে কর্মজগতে অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। এই অবস্থায় মুসলমান নেতারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে মুসলমান তোষণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বেশিরভাগ সরকারি পদ তারা মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এ ব্যাপারে তারা সফলতাও লাভ করেছিল। কিন্তু এতে বিপরীত হয়েছিল। হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল। যার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফজলুল হকের জোটবদ্ধ মন্ত্রিসভা কৃষক প্রজাপার্টির নির্বাচনে ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোও মোটের উপর রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৩৭ সাল থেকে হক চেষ্টা করছিলেন একদিকে মুসলিম লিগ এবং জিন্নার কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে পেতে, অন্যদিকে কলকাতার উর্দুভাষী ব্যবসায়ীদের প্রভাবের বাইরে যেতে; এই ব্যবসায়ীদের তিনি 'up-countrymen in Calcutta' বলে বর্ণনা করতেন। তিন বছরের মধ্যে মন্ত্রিসভা বাঁচাতে হক হিন্দু মহাসভার সঙ্গে জোট বাঁধেন। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হকের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের অধিকার রক্ষা। মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যরা এর ফলে সন্ধিহান হয়ে ওঠেন এবং এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ফজলুল হক মন্ত্রিসভার ভিত ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে।

ফজলুল হকের অধীনে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার আয়ু ছিল ১৯৪৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। এ সময় ব্রিটিশ শাসক ও মুসলিম লিগ প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এই মন্ত্রিসভার ওপর। এছাড়াও কংগ্রেসের ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের ঝাপটা হক মন্ত্রিসভাকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। জিন্না ও বাংলার মুসলিম লিগ সমর্থকরা হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এতই জোরদার বিক্ষোভ গড়ে তুলেছিলেন যে ব্রিটিশ গভর্নর স্যার জন হার্বার্টও তৎপর হন হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে। ফলে ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে মন্ত্রিসভা পড়ে যায়। এরপর সাম্প্রদায়িকতাবাদের রাজনীতিতে আরও উস্কে দিতে মুসলিম লিগকে বাংলায় নতুন সরকার গড়বার অনুমতি দেওয়া হয়। নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই মন্ত্রিসভায় কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় হিন্দু ব্যক্তিরাও যোগদান করেন।

১৯৪২-এর আগসট আন্দোলনের জেরে ১৯৪৩-রে গোড়ায় কংগ্রেস নেতৃবর্গ বেশিরভাগই পলাতক না হলে জেলবন্দি, সেই অবসরে ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লিগ বাংলায় তার সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলবার প্রয়াস নিয়েছিল। চেষ্টা করেছিল দলের আদর্শের ব্যাপক প্রচার চালিয়ে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে একটা গণআন্দোলনের রূপ দেওয়ার। বর্ধমান জেলার এক বাঙালি মুসলমান মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাশিম এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত হাশিম এবং অন্যান্য বাঙালি মুসলমান নেতারা মুসলমান ছাত্র সমাজ ও বেশিরভাগ ঢাকার অধিবাসী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করেন মুসলিম লিগে যোগ দিতে। নিরপেক্ষ মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা, কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরাও এ সময়ে মুসলিম লিগের সভ্য হন। বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘরে ঘরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করে তাদের দায়িত্ব দিয়ে হাশিম জেলায় জেলায়

মুসলিম লিগের সংগঠন শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। জাতীয় স্তরে কংগ্রেস ১১৬১টি সাধারণ আসনে প্রার্থী দেয় এবং তার মধ্যে ৭১৬টি তে জয়ী হয়। যে প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি সেগুলো হল—পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ আর বাংলা। যদিও এই প্রদেশগুলোতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তবুও এর কোনটাতেই মুসলিম লিগের ভালো ফল হয়নি। এ. আই. সিং দেখিয়েছেন যে, মুসলিম লিগের প্রাপ্ত মুসলিম ভোট শতকরা মাত্র ৪.৮%। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে ২৭২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লিগ জিতেছে মাত্র ৪৩টি আসনে। তাই ওই সব প্রদেশগুলোর কোনটাতেই মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি। অপরদিকে সংরক্ষিত ৫৬টি আসনে কেবল কংগ্রেসের ২৮ জন প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশ, বাংলা এবং পাঞ্জাবে কংগ্রেস প্রার্থীরা একটিও মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধি নয়। এ. আই. সিং তার বক্তব্যে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন এটা জানা যায় বিশেষ জরুরি যে ১৯৩৪ সাল থেকে যদিও জিন্না মুসলিম ঐক্য গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা সত্ত্বেও সকল মানুষ একতা বন্ধনে নিজেদের বাঁধতে পারেনি। এমনকি মুসলিম লিগের প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জোট বাঁধার তেমন কোনো ইচ্ছে প্রকাশ পায়নি।

বোম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস খুব কম সংখ্যক প্রার্থী দিয়েছিল, যদিও সেই আসনের সব কটিতেই কংগ্রেসের হার হয়েছিল। তবুও সামগ্রিকভাবে নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় হয়েছিল। জিন্না প্রস্তাব রেখেছিলেন বোম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস ও লিগ যৌথভাবে সরকার গঠন করুক। কংগ্রেস রাজি হয়নি। কংগ্রেস চেয়েছিল জয়ী প্রার্থীরা মুসলিম লিগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিক। মুসলিম লীগের নির্বাচিত প্রার্থীরা কেউই তা করেননি। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এই প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন যে, কংগ্রেসেই পাকিস্তানের স্রষ্টা। কংগ্রেস লিগের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গঠনে রাজি না হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার ঘটেছিল, যা চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছিল বলে ঐতিহাসিকদের একটি অংশ মনে করেন।

১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার পর মুসলিম লীগের লখনউ অধিবেশনে জিন্না কংগ্রেসের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন "কংগ্রেসের বর্তমানে নেতৃত্ব বিশেষ করে বিগত ১০ বছর ধরে ভারতীয় মুসলমানদের বারবার দূরে ঠেলে দিয়েছে, মূল স্রোতে থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সর্বত্ররকম ভাবে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে রাখার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। যেখানে সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সুবিধা মত তারা মুসলিম লিগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে। তারা সর্বদা চেয়েছে কংগ্রেসের সমস্ত শর্ত মেনে মুসলিম লিগ এবং তার সদস্যরা কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করুক।"

লখনউ অধিবেশনের জিন্না দাবি করেছিলেন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি এও বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতে যেন মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকে। এই ঘোষণার পর থেকেই মুসলিম লিগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন হয়ে উঠতে শুরু করে। জিন্না চেয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতারা যেন মুসলিম লিগকে সব সব মুসলমানদের প্রতিনিধি

হিসেবে মেনে নেন। কংগ্রেস নেতারা জিন্নার চাওয়াকে অস্বীকার করেন এই মর্মে যে, জাতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধি।

১৩.৪ সাম্প্রদায়িকতাবাদ : দুটি সম্প্রদায় এবং নির্বাচন

এরই মধ্যে ১৯৪০ মার্চ মাসে পাকিস্তান প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। মুসলিম লিগ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করতে নিরলস প্রচার চালায়। তারা প্রচার করে, পাকিস্তান হলেই মুসলমানদের প্রকৃত উন্নতি সাধন এবং সমৃদ্ধি লাভ ঘটবে। এর ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এর মার্চে যে নির্বাচন হয় তাতে কেবলমাত্র পাকিস্তান স্লোগানের জোরে ১১৯টা মুসলমান সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ১১১টা তে মুসলিম লিগ প্রার্থী জয়ী হয়। স্বাধীন দেশে আত্মনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন মুসলমান সমাজের সকল জনগণকে উদ্দীপনার চূড়ান্ত নিয়ে হাজির হয়।

লিগের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করে গর্ডন দেখিয়েছেন, কীভাবে গত দেড় দশকে লিগের নীতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। ১৯২০ শেষের দিকে এবং ১৯৩০ এর গোড়ার দিকে লিগের দাবি ছিল ভারতবাসী মুসলমান যেহেতু সংখ্যালঘু তাই তাদের স্বার্থ রক্ষা। কিন্তু ক্রমশ ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে এই নীতি পাল্টে গেল। তখন ভারতবর্ষে মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয় তারা এক স্বতন্ত্র জাতি, যে জাতির নাম পাকিস্তান। আর এই মুসলমান জাতি এবং হিন্দু জাতি সমপর্যায়ে ভুক্ত, সমান সমান। তারা বাঙালি, হিন্দু, বিহারী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি নয় মুসলমানদের একমাত্র পরিচয়, তাদের ধর্ম বিশ্বাস। তাদের পরিচয় তারা মুসলমান। মুসলিম লিগের এই আবেদন প্রচারিত হয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। বাংলায় লিগ ক্ষমতাশীল হওয়ার পর মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের ভয় গ্রাস করেছিল অনেক হিন্দু ব্যক্তিকে।

বাংলায় মুসলমান ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯৪০ সালে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দেয় বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বিলের বিতর্ককে কেন্দ্র করে। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল হিন্দুরা। তাদের দাবি ছিল মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাই শিক্ষা এবং বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছে সারা বাংলায়; এর বিপক্ষে মুসলমানরা নালিশ জানিয়ে বলেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যবসায় হিন্দু আধিপত্য প্রবল, কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের অধীনে।

প্রাদেশিক সরকারে অধিষ্ঠিত মুসলিম মন্ত্রিসভা মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার নীতি মেনে চলা ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের কন্টাক্ট কেবল মুসলমান ব্যবসায়ীদের দেওয়ার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের মনে মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপনের আশা জেগে উঠল। হার্ডি তার বক্তব্যে, এ কথা বলেছেন, মুসলমানরা ১৯৪৩ এর নির্বাচনের আগে ইস্পাহানি, দাউদ, হাবিব ইত্যাদি মুসলমান ব্যবসায়ী পরিবারগুলো মুসলিম লিগকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। ১৯৪৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল ফেডারেশন অফ

মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ডব্লিউ. সি. স্মিথ এই সিদ্ধান্তে আসেন, পাকিস্তান স্লোগানই মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল গোষ্ঠীকে বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত মুসলিমদের লিগের সমর্থক করে তুলেছিল। বিশিষ্ট মুসলিম ব্যবসায়ী ইস্পাহানি বাংলার গভর্নরের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, যদিও পাকিস্তান স্লোগানের মূলে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি, তবুও এই একটা স্লোগানের উপর নির্ভর করেই মুসলিম লিগ ১৯৩৭ এর নির্বাচনে নেমেছিল।

১৯৪৬ এর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মুসলিম লিগ আর শুধুমাত্র বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল নয়, একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সব কটিতেই জয়ী হয়েছিলেন মুসলিম লিগ। প্রাদেশিক সভাগুলোর ৪৯৪টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ৪৩৯টি তে জিতেছে মুসলিম লিগ। পাঞ্জাব আর বাংলায় মুসলিম লিগ পেয়েছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বাংলায় লিগ প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিল ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টি আসনে। উত্তরপ্রদেশে সংরক্ষিত ৫৪টা আসনের মধ্যে ৫৪টি আসনই মুসলিম লিগ দখল করে। এছাড়াও ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ—যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু সেখানেও নির্বাচনে মুসলিম লিগ খুব ভালো ফল করে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে যে কটি আসনে মুসলিম লিগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সবকটিতেই জয় লাভ করে। হার্ডির মতে, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস-এ লীগের জয় সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই জয় থেকেই জিন্নাহ্ জাতীয় নেতা হিসাবে পরিচিতি পায়।

১৩.৫ ক্যাবিনেট মিশন

সিদ্ধার্থ গুহ রায় এবং সুরঞ্জন চ্যাটার্জির লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৭-এর নির্বাচনের ফল দেওবন্দের উলেমারদের পরাজয়ের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। এই মুসলমান গোষ্ঠী ছিল পাকিস্তান বিরোধী, দেশভাগ বিরোধী কংগ্রেস সমর্থক। মুসলমান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখ, ক্লেশ দূরীভূত হবে এমন ধারণা পাকিস্তান স্লোগান সকলের মনে গভীরভাবে গেঁথে দিয়েছিল। এই স্লোগানে গুরুত্ব পেয়েছিল ইসলামিক একতা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্ম বিশ্বাস। হার্ডির মতে, জিন্নাহ্ অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মতো পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র, সংবিধানের প্রকৃতি, নতুন রাজ্যের সীমানা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কল্পনার স্বর্গ রাজ্য থেকে তুলে এনেছিলেন।

১৯৪৭ সালে আসলে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান তৈরি হবে, সচেতনভাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমান ভোটাররা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সম্ভবত ভোট দেননি। তারা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠনের সমর্থন জানিয়েছিলেন কারণ তাদের ধারণাই পাকিস্তান ছিল মুসলমানদের এবং ইসলামের জন্য একটি স্বর্গরাজ্য। এ সময় মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেস দু'তরফেই চাইছিল যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতার হস্তান্তর বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটাতে। এদিকে যুদ্ধ পরবর্তী পর্বে ভারত জুড়ে শুরু হয়েছিল বিভিন্ন গণ আন্দোলন।

এই কারণেই অর্থাৎ অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে বিভিন্ন

শর্তাদি আলোচনা করতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করে। তিন মাসের অধিক সময় ধরে ওই মিশনের সদস্যরা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাংবিধানিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টা করে। অবশেষে ১৬ মে ১৯৪৬-এ একটি নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পায় ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার জন্য একটি ত্রিস্তরীয় শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের প্রস্তাব। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান হবে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর উপরে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায়ের অধিকার।

অন্যসব ক্ষমতা-প্রাদেশিক সরকারগুলো আওতাধীন থাকবে। প্রাদেশিক সরকারগুলোর জোট বা গ্রুপ গঠনের স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেক গ্রুপের অধীনে আইন প্রণয়নকারী ও কার্যনির্বাহী সভা থাকবে এবং কোন কোন প্রাদেশিক বিষয় কোন গ্রুপ দায়িত্ব নেবে সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা তাদের থাকবে। প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করে একটি সাংবিধানিক সভা গঠন করে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা হবে। তিনটি স্তর অর্থাৎ প্রদেশ, গ্রুপ ও ইউনিয়নের জন্য সাংবিধানিক বিধি নিয়ম রচিত হবে। কেবলমাত্র সংবিধান সম্পূর্ণভাবে রচিত হবার পরই যদি কোন প্রদেশ চাই তো যে কোনও একটি গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, সে অধিকার প্রদেশগুলোর থাকবে।

ওয়েভেলের থেকে মুসলিম লিগ আশ্বাস পেল যে, যদি কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা নাকচ করে দেয় সে ক্ষেত্রেও মুসলিম লিগকে অন্তর্বর্তী সরকার রাখা হবে। আশ্বস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ এর জুন মাসে মুসলিম লিগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা স্বীকার করে নিল। পরিকল্পনার একটি ধারা যার ফলে গ্রুপ 'বি'-এর অন্তর্গত হয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং গ্রুপ 'সি'-এর অন্তর্গত বাংলা ও আসামের ক্ষমতা থাকবে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির গ্রুপ 'এ'-এর অন্তর্গত মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, ইউনাইটেড প্রভিন্স এবং বিহারে বসবাসকারী মুসলমানদের সুরক্ষিত রাখরাব।

২৪ শে জুন কংগ্রেসেও ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল। কংগ্রেসের ভয় ছিল যদি তারা এ পরিকল্পনায় সম্মত না হয় তাহলে তাদের অনুপস্থিতিতেই মুসলিম লিগ ক্যাবিনেট প্ল্যানের শর্ত অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের ঢুকে পড়বে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস বাধ্যতামূলক গ্রুপ বা সেকশন তৈরির বিষয়ে তার প্রতিবাদে অনড় ছিল। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করতে তাদের আপত্তি নেই। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেসের সম্মতি দানের পরই লিগের প্রতি মিশনের অবস্থানে পরিবর্তন ঘটল। লিগের মুসলমান কংগ্রেস প্রতিনিধি মানতে না চাওয়াটা আবার মিশন মেনে নিতে পারল না।

১৩.৬ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

যদিও কংগ্রেসের আগেই মুসলিম লিগ মিশন প্ল্যান বা পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে সায় দিয়েছিল, তবুও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে লিগ ডাক পেল না। এই ঘটনা লিগের পক্ষে এতটাই মর্মান্তিক এবং অপমানজনক যে লিগ এর প্রত্যুত্তরে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হল। লিগ ডাক দিল ডাইরেক্ট একশন ডে বা সরাসরি আন্দোলন দিবসের। লিগ যে কতটা শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল তারই প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ১৯৪৬ এর ১৯ জুলাই মুম্বাই-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ কাউন্সিলের একটি মিটিংয়ে মুসলিম লিগের তরফ থেকেই এই ডাক দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ হিসেবে লিগ বলে যে মুসলমানদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের পথে বাধা সৃষ্টির প্রতিবাদে লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের আহ্বান জানিয়েছে।

মুসলিম লিগের এই সরাসরি সংগ্রামের আহ্বান বিশেষ করে কলকতায় একটা অবিশ্বাস, ভীতি এবং শঙ্কার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ঝামেলায় এড়াতে বাংলা সরকার ১৬ আগস্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামর দিনটিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছিল। অবশ্য সরকারি এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল। ড. সুরঞ্জন দাশ বিভিন্ন গুপ্ত সূত্র সংগ্রহ করেছেন দাঙ্গার প্রস্তুতি পর্বের বহু তথ্য। সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ মেলে তাঁর লেখা বইতে।

১৬ আগস্ট ১৯৪৬ থেকে শুরু হয়েছিল ব্যাপক আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অভূতপূর্ব ছিল দাঙ্গার ব্যাপ্তি। দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪ হাজারেও বেশি মানুষ এবং আহত হয়েছিলেন প্রায় ১৫ হাজার জন। দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি করা ছাড়াও পরস্পরের সম্পত্তির উপর আক্রমণ লুটপাট চালিয়েছিলেন। জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিলেন অসংখ্য মহিলাদের উপর। ধর্ষণ, নির্যাতন এবং পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতা থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা, নোয়াখালী ও বিহারে। দাঙ্গার সময় মানুষের নৃশংসতা, বর্বরতা, পাশবিকতা যেন মনে হয় গলা টিপে হত্যা করেছিল মানুষের সাধারণ কোমল প্রবৃত্তিগুলোকে। হিংস্র হয়ে উঠেছিল মানুষ। গুণ্ডাবাজি চরমে উঠেছিল। দাঙ্গা বাধাতে, হিংসা ছড়াতে অন্য রাজ্য থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে আনা হয়েছিল। এই গুণ্ডার দলই ছিল দাঙ্গার নেতৃত্বে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপারে যে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরাও দাঙ্গায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে কথা বলা জরুরী, এ দাঙ্গা কিন্তু শুধুমাত্র ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের ফল ছিল না। তবে ষড়যন্ত্র অবশ্যই ছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ এবং বৈরিতার সুযোগ পুরোপুরি মাত্রায় ব্রিটিশ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আগাগোড়া ব্যবহার করেছিল। ব্রিটিশ সরকার কেবল যে তার স্বার্থ চরিতার্থ করতে দাঙ্গা লাগিয়েছিল সে কথা পুরোপুরি সত্য নয়, এক্ষেত্রে অন্তত ভারতীয়রা ব্রিটিশদের পুতুল ছিল না।

সাধারণ মানুষ এই দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিল, বন্ধু প্রতিবেশীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। মহিলাদের

ধর্ষণ করেছিল। এসব হিংসাত্মক কার্যকলাপ কেবল মুহূর্তের জন্য জ্ঞানহারা হয়ে উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে করা হয়নি। মানুষের চেতনায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক নৃশংস মতাদর্শ। যার প্রভাবে সাধারণ মানুষ সে সময়টুকুর জন্য ভেবেছিল সে যা করছে সব ঠিক। তার হিংস্রতাকে সে যোগ্যতা দিয়েছিল নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপন ধর্মরক্ষার, নিজের পরিবার, সম্প্রদায় রক্ষার জন্য।

দাঙ্গার ব্যপ্তি আরও বাড়ল। কলকাতা থেকে তা ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পাবনাতে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বাই শহরে দাঙ্গায় মারা যায় ১৬২ জন হিন্দু এবং ১৫৮ জন মুসলমান। নোয়াখালীতে লুটপাট ও ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছিল। জোর করে ধর্মান্তরিত করার ঘটনাও ঘটেছিল অসংখ্য। কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছিল বেসরকারিও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি। পোস্ট অফিস, স্কুল, ইত্যাদি যথেষ্ঠ ভাঙচুর হয়েছিল। এইসব হিংসাত্মক ঘটনাবলীতে কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশ। যে লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডিতে দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। পি. মুনের মতে, ১ লাখ ৪০ হাজার জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এরই মধ্যে ১৯৪৬-র আগস্টে নেহরুর তার অবস্থান বদলে অন্তর্বর্তী সরকার গড়তে রাজি হয়ে গেলেন। এর অপেক্ষায় ছিল ব্রিটিশ। কারণ ৩১ জুলাই ওয়াভেল সেক্রেটারি অফ স্টেটকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন যাতে না সংগঠিত হতে পারে তাই কংগ্রেসকে সাংবিধানিক কাজকর্মে ব্যস্ত রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। ২ সেপ্টেম্বর যে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নিয়ছিল তাতে কংগ্রেসের আধিপত্য বজায় ছিল। অক্টোবর মাসে লিগ সরকারে যোগদান করতে রাজি হল। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা পুরেটাই ভেস্তে গেল। জিন্না রাজি হলেন না মিশনের প্ল্যান মাফিক তৈরি সাংবিধানিক সভায় যোগদান করতে। আর অপরদিকে কংগ্রেস আগে থেকেই প্রদেশগুলোকে সেকশনে ভাগ করে গ্রুপ তৈরি করার প্রস্তাবনা নাকচ করে দিয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে তার একটা বিশ্লেষণ এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন। বিপানচন্দ্র-র *'History of Modern India'* গ্রন্থে উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িকাতাবাদীর নানান ধরনের ব্যাখ্যা। তাঁর মতে, ভারতের সব সাম্প্রদায়িক দলগুলির ও রাজনৈতিক পার্টিগুলির একদিক থেকে দেখতে গেলে একটি বিষয়ে ভীষণ মিল আছে। এরা কখনোই কোনো সময়ই সরকারে বিরুদ্ধে যায়নি। এরা হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলমান জাতীয়তাবাদের কথা যতই মুখে বলুক কর্মক্ষেত্রে কেউই কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যোগদান করেনি। এরা লড়েছে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের শত্রু ছিল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, আবার মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মনে করতেন হিন্দুরা তাদের শত্রু। বিদেশি সরকারকে তারা কখনই শত্রু মনে করতেন না।

কোনও সাম্প্রদায়িক দলই কিন্তু সাধারণ মানুষকে মূল সমস্যাগুলোর সমাধানে কোনো দাবি তোলেননি। এ ব্যাপারে এদের সঙ্গে উচ্চবিত্ত শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রচুর মিল আছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন

সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর দমন করবার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় নিরপেক্ষতার গভীর বিশ্বাস ছিল জাতীয়তাবাদী নেতাদের। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার আদর্শ। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলোকে পরাজিত করতে অসমর্থ হয়েছে। দেশ বিভাগ ঘটেছে। এই ব্যর্থতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? সাধারণভাবে বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা হয়তো সেভাবে যথেষ্ট উদ্যোগ নেননি। সাম্প্রদায়িক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের বুঝিয়ে বলতে হয়তো জাতীয়তাবাদী নেতাদের আরও একটু বেশি সহনশীল হওয়া উচিত ছিল। হয়তো আরও একটু বেশি সহযোগিতায় যাওয়া উচিত ছিল। এই উত্তর প্রত্যাখ্যান করেছেন বিপানচন্দ্র। তাঁর মতে, প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদীরা আশাবাদী হয়ে সাম্প্রদায়িক দলের নেতাদের সঙ্গে বড্ড বেশি আলাপ আলোচনা গেছেন। আর তাতে লাভ হয়নি। কারণ সাম্প্রদায়িকাবাদকে তুষ্ট করা অথবা তার সঙ্গে কোনও সমঝোতাই আশা একেবারেই অসম্ভব। আবার একটি সাম্প্রদায়িক দলকে তোষণ করলে তার প্রত্যুত্তরে ও প্রতিবাদে অন্য আরও একটি সাম্প্রদায়িক দল তাদের দাবি নিয়ে উঠে আসবে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব বারবার জিন্নার সঙ্গে দেখা করে একটা সমঝোতার আসার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যে জিন্না কিছুতেই সঠিক দাবি কখনোই রাখতেন না। তাঁর অবাস্তব দাবি ছিল যে, কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হবে যে সেটা মূলত একটা হিন্দু রাজনৈতিক দল এবং এই দল কেবল হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। কংগ্রেসের পক্ষে এ দাবি স্বীকার করা কখনোই সম্ভব ছিল না। কারণ কংগ্রেসের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল কংগ্রেসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আসল কথা হচ্ছে যত বেশি সাম্প্রদায়িকাতাবাদের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়েছে তত বেশি তা উগ্র রূপ ধারণ করেছে। তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে লড়াইতে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল তা তোষণ নীতি নয়, প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক মতবাদ।

যাইহোক, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের মতবাদও যথেষ্ট শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশভাগ, দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে লড়াই করেও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করেছে। ভারতের রাজনীতি ও সমাজ গঠনেও এই নীতির প্রভাব রয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ এ হিন্দু সমাজেও সাম্প্রদায়িকতাও তার শক্তি বিস্তারের চেষ্টা করেছিল বলে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ ভেসে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও ধর্মীয় উন্মাদনা।

১৩.৭ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বুঝতে গেলে দাঙ্গাকারীদের মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করাটা বিশেষ জরুরী। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বই '*দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা*'তে প্রথমেই দাঙ্গার ঘটনা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হিংসা ও

হত্যা—এসবের বিশ্লেষণ করতে গেলে যে প্রধান অসুবিধাগুলো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় সেগুলো আলোচনা করেছেন। প্রথমত, আমরা জানিনা কিভাবে আমরা দাঙ্গা সংক্রান্ত হিংসাকে দেখব? দ্বিতীয়ত, কাদের আমরা চিহ্নিত করব হত্যাকারী অথবা হত্যার প্ররোচনাদায়ী বলে?

কিন্তু যদি আমরা পরপর পুরোটা ঘটনাক্রম সাজিয়ে তুলতে পারি তাহলে অবশ্য একটা সহজ সরল উত্তরে পাওয়া যেতে পারে। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে হিংসাত্মক ঘটনাবলী একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ফ্যাসিস্ট হিংস্রতা, নির্মমতার বিবরণ আমরা বহু জায়গায় পড়েছি। সেসবের কথা অনেক জায়গায় লেখা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে নৃশংসতা ঘটেছিল তার তেমন কোনও সঠিক সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায় না। এখানে আরও একটা সমস্যা আছে। যদি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ কেবল তারা কী বিপর্যয়ের দুর্দশার মধ্যে দিয়ে গেছে, কীভাবে সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন একথা বর্ণনা করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সকলের সমবেদনা সহানুভূতি গিয়ে পড়বে সেই সব মানুষদের উপরেই এবং যত রাগ আক্রোশ গিয়ে পড়বে সেই সব অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর; তাদের আমরা বিনা দ্বিধায় নির্মম অত্যাচারী বলে চিহ্নিত করে ফেলব। ফলে তৈরি হবে একধরণের সংকীর্ণ দ্বিদলীয় দৃষ্টিভঙ্গি এর ফলে হারিয়ে যাবে সমাজের বহুস্তরীয় বহুস্বরের কণ্ঠস্বর। আমাদের মনে রাখতে হবে কোনও যুক্তিই, কোনও ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ নয়। তাই ইতিহাসের যাত্রা অনন্ত। দেশভাগ ও দাঙ্গা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

দেশভাগের কাহিনি, দাঙ্গার কাহিনি তাই এক তরফের সম্পূর্ণটা বোঝা দায় হয়ে ওঠে। নোয়াখালীর দাঙ্গার কথায় যেমন হিন্দুর দুঃখের কথা ফুটে উঠবে ঠিক তেমনি বিহার এবং গড় মুক্তেশ্বরের দাঙ্গার বিবরণে মুসলমানদের করুণ কাহিনি প্রকাশ পাবে। পার্টিশনের পর হিংসার ঘটনার বিবরণ বেশিরভাগ অসম্পূর্ণ। হিন্দু মুসলমানদের মতই শিখদের বিবরণেও একপেশে।

তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা স্বাধীনতার আগে এবং পরে ঘটেছে তার থেকে দেশ-বিভাগকে কেন্দ্র করে যেসব সাম্প্রদায়িক, হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সেগুলো একেবারে আলাদা। আশিস নন্দীর মতে, দেশ-বিভাগকেন্দ্রিক হিংসার এমন মারাত্মক রূপ মানব সভ্যতার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। রাষ্ট্রের ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গার কারণ দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিংসাত্মক ঘটনাবলী। গণউন্মাদনায় সাময়িকভাবে জনসাধারণের বুদ্ধি-হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। উন্মত্ত রোষে সাধারণ মানুষ একে অপরকে হত্যার খেলায় মেতেছিল। এই ব্যাখ্যা এবং সাধারণ মানুষের খেপে ওঠার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র খুব সহজেই নিজেকে দায় মুক্ত করার রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল।

১৩.৮ উপসংহার

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক, উদারভাবাপন্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন। এই লক্ষ্যের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় দেখা দিয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার

সাম্প্রদায়িক বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব। এই এককে আলোচনা করা হয়েছে উপনিবেশিক শাসনকালের শেষ পর্বে বাংলায় উদ্ভূত জটিল সামাজিক সংকটকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিল সমস্যা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, দাঙ্গা এবং প্রতিহিংসার প্রবণতা, যা আসলে ভারত ভাগ অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে নৃশংসতা দেখা দিয়েছিল তা চিরকালের জন্য মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে গেছে। নিরীহ, নির্বিবাদী সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা হিন্দু অথবা মুসলিম যাই হোক না কেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ একটি সুসংগঠিত শক্তিশালী উপনিবেশিক বিরোধী নীতি এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিরোধী নীতি প্রণয়ন করে তা কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর তার ফল ভুগতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। বিরাট মূল্য দিতে হয়েছিল জাতিকে। প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল মানবতাবাদের অবক্ষয় এবং বহু শতাব্দী প্রাচীন এক সামাজিক-সংস্কৃতিক ঐক্যের ভাঙ্গনকে।

১৩.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লিগের রাজনৈতিক ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

২. ফজলুল হক ও বাংলার রাজনীতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখুন।

৩. Direct Action Day বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের (সরাসরি আন্দোলন দিবস) উপর টীকা লিখুন।

১৩.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Sumit Sarkar : *Modern India. 1885-1947.*

N. Mansergha and E. W. Lumby : *Transfer of Power*, Vol. VIII.

Anita Iner Singh : *The Origin of the Partition of Inia. 1936-47.*

A. Saida : *A Nation Betrayed.*

A. Jalal : *The Sole Spokesman* : Jimah, *The Muslim League and the Demand for Palistan*.

Shila Sen : *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947.*

V. P. Menon : *The Transfer of Power in India.*

S. Bandyopadhyay : *Deshbhag Smriti O Satwa (In Bengali)*

Bratati Hore : *Womenis Participation in Communist Frontal Movements, Case study of Bengal, 1942.*

Leonard A. Govdon : 'Divided Bengal : Problems of Nationalism an Identity in 1947 partition in India's Partition–*Process strategy and Mobilization* ed. Mushirul Hasan.

Partha Chatterjee : 'Bengal Politics and Muslim Masses, 1920-1947' in *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization.* ed. Mushirul Hasan.

Peter Hardy : *The Muslims of British India.*

একক ১৪ ❐ দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা : নতুন সমাজ গঠন?

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ভূমিকা

১৪.২ স্বাধীনতার প্রকৃতি ও স্বাধীন ভারতের সমস্যা

১৪.৩ উদ্বাস্তু বা শরণার্থী সমস্যা

১৪.৪ ‘বৃহত্তর বাংলা’ গঠনের প্রস্তাব

১৪.৫. পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি—দুই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

১৪.৬ পশ্চিমবাংলার সমস্যা

১৪.৬.১ গণ আন্দোলন : ২৭ শে এপ্রিল রাজবন্দি মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

১৪.৬.২ উদ্বাস্তু/শরণার্থী আন্দোলন : ১৯৪৯-৫০

১৪.৬.৩ ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন

১৪.৭ উপসংহার

১৪.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৪.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করে শিক্ষার্থীরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে বাংলার প্রেক্ষিতে। ১৯৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতা এবং দেশভাগ—এই দুই বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সবিস্তারে জানতে পারবেন। এই এককে যে বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে সেগুলো হল :

- ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃতি/চরিত্র
- পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠন
- সমসাময়িক সমস্যা
- ১৯৪০-১৯৫০ এই সময়ের গণ আন্দোলনগুলো

১৪.১ ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল চরম মূল্যের বিনিময়ে। খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল দেশ, ভারত উপমহাদেশ। দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষ। জন্ম নিয়েছিল নতুন একরাষ্ট্র পাকিস্তান। ভারতের দুটি প্রদেশের (বাংলা আর পাঞ্জাব) কিছুটা করে অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান।

১৯৪৭- পশ্চিম বাংলার নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে তাই দেখা গিয়েছিল অদ্ভূত এক সংকট। তৈরি হয়েছিল এক আশা-নিরাশার অনিশ্চয়তা। একদিকে পশ্চিমবাংলার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লাখ লাখ সর্বস্ব হারানো নিরুপায় শরণার্থীদের আগমনের ফলে সৃষ্টি হওয়া সমস্যাও সংকট, আর অন্যদিকে এক নতুন আশার আলো আভায়। স্বাধীন দেশের এক সুন্দর আশাভরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ১৯৪৭ সালের ভারতবাসী দাঁড়িয়েছিল এই দোলাচলের সংযোগস্থলে।

সমস্ত বাঙালির মনে তাই ১৯৪০ আর ১৯৫০ এর দশকে ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন ছিল স্বপ্ন, আশাভরসা ঠিক তেমনি ছিল আশঙ্কা। (একথা অবশ্য সকল ভারতবাসীর ক্ষেত্রেই যোগ্য) এই অনিশ্চয়তার পটভূমিতে প্রশ্ন উঠতেই পারে বাংলায় কি এর ফলে এক নতুন ধরনের সমাজের উদ্ভব ঘটে ছিল? এই এককে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে।

১৪.২ স্বাধীনতার প্রকৃতি ও স্বাধীন ভারতের সমস্যা

এক দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীনতা এসেছিল দেশ বিভাগের মধ্যে দিয়ে। দুটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল—ভারত আর পাকিস্তান। তবু বহুদিনের বিদেশি শাসনের অবসানের পর স্বাধীনতা লাভ করে মানুষ খুশি হয়েছিল। কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চের (১৯৪৮) মধ্যে কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধাতের নেতৃত্বে বি. টি. রণদিভের নেতৃত্বে পার্টি—"ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, মৎ ভুলো" স্লোগান তোলে (এই স্বাধীনতা মিথ্যা, একথা ভুলো না)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা জরুরি যে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে পার্টির মতামত ছিল যে,স্বাধীনতার নামে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে আপস করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপস করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যোগসাজসের ফলে। তাই নেহরু সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার নীতি বাতিল করা জরুরি হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। মালাবার অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে, আসাম এবং তেলেঙ্গানাতে নেহরু সরকারও ভারত সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে।

ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তোলা কমিউনিস্ট পার্টির অভিযোগ অবশ্য সর্বৈব ঠিক নয়, আবার পুরোপুরি মিথ্যা নয়। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, "যদিও স্বাধীনতা মিথ্যা নয়, কিন্তু সে জন্মলগ্ন থেকে পঙ্গু" স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে দেশভাগ। পার্টিশনের অনেক আগে থেকেই ভারতে পুরোদমে হিন্দু মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধর্মের অজুহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলে আসছিল। পার্টিশনের পর এই দাঙ্গার মাত্রার আরও বেড়ে গেল ও আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করল। নির্বিচারে চলতে লাগলো গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও জোর করে ধর্মান্তরকরণ। কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই দাঙ্গায় তার কোনও সঠিক হিসাব আজ অবধি পাওয়া যায়নি। অনুমান,নিহত হয়েছিল কমবেশি পায়ে দুই লক্ষ থেকে ছয় লক্ষের কাছাকাছি মানুষ। হানাহানি হিংসার বলি হয়েছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও। এই পরিস্থিতিতে সদ্য গঠিত রাষ্ট্র ভারতবর্ষের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বন্ধ করা, জনজীবনের শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং ভীত জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদান।

পার্টিশনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল—রিফিউজি। হিন্দুরা এবং শিখরা সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পাকিস্তানের ভিটেমাটি ছেড়ে দলে দলে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তেমনি আতঙ্কিত মুসলমানরা দলে দলে ভারত ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে। এইভাবে এক পক্ষ ছুটে ছিলেন দিল্লি বা কলকাতা অভিমুখে, আরেক পক্ষ ছুটেছিলেন লাহোরের দিকে। হিংসা-অহেতুক হানাহানি রুখতে পূর্বপাঞ্জাব ৫০ হাজার সেনা মোতায়নে করা হয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল দাঙ্গা বন্ধ করার। ৫০ থেকে ৭০ লক্ষ শিখ ও হিন্দু রিফিউজি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ হিন্দু রিফিউজি বাধ্য হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার আশ্রয় নিতে। আই.এল.ও-র রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর নথিভুক্ত সংখ্যা ছিল ৪-২ মিলিয়ন।

সর্বাধিক উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল ১৯৫০ সালে ৯,২৫,০০০ জন এবং ১৯৬৪ তে ৬,৬৭,০০০ জন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পশিচমবঙ্গ উদ্বাস্তু সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২.২ মিলিয়নে। এত বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু ভারতে এসে আশ্রয় নেওয়ার ফলে ভারতের দুটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ পাঞ্জাব, আর বাংলা, যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং যাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অপরিসীম অবদান। সেই দুটো প্রদেশকেই কেটে টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান। পশ্চিমবাংলা আর পূর্ব পাঞ্জাব রয়ে গেল ভারতের অংশ হয়ে। দেশভাগের অভূতপূর্ব অবর্ণনীয় জটিল সমস্যা এবং সংকট সৃষ্টি করেছিল জাতির জীবনে। আর এদিকে থেকে দেখতে গেলে সত্যিই পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়েই ১৯৪৭-এ জন্ম হয়েছিল নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ।

দেশভাগ বহু মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছিল। দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল বহু পরিবার। মোটামুটিভাবে সারাদেশ জুড়ে বিশেষ করে ছিন্নভিন্ন পাঞ্জাব এবং বাংলায় শুরু হয়েছিল নৃশংস দাঙ্গা, লুটতরাজ, মহিলা নিপীড়ন, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ। বহু মানুষ সর্বস্বান্ত, গৃহহীন হয়ে ভয়ে পূর্ব বাংলা এবং

পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঠিক একই চিত্র দেখা গিয়েছিল পাকিস্তানে। বাংলা এবং পাঞ্জাবের যে অংশ ভারতে পড়েছিল সেখান থেকেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান পরিবার পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অভিবাসনের এই ব্যাপকতা দুই সদ্য গঠিত রাষ্ট্রেই সৃষ্টি করেছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট। এছাড়াও ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশেই শুরু হয়েছিল ব্যাপক সাম্প্রদায়িতা, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব লীলা। সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভারতকে থামাতে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পুলিশকে নির্বিচারে গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এ ধরনের দাঙ্গা থামাতে।

পল বারানের মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার আগেই খুবই পরিকল্পিতভাবে ভারতীয় সমাজের বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাঁদের পরিসংখ্যানে সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫০ শতাংশ মানুষ ছিলেন দারিদ্রসীমার নীচে। গ্রামীণ পরিবারগুলোর মধ্যে ২২ শতাংশ ছিল ভূমিহীন। ২৫ শতাংশ মানুষর জমির পরিমাণ ছিল এক এককেরও কম। গ্রামের মাত্র ১৩ শতাংশ সম্পন্ন কৃষক বা ধনী ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল মোট জমির দুই তৃতীয়াংশ। ১৯৪৭-এ আইনিভাবে জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হলেও ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভূতপূর্ব জমিদাররা প্রচুর পরিমাণে অর্থ পেয়েছিলেন। গ্রামে বেশিরভাগ জমিদার মালিকানা তাই এইসব ভূতপূর্ব জমিদারদের হাতে রয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামে তাদের ক্ষমতা আগের মতই কায়েম রয়ে গেল। ফলে কৃষিকার্যে বা বলা ভালো কৃষি অর্থনীতিতে এবং গ্রামীণ সমাজে তারা নানাভাবে তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হলেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ও ভারতের সম্পদ এবং বাজারের ওপর বিদেশি পুঁজির বেশ দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্লান্টেশন সেক্টরে অর্থাৎ চা, কফি, পাট ইত্যাদি উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্যের যে শিল্প এবং তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত আনুষঙ্গিক শিল্প ১৯৪৭ এবং তারপরেও ছিল বিদেশি সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনার অধীনে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৪৯-৫০-এ চা শিল্প ৮৫% ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলোর মালিকানার অধীনে। এছাড়াও পাট উৎপাদনে ৭০-৯৫ শতাংশ, কয়লা উৎপাদনে ৭০ শতাংশ এবং অন্যান্য সমস্ত খনিজ পণ্য, স্বর্ণ ও ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদির উৎপাদনে বিদেশি পুঁজি লগ্নি থাকায় এইসব শিল্পগুলোর উৎপাদনও বিদেশি সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ছিল। টাকার হিসাব করে দেখা গেছে ১৯৪৮ সালে ভারতে বিদেশি পুজির বিনিয়োগ ছিল ২৫০ কোটি।

স্বাভাবিকভাবে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও, ভারতবর্ষের অর্থনীতি ছিল বিদেশি নিয়ন্ত্রণে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভারতবাসী তখনও অর্জন করেনি। দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, বেকারত্ব, অশিক্ষা, নানা অসুখ-বিসুখ আর তার সঙ্গে কুসংস্কার—এই ছিল সাধারণ ভারতবাসীর রোজকার জীবনের নিত্য সঙ্গী। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ তাকিয়ে ছিল নতুন রাষ্ট্রের দিকে। স্বাধীনতা অনেক আশার আলো নিয়ে এসেছিল তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে।

অন্যদিকে ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা ভারতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতের জাতীয় জীবনে সূচিত হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়। ঠিক এই কারণেই বোধহয় ভারতের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলাটা সঠিক নয়। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৭-এ যখন এ বক্তব্য জনসম্মুখে এনেছিল তখন কিন্তু দেখা যায় যে পার্টির সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ একেবারে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সত্যি কথা বলতে স্বাধীনতা অর্জন কখনই একেবারে অর্থহীন হতে পারে না; বিদেশি শাসকের থেকে মুক্তির আনন্দ প্রকাশে হয়তো ভারতবাসীর কিছু আতিশয্য ছিল কিন্তু তা হলেও মুক্তির উৎসব সেদিন ভারতবাসী পালন করেছিল খুশির সঙ্গে। স্বীকার করা উচিত সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার বার্তা এনে দিয়েছিল উত্তেজনা, সচেতনতা এবং আনন্দ। একটা জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল ভারতবাসীর মন। তাই স্বাধীনতা মিথ্যা এ কথা এত নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না।

১৭৫৭ তে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশের পদানত হয়েছিল। উপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয়রা ছিলেন সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ভারতবাসীর ছিল না। কাজে এক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়াই যেতে পারে যে ১৯৪৭-এ ভারতবাসী হয়তো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অধিকার অর্জনের স্বাধীনতা তো অর্জন করতে পেরেছিল। সে অর্জনটুকু তো নেহাত কম নয়।

যেকোনও জাতির স্বাভাবিক লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভ। ভারতবাসীর সেই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে। ভালো-মন্দ যাই হোক এরপর থেকে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতায় আসীন থাকবে দেশবাসী। ১৯৫০ সালে ২৬ শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়। এই দিনটিকে ভারতবাসী তাই স্মরণ করে গণতন্ত্র দিবস হিসেবে। নির্বাচিত ভারতীয়দের প্রতিনিধিরা সংবিধান সভার সদস্য হয়ে ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের মূল মন্ত্রটিকে তারা ব্যক্ত করেছিল সংবিধানের প্রিয়েম্বল বা মুখবন্ধতে। ভারতীয় সংবিধান তাই শুরু হয়েছে এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে— "WE, THE PEOPLE OF INDIA" aspire to create 'JUSTIC, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worhsip; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation'. আমরা ভারতবাসীরাই এই সংবিধানের রচয়িতা। এই সংবিধানের উদ্দেশ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা। সকল শ্রেণির মানুষের সমান অধিকার, সাম্য ও মানবিকতাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দেশের ঐক্য রক্ষার সংকল্প।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটল। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জন্মলগ্ন থেকেই এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে সে পড়েছিল যে তার অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন হতে বসেছিল। ভীষণ জটিল সব সমস্যায় এবং সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে। সমসাময়িক অবস্থা দেখে গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন, শাসনকর্তার মাথায় কাঁটার মুকুট। এই

সমস্ত বক্তব্য একশ শতাংশ খাঁটি তাই এস. গোপালের কাছে স্বাধীনতার নতুন সূর্য ওঠা ভোর ছিল হতাশার অন্ধকারে পরিপূর্ণ। রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে জটিলতা দেখা দিয়েছিল। শরণার্থীদের জীবন-জীবিকা এবং পুনর্বাসনের সমস্যায় জর্জরিত সদ্য গঠিত রাষ্ট্র ভারত এক দিশেহারা অবস্থায় পড়েছিল। ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সমস্যার আশু সমাধান।

পার্টিশন পরবর্তী সময়ে আরও একটা প্রধান সমস্যা ছিল খাদ্যাভাব। দেশভাগ হবার ফলে ভারতের বিস্তীর্ণ কৃষি ভূমি চলে গিয়েছিল পাকিস্তানের আওতায়। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের টান পড়ে স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যের অভাব ঘটেছিল। এ অবস্থায় ভারতে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী খাদ্য সমস্যাকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছিল। খাদ্যাভাব দূর করতে সরকার ১৯৪৯-এ খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯৫০ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন মার খেয়েছিল এবং দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। ১৯৫১ সালে নেহরু দেশের খাদ্যাভাব মেটাতে বিদেশ থেকে ৩৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির পরিকল্পনা করেন। ওই পরিমাণ খাদ্যশস্য কিন্তু দেশের খাদ্যাভাব মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। খাদ্যাভাবের সমস্যা স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল উদ্বাস্তু সমস্যা ও খাদ্য সংকটে। বলা হয় যে, অর্থনৈতিক বিকাশ সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কারণ। অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে নিঃসন্দেহে তাই জীবন-যাপনের মান, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বদল এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেটা হল বেকারত্ব বৃদ্ধির সমস্যা। পার্টিশনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ দু'দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান অংশে ছিল কৃষিকাজ, চাষবাসের আধিক্য আর ভারত ভূখণ্ডে ছিল শিল্প। এক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে কাঁচামাল ভারতের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছিল। পাট, গম, তুলো জাতীয় কাঁচামালের অভাবে ভারতে অবস্থিত শিল্পগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই এবং নতুন শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হতে লাগল। অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি হল। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গেল। কিন্তু শরণার্থী আগমনের ফলে যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল তাই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে কর্মসংস্থানের যে অভাব দেখা দিল তা কালক্রমে তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় দেশজ স্বাধীন রাজ্যগুলোর সংখ্যা ছিল ৬০১। Act of 1947-এ বলা হয়েছিল, ওইসব দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলো নিজ ইচ্ছানুসারে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে অবস্থান করতে পারে অথবা কিংবা পাকিস্তান যেকোনও একটিতে যোগদান করে সে রাষ্ট্রের অংশ হয়ে অবস্থান করতে পারে। অবশ্য স্যার হার্টলি, অ্যাটর্নি জেনারেল শ'ক্রস এবং প্রধানমন্ত্রী এইসঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন অবস্থান কিন্তু ব্রিটিশ সরকার গ্রাহ্য করবে না। ভারতের মোট ভূখণ্ডের ৪৮ শতাংশ ছিল

দেশজ রাজন্যবর্গের শাসনাধীন অঞ্চল আর তার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯ কোটির কাছাকাছি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেহেতু এই রাজ্যগুলি ছড়িয়েছিল তাই এই স্বাধীন রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব স্বাধীন ভারতের ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠবার একটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

তাই অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। প্রয়োজন হয়ে পড়ে ভারতের সঙ্গে দেশজ রাজ্যগুলির সংযুক্তিকরণ। এই সংযুক্তিকরণের সমস্যা, দীর্ঘ সময় ধরে ভারত সরকারের হয়রানি ও বিরক্তির কারণ হয়েছিল। এই ধরনের সমস্যা ছাড়াও যে মূল সমস্যাটি ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল তা হল নানা জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, বর্ণ, ভাষা, আচার-বিচার সামাজিক নিয়ম-নীতি, সংস্কৃতি দ্বারা বিভক্ত ভারতের নানা প্রান্তের অভিবাসীদের একত্রীকরণের সমস্যা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন এবং দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা—ভারতের নব্য শাসকগোষ্ঠী এই দুই কঠিন লক্ষ্য সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অবশ্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংকটের মোকাবিলা করেছিলেন। যদিও ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাহলেও কেন্দ্রীয়শাসন ব্যবস্থা ছিল শক্তিশালী। রাজ্যগুলোর হাতেও যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পণ্ডিত নেহরুর মতো একজন যোগ্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিল। এগিয়ে গিয়েছিল উন্নতি ও প্রগতির পথে। নেহরুর নেতৃত্ব ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রকেও সন্তর্পণে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টার সফল হয়েছিল।

১৪.৩ উদ্বাস্তু/শরণার্থী সমস্যা

দেশভাগের ফলে ভারত ভূখণ্ড পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, বালুচিস্তান এবং সিন্ধু—এই অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সীমান্তবর্তী এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলোতে দাঙ্গা-হানাহানির ধারাবাহিকতা বজায় রয়ে গেল পার্টিশনের পরেও। পার্টিশনের পর বিরাট সংখ্যায় হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে শুরু করেছিলেন। দেশজুড়ে দাঙ্গা, লুটতরাজ, আগুন লাগানো, ধর্ষণের মতো ঘটনা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতার লাভের উল্লিখিত আনন্দধ্বনি ছাপিয়ে বেজে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ উৎকণ্ঠিত হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের হিংস্রদ্বন্দ্বে আহ্বানের আওয়াজ যা ভারতের পশ্চিম সীমান্তের আকাশ বাতাসে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। জেনারেল অচিনলেক সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করেননি। এমনকি শান্তি রক্ষার জন্য কোনো বাহিনী সৃষ্টি করেননি। ভীত, সন্ত্রস্ত্র, অধৈর্য এক কোটি পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুর সামনে জেনারেল বাশারের ৫০ হাজার সৈন্য খড়-কুটোর মতো যেন ভেসে গিয়েছিল। সর্বস্ব হারিয়ে মানুষের দল ছুটেছিল হয় দিল্লি অথবা লাহোরের অভিমুখে। একই ঘটনা ঘটেছিল পশ্চিমবাংলার সীমান্তেও। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কথা জানায় যায় যে, বাংলার উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ লক্ষ। এদের মধ্যে ৬ লাখ শরণার্থীর মৃত্যু ঘটেছিল। প্রায় এক লক্ষ মহিলা নিখোঁজ হয়েছিলেন

এবং প্রচুর সংখ্যায় মানুষ গৃহহীন হয়েছিলেন। কেবলমাত্র পরিসংখ্যান দিয়ে এইসব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করা অসম্ভব। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের নিরাপত্তার অভাব এতই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেখান থেকে হিন্দুরা ভারতে নিরাপদ আশ্রয় পালিয়ে আসছিলেন।

উদ্বাস্তু বা শরণার্থী সমস্যার জন্য ভারত পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। ভারতের আলোকিত চেতনাস্বরূপ যে মানুষটি, সেই গান্ধীজি এই রক্তাক্ত হানাহানি দাঙ্গা থামাবার প্রয়াসে অনশন শুরু করেছিলেন। আরও একবার গান্ধী অনশনে ব্রতী হয়েছিলেন যখন দেশ বিভাগের সময় প্রতিশ্রুত টাকার অঙ্ক ভারত পাকিস্তানকে দিতে অস্বীকার করে। এরপর ভারত পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীর মৃত্যু ভারতবর্ষের ঐক্য চেতনার উপর আঘাত।

দাঙ্গার পরিস্থিতি সামলাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আলোচনায় বসেন। ১৯৫০ এর ১৭ এপ্রিল নেহরু-লিয়াকত চুক্তি হয়, যা দিল্লি চুক্তি নামেও পরিচিত। এই চুক্তির শর্তগুলি ছিল :

(১) দেশের অধিবাসী সংখ্যালঘু নাগরিকরা নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অসুবিধার কথা বা প্রয়োজনীয় অধিকারের দাবি তারা যে যার দেশের সরকারের কাছে আনবেন।

(২) যদি কেউ পূর্ব অথবা পশ্চিমবঙ্গ অথবা আসাম থেকে শরণার্থী হয়ে অন্য কোন দেশে চলে যেতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সবরকমের সহযোগিতা পাবেন।

(৩) ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। অনুসন্ধান কমিটির কাজ হবে দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার ফলে যে মারাত্মক রকমের সংকট দু'দেশেই দেখা দিয়েছে তার কারণ এবং সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করা। দু'দেশেই সংখ্যালঘু কমিশন বা মাইনরিটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(৪) পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভার বা ক্যাবিনেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাখতেই হবে।

এই চুক্তি অবশ্যই সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রতিবাদস্বরূপ নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে আগত শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘব করতে যে ধরনের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেই ধরনের কোনও ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘব করতে নেওয়া হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেবলমাত্র একবারই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারতে শরণার্থীরা এসেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবিরাম শরণার্থীর দল পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন।

ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে ছিন্নমূল গৃহহীন লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য ত্রাণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব হিন্দু এবং শিখ শরণার্থীরা ভারতে এসেছিলেন, তারা আশেপাশের ফাঁকা জমিতে বসতি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমান ব্যক্তি বা পরিবারের সম্পত্তি দখল নিতে পেরেছিলেন। বাংলায় কিন্তু তা হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের ভাষার সঙ্গে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসকারীদের ভাষাগত প্রভেদ না থাকাতে শরণার্থীরা দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে সেখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। অপরদিকে বাংলাভাষী শরণার্থীরা ভাষার অসুবিধার কারণে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা আর আসাম ছাড়া অন্য কোথাও বসতি স্থাপন করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে শুরু করবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনংখ্যা প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। যার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল সমাজ ও রাজনীতিতে। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পূর্ব পাঞ্জাবের শরণার্থীদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ছিল বেশ কম। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটি চিঠির কথা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে—"ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে আসা ২ লক্ষ মানুষের জন্য এ পর্যন্ত যে পরিমাণ অনুদান প্রদান করা হয়েছে তা অবশ্যই অত্যন্ত স্বল্প। দু'বছরে মাথাপিছু মাত্র ২০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় টাকার অঙ্কটা যথেষ্ট?"

১৪.৪ বৃহত্তর বাংলা গঠনের প্রস্তাব

এই পর্বে বর্ণিত হয়েছে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি প্রায় অজানা অধ্যায়। দ্বিজাতীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন ভারত ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ প্রায় সুনিশ্চিত এবং সেইসঙ্গে বাংলাও যে দুই অংশে খণ্ডিত হতে চলেছে তাও একপ্রকার স্থির হয়ে গেছে তখন বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লিগের নেতা সুরাবর্দি স্বাধীন বাংলা গঠনের একটি প্রস্তাব করেছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৪ এপ্রিল দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন অখণ্ড বাংলা পাকিস্তান বা ভারত কারুরই অংশ হবে না। বাংলা ভাগ হলে বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লাখনি জুট মিলগুলি এবং কলকাতা শহর পশ্চিমবঙ্গে পড়বে, যার ফলে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে সুরাবর্দী মনে করেছিলেন।

এই প্রস্তাব কিন্তু সরাসরি মুসলিম লিগের যে স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্রের সৃষ্টির দাবি ছিল তার একেবারে বিপরীত। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দুটি দলে বিভক্তি হয় গেল বর্ধমান-এ লীগের নেতা আব্দুল হাসিম সুরাবর্দীর প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন অপরদিকে নুরুল আমিন এবং মোঃ আকরাম খান প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন

দুজন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা শরৎচন্দ্র বসু এবং কিরণশঙ্কর রায়। কিন্তু বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য প্রায় সব নেতা, নেহরু ও প্যাটেল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। নেতৃবৃন্দের একটা বৃহৎ অংশের আপত্তি থাকতে বোঝা যাচ্ছিল যে এই প্রস্তাব কার্যকরী হওয়া অসম্ভব। তবুও শরৎ বসু ও সুরাবর্দী প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের কাঠামো কেমন হবে তা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা ভাগ হলে যে বাংলার অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং হিন্দু জনসংখ্যার অর্ধেক যে পাকিস্তানে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন শরৎ বসু এটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটির কোনও জনসমর্থন ছিল না। বিশেষ করে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে। বিগত দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্বের নিরলস প্রচার, সুরাবর্দি মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের কোণঠাসা অবস্থা এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা—যা অধিকাংশ হিন্দুরাই বিশ্বাস করতেন সরকারি মদতেই দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। সাধারণ হিন্দু জনমানসে মুসলিম লিগ সম্পর্কে অবিশ্বাস ও ভীতি সৃষ্টি করেছিল। এরপর স্বাধীন বাংলায় মিলিত না স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী এ বিষয়ে বসু ও সুরাবর্দীর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। সুরাবর্দীর দাবি ছিল হিন্দু আর মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর আর বসু চেয়েছিলেন অখণ্ডিত নির্বাচকমণ্ডলী। কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন না থাকায় অবশেষে বসু-সুরাবর্দী স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। সংযুক্ত বৃহত্তর বাংলা গঠনের প্রস্তাবটিও নাকচ হয়ে যায়। এর সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াসে বাংলা ভাগ রদ করবার শেষ প্রচেষ্টাও অসফল হয়ে যায়।

১৪.৫ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি—দুই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলা চিরকালই ছিল একটি অখণ্ডিত অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল। জাতিগত দিক থেকে বাঙালি ছিল একই গোষ্ঠীভুক্ত। র‍্যাডক্লিফের টানা রেখা সেই বাংলাকে এবং বাঙালিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিল। অর্থনীতির দিক থেকে বাংলার দুই অংশ পূর্ব এবং পশ্চিম ছিল পরস্পরের পরিপূরক। পূর্ব বাংলার উর্বর জমিতে যে প্রচুর শস্য ও নানান কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হত তা ব্যবহার করত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল আসত পূর্ব থেকে পশ্চিমে। অপরদিকে শিল্পে উন্নত বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কারখানায় উৎপাদিত শিল্পপণ্য যেত পশ্চিম থেকে পূর্বে, সেখানকার মানুষদের ব্যবহারের জন্য। পার্টিশনের ফলে দুই অঞ্চলের অর্থনীতির যে একটা পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। দুই অংশের মধ্যে রেলপথ এবং জলপথে যাতায়াতের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

বাংলায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্ল ঘোষের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে বাংলা চলেছিল এক দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে। সাম্প্রদায়িক হিংসা, খাদ্যাভাব, কর্মহীনতা, বেকারত্ব, পূর্বপাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুর আগমন—সবমিলিয়ে বাংলার পক্ষে সেই এক অন্ধকার নিরাশা ভরা সময় ছিল। প্রফুল্ল ঘোষের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, জনহিতৈষী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং রাজনীতিদি। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬২ সালে

তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার পর ডাঃ রায় ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ রাজ্য সংযুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে মনোনীত হলেও তিনি সেই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৮ সালে পশিচমবঙ্গের কংগ্রেস বিধায়করা তাঁকে তাদের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রায় তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন। ১৯৫০ সালে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। কোচবিহারের রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এক্সেশন স্বাক্ষর করে ভারতবর্ষে যোগদান করেন। ১৯৫৫ তে ফরাসিদের অধীনে থাকা চন্দননগরও পশ্চিমবাংলার যুক্ত হয়।

বিধান রায় আমৃত্যু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই তার মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য ওই দিনটিই তার জন্মদিনেও বটে। বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রীত্বের কাল পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে গৌরবজ্জ্বল। তার সময়ে জমিদারি আইন পাশ হয়। রাজ্যে জমির সিলিং প্রথা কার্যকর হয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির ঊর্ধ্বতন সীমা বিধি দেওয়া হয়। বলা হয়, ২৪ একরের বেশি জমি কোনও ব্যক্তি তার মালিকানায় রাখতে পারবে না। বিধানচন্দ্র রায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির ওপর জোর দেন। কৃষক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে সেচ ব্যবস্থা, সার ও উন্নতমানের বীজের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে কিছু ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। ডাঃ বিধান রায়কে বলা হয় আধুনিক বাংলার রূপকার। তার পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। দুর্গাপুর, কল্যাণী, বিধাননগর, অশোকনগর-কল্যাণগড়, হাবড়া—এই পাঁচটি শহরের গোড়াপত্তন তারই উদ্যোগ হয়। তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা পরিবহন কর্পোরেশন, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ময়ূরাক্ষী প্রকল্প এবং সল্টলেক উপনগরী। দীঘাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা তারই ভাবনার প্রকাশ। তিনটি সাধারণ নির্বাচনে বিধান রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস জয় লাভ করে এবং তিন তিনবারই মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ নেন।

১৪.৬ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার মহিমা দ্রুত কমতে শুরু করেছিল। ৪০-এর দশকের শেষ পর্ব এবং ৫০-এর দশকের পুরোটাই ছিল সমস্যাসঙ্কুল। খাদ্যাভাব, কালোবাজার, দুর্নীতি, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত স্তরের অনৈতিকতা চরমে পৌঁছেছিল। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটাও ছিল একই রকম। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলতা ছিল গণবিক্ষোভের একেবারে আদর্শ পরিস্থিতি।

রাষ্ট্র গণবিক্ষোভ প্রশ্রয় দিতে নারাজ ছিল। পুলিশের সাহায্যে রাষ্ট্র এ সময়ের গণবিক্ষোভ কড়া হাতে মোকাবিলা করেছিল। নির্মমভাবে মানুষের প্রতিবাদী বিক্ষোভ দমন করেছিল। আর এর ফলে নির্বাচিত সরকার সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশই অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৭-এ আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবসে বা আইএনএ দিবসে যুব সংগঠনগুলোর মিছিলের উপর গুলি চালনা, ১৯৪৮ সেপ্টেম্বর ডক কর্মীদের উপর গুলি চালনা, ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯ কমিউনিস্ট পার্টির চারজন মহিলার গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গণ-বিক্ষোভ দমনে

পুলিশ ফোর্স নামক রাষ্ট্র যন্ত্রের ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল ছিল। সরকার পরিচিত হয়ে উঠেছিল পুলিশ রাষ্ট্র বলে।

এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলগুলোতেও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই আন্দোলন বর্গাদারদের উচ্ছেদের দাবিতে হাওড়া ও হুগলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে এইসব অঞ্চলে পুলিশি নির্যাতন, নিপীড়ন তীব্র আকার ধারণ করে। কাকদ্বীপ, হাওড়া এবং হুগলিতে পুলিশের গুলিতে প্রচুর সংখ্যায় কৃষক মারা যান। নিহত ৭৫ জনের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ এর কাছাকাছি। ১৯৫০ পর্যন্ত এই কৃষক আন্দোলন চলে। এই একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের নাচোলে যে কৃষক আন্দোলন ঘটে পাকিস্তানি পুলিশ সে আন্দোলন কঠিন হাতে দমন করে। পাকিস্তান জেলে বন্দী ইলা মিত্রের উপর রাষ্ট্রের চরম নির্যাতনের খবর পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে আলোড়ন তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গেও কমিউনিস্ট পার্টির বহু নেতা কর্মীদের মহিলা সহ দীর্ঘদিন জেলে বন্দি রাখা হয়।

১৪.৬.১ গণ বিক্ষোভ/আন্দোলন : ২৭ এপ্রিল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিভোক্ষ

স্বাধীনতার এই পর্বের মহিলাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা নতুন পর্যায়ে শুরু হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটা মিটিং হয় এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে তারা পথে নামেন। পুলিশ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মিছিলের ওপর গুলি চালায়। যার ফলে লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, গীতা সরকার এবং অমিয়া দত্ত—এই চারজনের মৃত্যু ঘটে।

১৪.৬.২ উদ্বাস্তু/শরণার্থীদের আন্দোলন

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল তখন অভিবাসী সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামে পুলিশ এবং আনসাররা একজন কমিউস্টি পার্টির কর্মীকে তার গোপন আস্তানা থেকে খুঁজে বার করতে এসে একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। গ্রামবাসী এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পুলিশ এবং আনসারীরা এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে এটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করে। খুলনার দাঙ্গার খবর কলকাতাতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই কলকাতায়ও দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বাংলার দুই অংশেই আবার ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা। স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১০ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। এই শরণার্থীর সংখ্যা একসময় ৪০ লাখ ছুঁয়ে যায়। এর মধ্যে অন্তত ৫ লাখ মানুষ রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৃহহীন এইসব উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনের দাবিতে প্রথম দিকে কোনোরকম সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে না উঠলেও শহরাঞ্চলের কিছু মধ্যবিত্ত যুবকবৃন্দ বিক্ষিপ্তভাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবি তুলেছিলেন।

উদ্বাস্তুদের দাবি নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫০ সালে আগস্ট মাস থেকে। যখন ইউসিআরসি

(United Central Refugee Council) অম্বিকা চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিন্‌হা, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকিশোর চক্রবর্তী এবং আরও অনেকের নেতৃত্বে স্থাপিত হয়। আদিপর্বে এই আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল উদ্বাস্তু মানুষের বসবাসের জন্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত কলোনি স্থাপন। ১৯৫১ সালের রাজ্য সরকার যখন এইসব কলোনিগুলোকে বেআইনি বলে ঘোষণা করবার জন্য আইনি নোটিশ আনার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল, তখনই উদ্বাস্তুদের আন্দোলন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে শেষ পর্যন্ত সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালে রিফিউজি কলোনিগুলোকে বৈধ বলে মেনে নেয়। ১৯৫০-এর প্রথম ভাগ জুড়ে শরণার্থীদের নানা দাবি নিয়ে বহু আন্দোলনের সাক্ষী ছিল পশ্চিমবঙ্গ।

১৪.৬.৩ ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন

ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানি ঘোষণা করেছিল যে ১৯৫৩ সালের ১ জুলাই থেকে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া এক পয়সা বাড়বে। তখন দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া ছিল তিন পয়সা। এক পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদের শহর জুড়ে হল ব্যাপক আন্দোলন। এক মাসের জন্য শহর অচল হয়ে পড়ল। ভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা হবার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো তড়িঘড়ি কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে তারাও ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করবে। অবস্থা বুঝে ট্রাম কোম্পানি পুলিশের সহযোগিতায় শহরে ট্রাম চালানোর ব্যবস্থা করেছিল। কলকাতা রাস্তার বেশ কয়েকদিন ধরে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে জনতা-পুলিশের যুদ্ধ চলেছিল।

১৯৫৩ এর আন্দোলনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে ভাড়া না দিয়ে লোকে ট্রামে উঠে যাতায়াত করত। দ্বিতীয় পর্বে 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের বর্ণনা অনুযায়ী, আন্দোলনকারীরা ভাড়া বয়কটের নতুন পদ্ধতি নিয়েছিলেন। আর অন্তিম পর্বে আন্দোলন হয়ে উঠেছিল। ট্রামে ইঁট, পাটকেল, ছোড়া, অ্যাসিড বাল্ব ছোড়া, আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ধ্বংসাত্মক ঘটনাও ঘটতেশুরু করেছিল। পুলিশও নিষ্ক্রিয় থাকেনি, প্রথমে লাঠিচার্জ তারপর গুলি চালানো অবশেষে নির্বিচারে ধরপাকড় ও জেল বন্দি করা শুরু হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলির পরিচালনায় ১৯৫৮ সালের শেষদিকে আরও একটি গণ আন্দোলন ঘটে। প্রাইস ইনক্রিজ অ্যান্ড পেমেন্ট রেজিট্যান্স কমিটি পরিচালিত এই বাম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দেশে খাদ্যাভাবকে কেন্দ্র করে। "খাদ্য চাই খাদ্য দাও, কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না।" খোলা বাজারে এ চাল গম ইত্যাদি অত্যাবশ্যক অন্য হঠাৎ অপ্রতুল হয়ে পড়ে। কালোবাজারিও বেড়ে গেছিল। ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ লাগাতার গণ-আন্দোলনের শামিল হয় ও রাস্তাঘাটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য পুলিশের সাহায্যে আন্দোলনকারীদের ওপর নির্মমভাবে দমন ও পীড়ননীতির প্রয়োগ করে।

১৪.৬.৪ শিক্ষক আন্দোলন

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের বেতন ছিল প্রতি মাসে ৩৭ টাকা। শহরে শিক্ষকদের জন্য ভাগ্য এর চেয়ে একটু সুপ্রসন্ন ছিল। কারণ তাদের বেতন ছিল প্রতিমাসে ৪০ টাকা ১২ আনা। এর থেকে ডিএ বাবদ কাটা যেত ১০ টাকা। যদিও প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা অনেক বেশি শোচনীয় ছিল তবুও প্রতিবাদে উঠে এসেছিল এ.বি.টি.এ (All Bengal Teacher Association)-এর নেতৃত্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে। দাবি ছিল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন দ্বারা প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো প্রবর্তন করা এবং প্রতিমাসে ডিএ বাবদ ৩৫ টাকা শিক্ষকদের জন্য অনুমোদন করা।

১৯৫৫ সালেই ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষকরা দাবি পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে ডাক দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি রাজভবনের পূর্ব দিকে তারা ধর্নায় বসেন। প্রথম দিনে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, যদি সরকার তাদের দাবি না মেনে নেয় তাহলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি অ্যাসেম্বলি ঘেরাও করবেন। ১৫ তারিখে হাজার হাজার শিক্ষক আন্দোলন যোগদান করেন। এছাড়াও ছাত্র-শ্রমিক সমাজের অন্যান্য বহু শ্রেণীর মানুষ এ বিক্ষোভ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবিটিএ। এই শিক্ষক আন্দোলনকে একটি গণ আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

ক্রমশ শিক্ষক আন্দোলনের চরিত্র পাল্টে যেতে শুরু করেছিল। তা আরও হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষকরা। ফলে ধরপাকড় শুরু হয়েছিল। আটক হওয়া শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪ হাজারে। এই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের ডিএ ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭ টাকা ৮ আনা ঘোষণা করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বর্ধিত হারে ভাতা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিলেন। আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

১৪.৭ উপসংহার

এই এককে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা থেকে এই উপসংহার টানা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরবর্তী সময়ে যেমন দেশব্যাপী একটা আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ উঠেছিল ঠিক তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল এক আশঙ্কার আবহাওয়া। দেশভাগের প্রভাবে স্বাধীনতা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস অবশ্যই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছিল। প্রধান বিরোধী পক্ষ ছিল বামপন্থীরা বা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। যদিও প্রথমদিকে কমিউনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতাকে সত্যিকার স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তবুও কিছু সময় পর তারা ভারতের সংবিধান অনুমোদিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সে ব্যবস্থায় যোগদান করেন। কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর পরিচালনার রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকটি নীতির বিরোধিতা করে এ সময় বিক্ষোভ ও গণআন্দোলন পুরোধায় ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং মহিলারা। সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যাপক

গণআন্দোলনগুলো নিঃসন্দেহে হয়রানির কারণ হয়েছিল। রাজ্য সরকার কঠোর হাতে দমননীতি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে এনেছিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতের অনুন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আসা দেশ ভাগ সংকটকে জটিলতর করে তুলেছিল। এই প্রেক্ষিতে গণবিক্ষোভ ছিল আসল উৎকণ্ঠিত মানুষের আশঙ্কার প্রকাশ। স্বাধীনতা বিভিন্ন শ্রেণি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বিভিন্ন অর্থ নিয়ে এসেছিল। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে নতুন এক সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল।

১৪.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষের সামনে কী কী প্রধান সমস্যা ছিল?

২. উদ্বাস্তু বা শরণার্থী সমস্যা কী ভাবে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল?

৩. ১৯৪০ এর শেষের দিকে এবং ১৯৫০ এর গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে যে সব গণ আন্দোলন এবং গণ বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছিল, তাদের উপর টীকা লিখুন।

১৪.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Prafulla Chakraborty : *The Marginal Men.*

Sandip Banyopahyay : (In Bengal) *Ranakshetra Rajpath.*

Dr. C. Palit : *Bengal Before and After the Partition.*

Bipan Chandra : *History of Modern India.*

Sumit Sarkar : *Modern India, 1885-1947.*

Shekhar Bandyopashyaya : *From Plassey to Partion and After.*

Shekhar Bandyopadhyay : *Decolonization in South Asia. Meanings or Freedom in Post Inependence West Bengal. 1947-1952.*

Siddharta Guha Roy and Suranjan Chatterjee: *History or Modern India, 1707-1947*

Bratati Hore : *Women's Participation in Communist Frontal Movements : A Case study of Bengal 1942-1947.*

Mushirul Hasan (ed.) : *India's Partition* : *Process, strategy and Mobilization.*

Notes

Notes